রামগোলাম

হরিশংকর জলদাস

BanglaBook.org

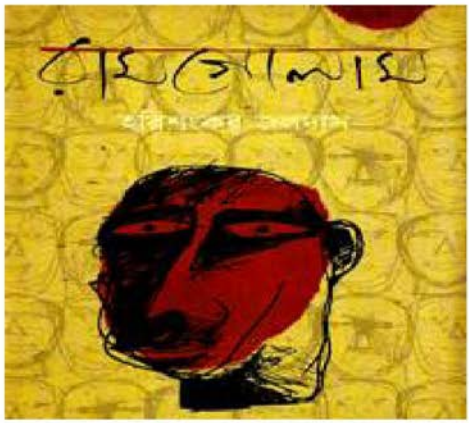

হরিশংকর জলদাস তাঁর আগের তিনটি উপন্যাসে জেলেদের সমাজজীবন আর পতিতাদের ক্লেদময় জীবনের কাহিনি শুনিয়েছেন। *রামগোলাম* হরিজনদের জীবনভাষ্য। ব্রহ্মা নাকি শুধু বিষ্ঠা সাফ করানোর জন্য নিজের শরীরের ময়লা থেকে মহীথর সৃষ্টি করেছিলেন। সেই সৃষ্টিকাল থেকে আজ পর্যন্ত তারা অচ্ছুৎ। ময়লা পরিষ্কার করার জন্য কানপুর, এলাহাবাদ প্রভৃতি জায়গা থেকে এই সম্প্রদায়কে মোগল নবাব আর ইংরেজরা এ দেশে এনেছিল। নানা সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছিল তাদের। কিন্তু এখন তাদের কোণঠাসা অবস্থা। পর্যাপ্ত থাকার ঘর নেই, পানি নেই; কেড়ে নেওয়া হচ্ছে তাদের ঘর, বিদায় করে দেওয়া হচ্ছে চাকরি থেকে; তাদের প্রথা-সংস্কার-ধর্মবিশ্বাসকে ধ্বংস করার চেষ্টা চলছে। প্রকাশ্যে তাদের স্পর্শ করতে বাধে, কিন্তু গোপনে ভোগ করতে দ্বিধা নেই। মেথরদের সঙ্গে দীর্ঘ সময় মিশে দলিত, অধিকারবঞ্চিত এই সম্প্রদায়কে নিয়ে হরিশংকর এমন একটি উপন্যাস লিখেছেন, যেখানে মহাভারত, মনুসংহিতা, পুরাণকথা আর বর্তমানের মেথরজীবন একাকার হয়ে উঠেছে। বঞ্চনা, প্রেম, যৌনতা—মেথরসমাজের আদ্যোপান্ত ইতিহাস যেন *রামগোলাম*।

www.BanglaBook.org

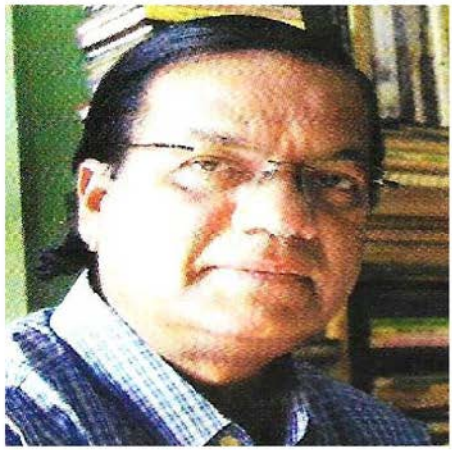

হরিশংকর জলদাস

জন্ম ১২ অক্টোবর ১৯৫৫, চট্টগ্রামে সমুদ্রপারের জেলেসমাজে। চুয়াল্লিশ বছর বয়সে কলম ধরেন তিনি, লেখেন *নদীভিত্তিক বাংলা উপন্যাস* ও *কৈবর্ত জনজীবন*। *জলপুত্র*, *দহনকাল*, *কসবি* আর *জলদাসীর গল্প* তাঁকে প্রতিষ্ঠা দেয়। *লোকবাদক বিনয়বাঁশী* এবং *জীবনানন্দ ও তাঁর কাল* লেখকের অন্য রকম দুটি বই। *কৈবর্তকথা* ও *নিজের সঙ্গে দেখা* নামে দুটি আত্মজৈবনিক গ্রন্থ আছে তাঁর। দলিত সমাজের লেখক তিনি, দলিতদের নিয়েই লেখেন। লেখার ক্ষেত্রে লুকোচুরি বা রাখঢাক করেন না। তাঁর লেখায় জেলে, মেথর, বারবনিতা, ধোপা, নাপিত, ভিক্ষুক, মুচি, কামার-কুমার ফিরে ফিরে আসে। ১৪১৬ বঙ্গাব্দে হরিশংকর জলদাসের *দহনকাল* উপন্যাসটি 'প্রথম আলো বর্ষসেরা বই' পুরস্কার লাভ করে। ২০১১-এ 'ড. রশীদ আল ফারুকী সম্মাননা স্মারক' পুরস্কারে ভূষিত হন এই লেখক।

www.BanglaBook.org

হরিশংকর জলদাস

বাঁয়সোলায়

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

প্রথমা
প্রকাশন

প্রথমা
প্রকাশন

রামগোলাম

গ্রন্থস্বত্ব © লেখক

প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১২
তৃতীয় মুদ্রণ : কার্তিক ১৪১৯, নভেম্বর ২০১২
প্রকাশক : প্রথমা প্রকাশন
সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ
কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫, বাংলাদেশ
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : সব্যসাচী হাজরা
মুদ্রণ : কমলা প্রিন্টার্স
৮৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা ১০০০

মূল্য : ৩২০ টাকা

Ramgolam
by Harishankar Jaladas
Published in Bangladesh by Prothoma Prokashan
CA Bhaban, 100 Kazi Nazrul Islam Avenue
Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Telephone: 8180081
e-mail: prothoma@prothom-alo.info
Price : Taka 320 only

ISBN 978 984 8765 86 9

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয় কবি কামাল চৌধুরীকে
যাঁর হৃদয়ে প্রান্তজনের জন্যে
অপার ভালোবাসা জমা হয়ে আছে।

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

এক

বড় অদ্ভুত নাম তার, রামগোলাম। মাথাতোলা হয়ে মাকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, তার এ রকম নাম কে রেখেছে। মা বলেছিল, 'তোর দাদা-দাদি কেউ রেখেছিল বা তোর বাপ।' বাপের নাম তো শিউচরণ। তবে তার নাম এ রকম কেন? মনের ভেতর বড় আকুলিবিকুলি করত প্রশ্নটা। একদিন সাহসে ভর করে দাদুর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল রামগোলাম। দাদুকে বড় ভয় করত সে। যমদূতের মতো চেহারা। কালো মুখে ইয়া বড় গোঁফ। গোঁফের গায়ে মোম মাখত দাদু। গোঁফের আগা দুটো বড় নাকটির দুই পাশ বেয়ে ওপর দিকে উঠে গিয়েছিল। আগুনে চোখ। গোঁফ, নাক, কালো রং, আগুনে চোখ দুটো নিয়ে ভয়-জাগানিয়া চেহারা ছিল গুরুচরণের। পাড়ার সর্দার ছিল সে। মেথরপট্টির মানুষরা তার কথায় উঠবস করত। বড় মান্য করত তারা গুরুচরণকে। হরিজনদের অধিকার আদায়ের জন্য জান দিতে প্রস্তুত ছিল গুরুচরণ। চট্টগ্রামের চারটি মেথরপট্টির মানুষরা তা জানত। তাই তাদের কাছে গুরুচরণের কথাই শেষ কথা। তারা যেমন তাকে শ্রদ্ধা করত, তেমনি ভয়ও করত। বিশালদেহী কালো রঙের এই গুরুচরণের সামনে দাঁড়িয়ে একদিন জিজ্ঞেস করেছিল রামগোলাম—'আমার এই রকম আজব নাম কে রেখেছিল, দাদু?' মুখে দাদু বললেও রামগোলাম তাকে যমের মতো ভয় করত। ভেতরে ভেতরে থরথর করে কাঁপছিল সে। বাপ শিউচরণও ভীষণ ভয় করত গুরুচরণকে। সেই ভয়টা শিউচরণ পুত্রের মধ্যে চালান করে দিতে পেরেছিল। বাপের সামনে শিউচরণ সর্বদা কুঁকড়ে থাকত। সহজে বাপের মুখোমুখি হতো না। যদি কখনো প্রয়োজন হতো, কাঁচুমাচু মুখ নিয়ে মাথা নিচু করে বাপের সামনে দাঁড়িয়ে অল্প কথায় প্রয়োজন সেরে নিত। দাদুর সামনে বাপের এই মৃতপ্রায় অবস্থা আবাল্য দেখে

BanglaBook.org

এসেছে রামগোলাম। দাদু কোনো দিন তেমন করে ভয় দেখায়নি রামগোলামকে। তবুও কেন জানি দাদুকে দেখলেই তার ভেতর ভয়টা উথালপাথাল করে উঠত। মায়ের কাছে শুনে শুনে আর বাপের জরজর অবস্থা দেখে দাদু বিষয়ে এক দুর্মর ভয় রামগোলামের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছিল। তো, সেদিন এসব ভয়ডরকে এক পাশে সরিয়ে রেখে দাদুর সামনে হাজির হয়েছিল সে। প্রশ্ন শুনে গুরুচরণ হা হা করে হেসে উঠেছিল। হাসির উচ্চগ্রাম শুনে রামগোলামের অন্তরাত্মার খাঁচা ছাড়ার মতো অবস্থা। ভেতর থেকে মন একবার বলে উঠল, 'রামগোলাম, দে দৌড়। দাদুর চোখের সামনে থেকে এক দৌড়ে পালিয়ে যা। নইলে বিপদ।'

রামগোলাম মনের কথা সেদিন শোনেনি। মনকে বলেছিল, 'যত ভয়ই দেখাও আজ, আমি কিন্তু পালাব না। উত্তরটা আমার জানা দরকার। উত্তরটা জেনেই যাব। উত্তর না জেনে দাদুর সামনে থেকে একচুলও নড়ব না; যা থাকে কপালে।'

'কী বললে তুমি? তোমার এ রকম অদ্ভুত নাম কে রেখেছে? হা হা হা।'

হাসতে হাসতেই জিজ্ঞেস করেছিল গুরুচরণ। সেদিন তার মনটা ভালো ছিল। দীর্ঘদিন অঞ্জলি বাঈয়ের সঙ্গে তার কথা বলা বন্ধ ছিল। বড় রাগ করেছিল অঞ্জলি তার ওপর। মদ খাওয়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল গুরুচরণ। বিয়ের পর বাসরঘরেই অঞ্জলি তার হাত চেপে ধরে বলেছিল, 'তুমি আমার কাছে একটা ওয়াদা করবে?'

তরুণ গুরুচরণের মন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল সে রাতে। মনে হয়েছিল স্ত্রী একদিকে, পৃথিবী একদিকে। স্ত্রীর জন্য সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সে পিছপা হবে না। শরীরটা বেশ আলুথালু করছিল সে সময়। মগ্ন চোখে অঞ্জলিকে বলেছিল, 'কী ওয়াদা?'

'বলো, রাখবে?'

'অবশ্যই রাখব।'

'বলো, আর কোনো দিন তুমি দারু খাবে না। আমি জানি, হরিজনপল্লির আর সবার মতো তুমিও দারু গিলো। আমার কসম, আর কোনো দিন দারু খাবে না তুমি!' কোমল থরথর ডান হাতটি দিয়ে গুরুচরণের হাত দুটো মৃদু ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলেছিল অঞ্জলি।

সে রাতে গুরুচরণ কথা দিয়েছিল অঞ্জলিকে, আর কোনো দিন সে মদ খাবে না। জীবনের অনেকটা বছর মদ না খেয়ে পার করে দিয়েছিল সে। কিন্তু সর্দার নির্বাচিত হওয়ার পর অঞ্জলিকে দেয়া ওয়াদা মাঝেমধ্যে ভাঙতে হয়েছে তার।

BanglaBook.org

নানা সামাজিক অনুষ্ঠানে তার সামনে মদ পরিবেশন করা হয়। এটা সম্মানের। আর এই সম্মান সর্দারের প্রাপ্য। অধিকাংশ অনুষ্ঠানে মদ খাওয়া এড়াতে পারলেও কোনো কোনো অনুষ্ঠানে এড়াতে পারত না। সেদিন দু-এক গ্লাস গিলতেই হতো তাকে। লং-এলাচি দেয়া দুই খিলি পান মুখে ভরে দিয়ে ঘরে ঢুকত সে। অনেক কায়দা করে অঞ্জলির সতর্ক খেয়াল এড়িয়ে রাতটা পার করত। আরও যখন বছর গড়াল, শিউচরণ হলো। গুরুচরণের মাঝেসাঝে মদ খাওয়ার সংবাদ অঞ্জলির কানে আসতে লাগল। সেই সন্ত্রস্ত ভাব নিয়ে ঘরে ফিরত গুরুচরণ। অঞ্জলি বুঝতে পারত। বুঝেও কিছু বলত না তাকে। ভাবত—চারটা হরিজনপল্লির এত বড় সর্দার তার স্বামী! তার কথায় পল্লির মানুষ উঠবস করে। তাকে ভয় করে সবাই। আর ওই ভয়-পাওয়ানো সর্দারটি কী কাঁচুমাচু করেই না তার ঘরে ঢোকে! অঞ্জলি জানে, সর্দারের এই আচরণ ভয়ের জন্য নয়, অঞ্জলিকে কথা দিয়ে কথা রাখতে না পারার অপরাধবোধের জন্য। তাতেই তো সুখ। একজন লোক কৃত অপরাধের জন্য স্ত্রীর সামনে সংকুচিত আচরণ করছে, তাতেই তো তার তৃপ্তি। তাই গুরুচরণের মদ খাওয়ার ব্যাপারটি কখনো কখনো টের পেলেও না বোঝার ভান করত অঞ্জলি। এভাবে জীবন থেকে দীর্ঘ সময় খসে গেছে। বয়সের ভারে আর পুত্রের ঘরে বউ-নাতি আসার ফলে মদ একেবারে ছেড়েই দিয়েছিল গুরুচরণ। অঞ্জলির মনে পূর্ণ তৃপ্তি ফিরে এসেছিল। কিন্তু এই সে রাতে, মাস দেড়েক আগে, মদ খেয়ে একেবারে বুঁদ হয়ে ফিরল সর্দার। কালীপুজো ছিল সে রাতে। জমজমাট কালীপুজো হয় বান্ডেল হরিজনপল্লিতে। অঞ্জলিরাও দেখতে গিয়েছিল সে পুজো। ওদের বিদায় করে পুজোমণ্ডপে আরও কিছুক্ষণ থেকে গিয়েছিল গুরুচরণ। রাত গভীর হলে ইয়ার বন্ধুরা চেপে ধরেছিল, আজ দু-এক গ্লাস চাখতেই হবে গুরুচরণকে। না না করেও ইয়ার দোস্তদের চাপাচাপিতে শুরু করতে হয়েছিল গুরুচরণকে। আসর যখন ভাঙল, টলোমলো অবস্থা সর্দারের। আগে সর্দারের পা টলতে দেখেনি কেউ। কিন্তু সে রাতে সত্যিই টলে গিয়েছিল। ওপাড়ার চমনলাল গুরুচরণকে ঘরের দরজায় পৌঁছে দিয়েছিল। দরজা খুলে দিয়ে শুধু একবার কড়া চোখে তাকিয়েছিল অঞ্জলি। ঘরে পুত্র-নাতি-ছেলের বউ। একটা কু-শব্দও করেনি অঞ্জলি। চুপচাপ খাটিয়ায় শুয়ে পড়েছিল ওপাশ ফিরে। পরদিন থেকে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছিল অঞ্জলি। নানা টালবাহানা করে গুরুচরণ কথা বলাতে চাইলেও নির্বিকার চোখে শুধু তাকিয়ে থাকল সে। এক-দুই করে দুই কুড়ি পাঁচ দিন কেটে গেল। হাজার চেষ্টায়ও অঞ্জলির মন গলাতে পারেনি গুরুচরণ। গত রাতে সেই কঠোর কঠিন মন গলে জল হয়ে গেল। দীর্ঘদিনের অসহনীয় বোঝা

BanglaBook.org

গুরুচরণের বুক থেকে সরে গিয়েছিল। তাই আজ সকালে ফুরফুরে মন তার। নাতির কথায় বারবার হেসে উঠছিল সে।

গোঁফের তলার ঠোঁট দুটো একটু প্রসারিত হলো গুরুচরণের। অট্টহাসি মৃদু হাসিতে এসে থমকে গেল। সামান্য সময়ের জন্য তার কপাল কুঁচকে গেল। চোখে যেন কিসের কারিকুরি। গুরুচরণ কেন জানি একটু-সময়ের জন্য আনমনা হয়ে গেল। দশ-বারো বছরের রামগোলামের এসব কিছু বোঝার বোধবুদ্ধি হয়নি। সে স্থির চোখে তাকিয়ে আছে দাদুর দিকে। তার নাম রাখার রহস্য আজ তাকে জানতেই হবে। গুরুচরণ চোখ ফেরাল রামগোলামের দিকে। স্বভাব-বহির্ভূতভাবে গুরুচরণ রামগোলামকে কাছে টেনে নিল। ভয়হীন চোখে দাদুর চোখের দিকে তাকিয়ে রামগোলাম আবার জিজ্ঞেস করেছিল, 'আমার এই রকম আজব নাম কে রেখেছিল?'

'আমি! আমি রেখেছিলাম তোমার নাম। ঘরের ভিতর থেকে কমলা ধাই যখন বলল, শিউচরণের ছেলে হয়েছে, সর্দারের নাতি হয়েছে! তখন ভোরের আজান শেষ হয়েছে মাত্র। উঠানে দাঁড়িয়ে আমি চিৎকার করে উঠেছিলাম, আমার নাতির নাম হবে—রামগোলাম।' বলতে বলতে হঠাৎ চুপ মেরে গেল গুরুচরণ।

'আমার বাবার নাম শিউচরণ, তোমার নাম গুরুচরণ, আমার বন্ধু রাজকুমারের বাবার নাম বাবুলাল। আমার এ রকম অদ্ভুত নাম কেন?' অকম্পিত কণ্ঠে বলেছিল রামগোলাম।

গুরুচরণ চুপচাপ। দৃষ্টি তার দূরের কর্ণফুলীর দিকে। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেও জবাব পেল না রামগোলাম। এবার সাহসে ভর করে দাদুর হাতে একটা জোর ধাক্কা লাগাল। বাস্তবে ফিরে এল গুরুচরণ। মুখে বলল, 'কী কী! কী জিজ্ঞাসা করেছিলে যেন তুমি?'

'নাম! অদ্ভুত নাম! আমার!' কাটা কাটা গলায় বলল এবার রামগোলাম।

'ও হ্যাঁ, কিন্তু রাম, তোমার প্রশ্নের উত্তর তো আমি দিতে পারব না এখন।'

'কেন?'

'উত্তরটা শুনে তার মানে তুমি এখন বুঝতে পারবে না। বোঝার বয়স হয়নি এখনো তোমার।'

রামগোলাম দৃঢ় কণ্ঠে বলল, 'বোঝার বয়স না হোক, তার পরও আমি শুনব। বলো তুমি।'

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল গুরুচরণের ভেতর থেকে। কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলা শুরু করল, 'বড় হতভাগা জাতি আমরা। হিন্দুসমাজে আমরা

BanglaBook.org

অচ্ছুত। বড় অপবিত্র জাতি আমরা। আমাদের ছোঁয়া তো দূরের কথা, আমাদের ছায়া মাড়ালেও হিন্দুরা, বামুনরা অপবিত্র হয়ে যায়। বড় পাপ হয় তাদের। ভয়ংকর নরক রৌরবে যেতে হয় তাদের, যদি না এক দিন উপোস দিয়ে এক লক্ষ বার গায়ত্রীমন্ত্র পড়ে। যেখানেই যাই আমরা শুধু দূর-দূর, ছেই-ছেই শুনি। আমাদের জন্য তাদের মনে এক টাঙ্গি ঘৃণা। তাদের দেখাদেখি মুসলমানরাও আমাদের ঘেন্না করে, মানুষ ভাবে না। জন্তুর মতো আচরণ করে আমাদের সাথে।' বলতে বলতে হাঁপিয়ে ওঠে গুরুচরণ। দম নেয়ার জন্য গুরুচরণ থামে।

গুরুচরণের সব কথা রামগোলাম বুঝতে পারছে না। তার ভেতরেও একধরনের ঘোরের আবর্ত সৃষ্টি হয়েছে। হিন্দু-মুসলমানরা তাদের ঘৃণা করে জন্তু-জানোয়ারের মতো! কেন? আজ তাকে সব কথা জানতে হবে। তাই সে উচ্চ কণ্ঠে বলল, 'তারপর দাদু, তারপর!'

'তারপর আর কী, জানোয়ার হয়ে গেলাম আমরা ওদের কাছে। আমরা ওদের টাট্টিখানা পরিষ্কার করি, বাড়ির আশপাশের আবর্জনা পরিষ্কার করি। কিন্তু তাদের যত্ত ঘেন্না ওই আমাদের জন্য, মেথরদের জন্য। কুকুরকে ওরা কাছে টেনে নেয়, আমাদের দূর দূর করে, কথায় কথায় শালা-বানচোৎ বলে।'

'আমার নাম রাখার সঙ্গে এসবের সম্পর্ক কী?' জিজ্ঞেস করে রামগোলাম। গুরুচরণ বলল, 'যখন জানলাম, তোমার মা গর্ভবতী হয়েছে, ঈশ্বরকে বললাম—হে ভগবান, আমার যেন একটা নাতি হয়; যেন আমার মনের আশা মিটাতে পারি।'

'কী আশা?'

যেন রামগোলামের প্রশ্নটি গুরুচরণের কানে যায়নি, যেন তার কণ্ঠে কী যেন এক গভীর আবেগ ভর করেছে। গুরুচরণ বলতে শুরু করে আবার, 'ধাইয়ের কথা শুনে পূর্ব দিকে ফিরে আমি চিৎকার করে বলে উঠেছিলাম, আমার নাতির নাম হবে রামগোলাম। হিন্দুদের দশ অবতারের একজন রামচন্দ্র, তাঁকে বড় শ্রদ্ধা করে হিন্দুরা, বড় ভালোবাসে। গোলাম মুসলমানি নাম। এ দুটো জোড়া লাগিয়ে আমি তোমার নাম রেখেছিলাম রামগোলাম।' তারপর মৃদু কণ্ঠে গুরুচরণ আরও বলেছিল, 'এ দুটো নামের খাতিরে হলেও অন্তত হিন্দু আর মুসলমানরা তোমাকে ঘৃণা করবে না, লাথি-কিল দেবে না, শালা-বানচোৎ করবে না।'

সেদিন আর কোনো কথা বলেনি গুরুচরণ। আরও অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল রামগোলাম দাদুর পাশে। কিন্তু এক কঠিন-কঠোর আবরণে গুরুচরণের মুখ ঢেকে গিয়েছিল সেদিন। আস্তে আস্তে দাদুর সামনে থেকে সরে এসেছিল রামগোলাম।

BanglaBook.org

দুই

নদী তো এঁকেবেঁকেই চলে। কিন্তু কর্ণফুলী চট্টগ্রাম শহরের দক্ষিণ পাশ দিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিমে বেশ ক'মাইল একেবারে সোজা বয়ে গেছে। নদীর জন্যই শহর। কর্ণফুলী না থাকলে চট্টগ্রাম শহর গড়ে উঠত না। পৃথিবীর প্রায় সব শহর গড়ে ওঠার পেছনে নদীর অবদান আছে। এই কর্ণফুলীর পাড়েই মাঝিরঘাট-সদরঘাট, জাহাজ ভেড়ার জেটি, কাস্টম হাউস। এই নদীর কারণেই বিদেশিদের আগমন-আক্রমণ, ব্যবসা-শোষণ, ইংরেজ রাজত্ব, ব্রিটিশ পীড়ন। এই নদীর পাড়েই ব্রিটিশদের আবাসস্থল পাথরঘাটা-ফিরিঙ্গিবাজার। ইংরেজ আমলে বনেদি ব্রিটিশরা বাস করত পাথরঘাটায়। তাদের জন্য রম্য-অট্টালিকা, তাদের জন্য সেন্ট প্লাসিডস ও সেন্ট স্কলাস্টিকা স্কুল, তাদের কারণেই প্রার্থনালয়-গির্জা। বংশাল রোডের পাশে বসানো হলো বাজার। স্থানীয়রা গোরা ব্রিটিশদের বলত ফিরিঙ্গি। এই ফিরিঙ্গিদের জন্য নির্ধারিত বাজারটি স্থানীয়দের মুখে মুখে ফিরিঙ্গিবাজার নামে পরিচিতি লাভ করল।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে তাদের ঝোঁক। ব্রিটিশদের ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, নালা-নর্দমা, তাদের টাট্টিখানা পরিষ্কার থাকা চাই। এ জন্য প্রয়োজন ঝাড়ুদারের, প্রয়োজন মেথরের। পবিত্র রাখার এই অপবিত্র সম্প্রদায়টিকে কাছে রাখা চাই। ব্রিটিশ আবাসস্থল থেকে নিরাপদ দূরত্বে অথচ প্রয়োজনে যাতে কাছে পাওয়া যায়, এমন জায়গায় এই মেথরদের থাকতে দেয়া হলো।

ফিরিঙ্গিবাজার থেকে একটু দূরে, কর্ণফুলীর একেবারে কোল ঘেঁষে তৈরি করা হলো ফিরিঙ্গিবাজার সেবক কলোনি। পাঁচতলার দুটো বিল্ডিং। একটি বিল্ডিংয়ের তিনতলার চৌদ্দ নম্বর ঘরে গুরুচরণ থাকে। নামে কলোনি, আশপাশের সভ্যভব্য মানুষরা বলে মেথরপট্টি। ফিরিঙ্গিবাজার মেথরপট্টিতে সত্তরটি পরিবার থাকে। তার মধ্যে থাকে গুরুচরণের পরিবারও। প্রত্যেক পরিবারের জন্য দুটো কামরা বরাদ্দ। একটি রান্নাঘর আর অন্যটি শোবার ঘর।

প্রতিটি পরিবারের তিনটি জেনারেশন একসঙ্গে থাকে। দাদা-দাদি, মা-বাপ

BanglaBook.org

আর ছেলেমেয়ে নিয়ে পরিবারে নয়-দশজন সদস্য। গুরুচরণ সর্দার হলে কী হবে, অঞ্জলির হাতেই সংসার। শিউচরণ ছাড়া গুরুচরণের দুটো মেয়ে। কম বয়সে বিয়ে দেয়ার রেওয়াজ এই সমাজে। বারো-তেরো হতে না-হতেই গুরুচরণ মেয়ে দুটোর একটিকে মাদারবাড়ি ও অন্যটিকে বান্ডেল মেথরপট্টিতে বিয়ে দিয়ে দিল। শিউচরণের বয়স যখন বিশ পেরোলো, গুরুচরণ অঞ্জলিকে বলল, 'এবার শিউচরণকে বিয়া করাব।'

অঞ্জলি তরকারি কুটা থেকে চোখ তুলে বলল, 'এত কম বয়সে...!'

হা হা করে হেসে উঠেছিল গুরুচরণ, 'কম বয়স বললে কার? তোমার বিয়ার সময় আমার বয়স কত ছিল, মনে নেই তোমার?'

'আঠারো।' অঞ্জলি নিচু স্বরে বলেছিল।

'তো? আমার চেয়ে ছেলের বয়স দুই সাল বেশি হয়ে গেছে। এই বছরেই বিয়া দেব আমি তার।'

'মেয়ে পাবে কোথায়? তা ছাড়া এইমাত্র শিউচরণ করপোরেশনের চাকরিতে ঢুকেছে। বেতনই বা কত পাবে? টানাটানির সংসার, বউ এলে সংসারে অভাব বাড়বে।' একটানা কথাগুলো বলে থামল অঞ্জলি।

গুরুচরণ বলল, 'মেয়ে আমার দেখা আছে। বললে তুমিও চিনবে। গত দোলযাত্রায় আমাদের পট্টিতে মেয়ে নিয়ে এসেছিল নিরঞ্জন। ঝাউতলার মুখ্য নিরঞ্জনের কথা বলছি আমি। চিনেছ তো?'

অঞ্জলি মাথা নাড়ে, মুখে কিছু বলে না। গুরুচরণ বলে, 'শুধু মাথা নাড়লে যে? ছেলের বিয়ে হোক, চাও না তুমি?'

'চাই। তো, ওই যে বলছিলাম, অভাব।'

'অভাবের কথা নিয়ে তুমি মাথা ঘামাইয়ো না। আমি চাকরি করছি, ছেলে বেতন পাবে। দুইজনের বেতন দিয়ে বউয়ের দাবি মিটাতে পারব না?' বিভোর কণ্ঠ গুরুচরণের।

কোনো জবাব দেয় না অঞ্জলি। চুপচাপ তরকারি কুটে যায়। গুরুচরণ বলে, 'কিছু বলছ না যে?'

'ছেলে বিয়া করালে থাকবে কোথায়? একটিমাত্র ঘর। ছেলে বউ নিয়ে থাকবে কোথায়?' দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে অঞ্জলি বলে।

এবার হুট করে গুরুচরণ আর উত্তর দেয় না। উচ্ছল গুরুচরণ বেলুনের মতো চুপসে যায়। ঝিম মেরে থাকে বেশ কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে অঞ্জলিকে বলে, 'রান্নাঘরে শোব আমরা। আমার বাপ-মাও তা-ই করেছিল। ছেলে এই ঘরেই নয়া বউ নিয়ে সংসার পাতবে।'

BanglaBook.org

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল গুরুচরণ। তারপর করুণ কণ্ঠে বলল, 'এই আমাদের জীবন। ছেলে বিয়া করালে মা-বাপকে পাকঘরে ঢুকে পড়তে হয় অথবা বারান্দায় খাটিয়া পাততে হয়। আমাদের মানুষ বাড়ে, ঘর বাড়ে না। চোখ বুজে পশুর মতো জীবন কাটাতে হয় আমাদের। তা-ও ভাগ্য, একটা ছেলে আমাদের। দুই-তিনটা ছেলে হলে কী দশা হতো আমাদের সংসারের, ভেবে দেখেছ?' অঞ্জলির দীর্ঘশ্বাসের আওয়াজ শুনতে পায় গুরুচরণ।

শিউচরণের ঘরে বউ এল। নিরঞ্জনের মেয়েকেই পুত্রবধূ করে আনল গুরুচরণ। বড় ভালো মেয়ে চাঁপারানী। বিয়ের পরপরই শাশুড়ির হাতের কাজ কেড়ে নেয় সে। রান্নাবান্না করে, ঘরদোর ঝাড়মোছ করে। অঞ্জলি নিশ্চিন্তে চাকরিতে যায়। মেথরপট্টির পুরুষরা রাস্তাঘাটের আবর্জনা টানে, বাড়ি বাড়ি থেকে টাট্টি টানে আর মেয়েরা পরিষ্কার করে রাস্তা। মেথরপট্টির প্রায় সব পুরুষ-নারী মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনে চাকরি করে। আঠারো বছর পেরোলেই চাকরি পাওয়ার অধিকার জন্মে তাদের। চাঁপারানীর এখনো আঠারো হয়নি, তাই ঘর-সংসার সামলায় সে।

আঁধার থাকতে থাকতেই বেরিয়ে পড়ে গুরুচরণ আর শিউচরণ। সূর্যের আলো ফোটার আগেই কাজে যোগ দেয়ার নিয়ম তাদের। গুরুচরণ ড্রাইভার, তুফান মেইলের চালক। তুফান মেইল টাট্টি টানার ট্রাক। চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের দু'ধরনের ট্রাক আছে। আবর্জনা টানার আর গু টানার। রাস্তার আবর্জনা টানার জন্য লক্কড়ঝক্কড় তিনটি ট্রাক। ভোর-সকালে মেথররা অলিগলি থেকে ট্রলিতে করে আবর্জনা এনে এনে বড় রাস্তার পাশে রাখে, সেখান থেকে ওগুলো ট্রাকে তুলে নেয়া হয়; নিয়ে যাওয়া হয় দূরের হালিশহরের সমুদ্রের পাড়ে, বহদ্দারহাটের খানাখন্দে। শিউচরণ ওই তিনটি ট্রাকের একটিতে কাজ করে। তার কাজ রাস্তা থেকে টুকরিতে করে ময়লা-আবর্জনা ট্রাকে তোলা আর গন্তব্যে পৌঁছে আবর্জনাগুলো ট্রাক থেকে নামিয়ে দেয়া। এই কাজ করতে প্রথম প্রথম খুব ঘেন্না লাগত শিউচরণের। রাস্তার পাশ থেকে আবর্জনা টুকরিতে ভরে সে যখন মাথায় বা ঘাড়ে নিয়ে ট্রাকের দিকে রওনা দিত, তখন কখনো ঝরঝর, কখনো টুপটাপ করে ঝরে পড়া নোংরা জল তার সমস্ত শরীর ভিজিয়ে দিত। অসহ্য দুর্গন্ধ। প্রথম প্রথম বমি আসতে চাইত তার। একদিন তো ঘাড় থেকে আবর্জনার টুকরি ফেলে গলগল করে বমি করে দিল শিউচরণ। বাপ বলেছিল, 'প্রথম প্রথম ওই রকম হবে বাপজি। তারপর ঠিক হয়ে যাবে। না সইলেও উপায় নেই। আমাদের বাঁচার অন্য কোনো পথ নেই। গু-মুত টেনেই আমাদের জীবন পার হয়।'

BanglaBook.org

বাপের কথায় মনে সাহস এসেছিল শিউচরণের, কিন্তু সহজে স্বস্তি আসেনি। অন্যের কথায় বা বাঁচার তাগিদে মনে সাহস আসে মানুষের, কিন্তু চাইলেই স্বস্তি আসে না। নিজের ভেতরের মন্দ লাগাটা ভালো লাগায় রূপান্তর করতে অনেক সময় লাগে। স্বস্তি ফিরে আসতে অনেক সময় লেগেছিল শিউচরণের। সে দেখত, সঙ্গীরা নির্দ্বিধায় নোংরা দুর্গন্ধময় আবর্জনা বহন করে গাড়িতে তুলছে বা গাড়ি থেকে নামাচ্ছে। গা-হাত-মুখের পচা পানি কোমরে বাঁধা গামছা দিয়ে অবলীলায় মোছে তারা। এসব দেখতে দেখতে একটা সময় শিউচরণের গা-গুলানো ভাব চলে গেল। তার ঘ্রাণশক্তি কমে এল। সে অবাক বিস্ময়ে খেয়াল করল—আবর্জনাগুলোর কোনো দুর্গন্ধ নেই, গায়ে-মুখে ঝরে পড়া পানিগুলো যেন করপোরেশনের টিপকলের পানি। এখন সে অতিসহজে আবর্জনা ভরা ও খালাসের কাজ করে যায়। এখন শিউচরণের মনে কোনো অস্বস্তি নেই, বরং আনন্দে ভরা মন তার। জরুরি কাজটা শেষ করে ঘরে ফেরার জন্য শিউচরণের মনটা আনচান করে। একটু তাড়াতাড়ি ফিরতে পারলে তার লাভ। মা আর বাপ ফিরতে ফিরতে দুপুর হয়ে যায়। দুপুরের আগে ফিরতে পারলে বউটাকে একটু একা পাওয়া যায়। চাঁপারানীকে জড়িয়ে ধরে দেহের তাপটা শীতল করা যায়। কিন্তু ড্রাইভার—বান্ডেল রোডের বাল্লু—বড় নচ্ছার, ছুটি দিতে চায় না। খাচ্ছর-খাচ্ছর কথা বলে। বলে, 'কিরে শিউচরণ, ঘর যাবার জন্য এত উসখুস কেনে? এখন মা-বাপ নাই ঘরে, সুবিধা নিতে চাস? এখন খুব চাপাচাপি করতে পারবি, তাই না?' দাঁতের ফাঁকে খিলাল ঢুকিয়ে গুঁতিয়ে পানের গুঁড়াগুলো থু থু করে মাটিতে ফেলতে ফেলতে বাল্লু আবার বলতে শুরু করে, 'যা যা, তোরে ছুটি দিলাম, ঘরে যা। কিন্তু সাবধান, নতুন বউ, সাবধানে নাড়াচাড়া করবি। লেপ্টালেপ্টি করতে গিয়ে খাটিয়াটা ভেঙে ফেলিস না যেন।'

মুখ দিয়ে ভক-ভক করে এই রকম ময়লা কথা বেরিয়ে এলেও মনটা ভালো বাল্লুর। সে কোনো কোনো দিন ছুটি না চাইলেও ছুটি দিয়ে দেয়। বলে, 'যা যা, ঘরে যা। তোরে ছুটি দিলাম। ফুর্তিফার্তি কর গিয়া।' কোমর থেকে গামছা খুলে মুখ মুছতে মুছতে শিউচরণ যখন ঘরের দিকে রওনা দেয়, একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে বাল্লু। বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে তার। তার একটা ছেলে ছিল, বউ তাকে পরোটা আনতে পাঠিয়েছিল সকালবেলা। কোর্টহিলের নিচে কর কোম্পানির চা-দোকানের সামনেই গাড়িচাপা পড়েছিল ছেলেটি। ওখানেই মরে পড়ে ছিল ছাওয়ালটি। মেথরের ছেলে বলে কেউ ছুঁয়েও দেখেনি। বাল্লু ফিরে দেখেছিল, বউটি তার ছেলের থেঁতলে যাওয়া শরীরটি বুকে চেপে আকুল হয়ে কাঁদছে উঠানে। পড়শিরা ধরাধরি করে ছেলেটার নিথর দেহটাকে পাড়ার ভেতর

BanglaBook.org

নিয়ে এসেছিল। সেই থেকে বউটি তার উদাস উদাস হয়ে গিয়েছিল। কথাবার্তা একেবারে থামিয়ে দিয়েছিল। কাজে যেত, ঘরে এসে রান্নাবান্না করত। আর দীর্ঘ সময় নিয়ে ছেলের জামাকাপড় ভাঁজ করত। কেন জানি বাল্লুর আর কোনো সন্তান হলো না। সন্তানের কথা বললেই বউটি বোবাদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত বাল্লুর দিকে। চোখেমুখে পাগলা পাগলা ভাব দেখে কথা বাড়াত না বাল্লু। ছেলেটা বেঁচে থাকলে এই শিউচরণের মতোই হতো এত দিনে।

অঞ্জলি গুরুচরণের আগে ফেরে। তা-ও বেলা গড়িয়ে পশ্চিমে। কখনো ঘাট ফরহাদবেগে, কখনো নজুমিয়া লেইনে আবার কখনো কোতোয়ালির মোড়ের রাস্তায় ডিউটি পড়ে অঞ্জলির। দু-তিনজনে মিলে রাস্তা সাফাইয়ের কাজ করে। বাল্লুর স্ত্রী ও অঞ্জলির মাঝেমধ্যে একসঙ্গে ডিউটি পড়ে। চারটি মেথরপট্টির শতাধিক নারী করপোরেশনে চাকরি করে। তিন-চারজনের উপদলে বিভক্ত হয়ে কাজ করতে হয় তাদের। করপোরেশনের জমাদার তাদের ডিউটি ভাগ করে দেয়। সবাই যে রাস্তা সাফাইয়ের কাজ করে, তা নয়। করপোরেশনের অফিসে, অফিসের বড়-ছোট সাহেবের বাংলোতেও ডিউটি পড়ে তাদের। প্রতিদিন ডিউটি বণ্টনের সময় অঞ্জলি জমাদারকে বলে, 'কোকিলা দিদিকে আমার সঙ্গে দিলে বড় খুশি লাগবে সাহাব।'

'কেন? বাল্লুর বউয়ের সঙ্গে তোর কী এত খাতির?' জমাদার বলে।

'কিছু না, কিছু না। এমনি এমনি। কোকিলা দিদির সঙ্গে কাজ করতে ভালো লাগে—এই আর কি।' তাড়াতাড়ি বলে অঞ্জলি।

কৃত্রিম রাগী কণ্ঠে জমাদার বলে, 'না, তোদের একসাথে দেব না। আমার কাছে খবর আছে, তোরা দুইজনে কাম ফেলে শুধু কথা বলিস।'

অঞ্জলি জিহ্বায় কামড় খেয়ে বলে, 'তওবা তওবা সাহেব, আমরা কামচোর নই। কাম শেষ হলে একটু সুখ-দুঃখের কথা বলি—এই আর কি।'

জমাদার হাসতে হাসতে বলে, 'যা, তোদের যত দিন মন চায় তত দিন একসঙ্গে কাম করিস। কিন্তু খবরদার, কামে ফাঁকি দিস না। তাহলে সাহেবের কাছে জবাব দিতে হবে আমার।'

এতক্ষণে কোকিলা কথা বলে। দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে বলে, 'বহুত শুকরিয়া সাহাব।'

অঞ্জলি বলে, 'তাহলে আমরা কামে যাই, সাহাব?'

জমাদার বলে, 'যা যা। দুজনে গলাগলি করে কামে যা।'

অঞ্জলি আর কোকিলার বয়সের তেমন তফাত নেই। দু-এক বছর এদিক-ওদিক। বয়সে অঞ্জলি বড়ই হবে। তিন সন্তানের মা সে। কোকিলারও তা-ই

BanglaBook.org

হতো। কিন্তু প্রথম সন্তানটি গাড়িচাপা পড়ার পর কী এক অলৌকিক কারণে তার আর সন্তান হলো না। সন্তানহারা এই নারীটির প্রতি বড় দরদ বোধ করে অঞ্জলি। সুযোগ পেলে দুজনে রাস্তার ধারে কাছাকাছি বসে। তখন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অঞ্জলির মেয়ের কথা, বউটির কথা জিজ্ঞেস করে কোকিলা। শিউচরণের কথা কখনো জিজ্ঞেস করে না কোকিলা। দীর্ঘদিন ধরে ব্যাপারটি খেয়াল করছে অঞ্জলি। একদিন অঞ্জলি কোকিলাকে জিজ্ঞেসই করে ফেলে। বলে, 'বহিন, তুমি শুধু আমার মেয়েদের কথা, শিউচরণের বউয়ের কথা জিজ্ঞেস করো। কিন্তু কোনো দিন শিউচরণের কথা জিজ্ঞেস করো না কেন?'

প্রশ্ন শুনেই চুপ মেরে যায় কোকিলা। মুখর কোকিলা একেবারে বোবা হয়ে যায়। পাকা রাস্তার পিচে ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে খোঁচাতে থাকে। কোকিলাকে নীরব দেখে অঞ্জলি আবার বলে, 'আমার কথার জবাব দিলে না দিদি?'

কোকিলা রাস্তার কালো পিচ থেকে অঞ্জলির দিকে মুখ তোলে। কোকিলার গণ্ড বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

অঞ্জলি তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'আমার ভুল হয়ে গেছে, দিদি। আমাকে মাফ করে দাও। আমার কথায় তুমি দুঃখ পাবে, বুঝিনি দিদি। মাফ করো আমাকে।'

কোকিলা ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। অঞ্জলির দুই হাত চেপে ধরে আস্তে আস্তে বলে, 'আমাকে ভুল বুঝো না, অঞ্জলি দিদি। বুকে পাথর চাপা দিয়ে ছেলের কথা ভুলে থাকি। তোমার ছেলের কথা জিজ্ঞেস করি না, আমার ছেলের কথা মনে পড়ে যায় বলে। তোমার কথায় আমার ছেলেটির কথা মনে পড়ে গেল। তাই কান্না ধরে রাখতে পারিনি।' বলতে বলতে থেমে যায় কোকিলা। সেদিন দুজনের মধ্যে আর তেমন কথা হয় না। ঝাড়ু-ট্রলি-ঝুড়ি জমাদারের কাছে জমা দিয়ে ঘরের দিকে রওনা দেয় দুজনে।

পাঁচতলার দুটো বিল্ডিং, পাশাপাশি। একটা পূর্বমুখী, উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। দক্ষিণে যেখানে গিয়ে বিল্ডিংটি শেষ হয়েছে, ঠিক সেখান থেকেই অন্য বিল্ডিংটি তৈরি করেছে সরকার। দ্বিতীয় বিল্ডিংটি পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। দুটো বিল্ডিংয়ের সামনে বড় খোলা একটা চত্বর। ওই চত্বরের পূর্ব পাশ ঘেঁষে পাঁচটি পায়খানা, পাশাপাশি। প্রতিটি বিল্ডিংয়ের ছাদে একটি করে পানির ট্যাংক। ওই ট্যাংকে সকাল-বিকেল দুবেলা পানি তোলা হয়। মাপা পানিতে এই পট্টির মানুষের জীবন চলে। দুটি বিল্ডিংয়ের সত্তরটি ঘরে পাঁচ শতাধিক মানুষ বাস করে। প্রথম বিল্ডিংয়ের তৃতীয় তলার একেবারে দক্ষিণের ঘরে থাকে গুরুচরণ। পট্টির সবাই এই বিল্ডিংকে সর্দারজির বিল্ডিং বলে। ওপরে ওঠার একটামাত্র সিঁড়ি। সিঁড়ির

BanglaBook.org

দুদিকে ঘর। ঘরের সামনে দিয়ে ছোট্ট বারান্দা বেয়ে অন্য ঘরে যেতে হয়। যেতে যেতে চোখ চলে যায় ঘরের ভেতর। পর্দার বালাই নেই কোনো ঘরে। জানালা-টানালা তেমন নেই। ঘরের মধ্যে আলো-বাতাসের চলাচল নেই বললেই চলে। আলো-বাতাসের জন্য সেই সকাল থেকে প্রতিটি ঘরের সামনের দরজা হাট করে খুলে রাখে মেয়েরা। ঘরের ভেতরের আব্রু বলে কিছু নেই মেথরপট্টিতে। সবাই সবার হাঁড়ির খবর জানে। প্রতিটি ঘরে জীর্ণ খাটিয়া, রংহীন থালাবাসন, ছালতোলা মেঝে, পলেস্তারা খসানো দেয়াল। গুরুচরণের ঘরটি একেবারে দক্ষিণে বলে আব্রুর সংকট থেকে মুক্ত। তার ঘরের সামনে দিয়ে অন্য ঘরে যেতে হয় না বলে ছোট্ট বারান্দাটিও নিজের মতো করে ব্যবহার করতে পারে। কোনো কোনো দিন ঘরে ফিরে অঞ্জলি দেখে, বউটি ঘরকন্নার কাজ শেষ করতে পারেনি। বউটি অপরাধী কণ্ঠে বলে, 'মা, পানি ছিল না বলে রান্না শেষ করতে পারিনি এখনো। ছাদের টাংকিতে পানি তুলতে দেরি করেছে।'

অঞ্জলি কোনো জবাব দেয় না। মিষ্টি হেসে বউয়ের সঙ্গে কাজে হাত লাগায়। ভাবে, কিছুক্ষণ পরেই শিউচরণ ফিরবে, তার বাবা সর্দারজি ফিরবে। বড় ক্ষুধা নিয়ে ফিরবে তারা। আসার সঙ্গে সঙ্গে ভাত খেতে না পেলে বড় কষ্ট পাবে তারা। তাড়াতাড়ি হাত চালায় অঞ্জলি।

সারা চট্টগ্রাম শহরে টাট্টি টানার গাড়ি একটি—তুফান মেইল। গাড়িটি লক্কড়ঝক্কড়। সামনে হ্যান্ডেল ঢুকিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে হেলপার যখন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যে গাড়ি আর স্টার্ট নেবে না, ঠিক তখনই গোঁ গোঁ করে ওঠে ইঞ্জিন। স্টার্ট নিয়েই বড় বড় শ্বাস ফেলতে থাকে গাড়িটি, ইঞ্জিন থেকে ঘন ধোঁয়া বের হয়ে ড্রাইভারের সামনের আয়না ঝাপসা করে ফেলে। ড্রাইভারের আসনের পেছনের অংশে দুটি মোটা রডের ওপর বিরাট একটা টিনের ছাউনি। ড্রাইভারের পেছন থেকে বডির শেষ মাথা পর্যন্ত এই ছাউনিটি বিস্তৃত। ছাউনিটি খড়ের ঘরের দোচালার মতো ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত নেমে এসেছে। তিন দিক খোলা। গাড়ির মধ্যে চল্লিশটার মতো পাতি টিন বসানো যায়। গু বহনকারী পাতি টিন ওগুলো। বাড়ি বাড়ি থেকে গুয়ের পাতি টিনগুলো বাঁকের দুই প্রান্তে দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে তুফান মেইলের কাছে নিয়ে আসে মেথররা। বাঁক থেকে খুলে টিনগুলো তুফান মেইলের খোলা অংশ দিয়ে ভেতরের দিকে ঠেলে দেয়। খালি দুটো টিন বাঁকে ঝুলিয়ে অন্য গলির অন্য বাড়ির দিকে রওনা দেয় তারা। এভাবে গোটা শহর ঘুরে ঘুরে টাট্টি সংগ্রহ করে তুফান মেইল। গু-ভর্তি সব পাতি টিন যখন তুফান মেইলে জমা হয়, তখন ছিপাতলির উদ্দেশে রওনা দেয় ড্রাইভার। ছিপাতলির টিলার নিচে বিরাট গভীর একটি কূপ। কূপের মাথায় বিশাল একটা টিনের ছাতা। কূপের

BanglaBook.org

চারদিক গোলাকার করে ইট-সিমেন্টে বাঁধানো। একবুক সমান উঁচু। কূপ ঘেঁষেই তুফান মেইলকে দাঁড় করায় ড্রাইভার গুরুচরণ। দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে সে তুফান মেইলের ড্রাইভার। তুফান মেইলের কলকব্জা, গতিপ্রকৃতি—সব গুরুচরণের নখদর্পণে। কয়বার হ্যান্ডেল ঘোরালে তুফান মেইল স্টার্ট নেয়, তা-ও গুরুচরণের জানা। তুফান মেইল নামটি পৌর করপোরেশন দেয়নি। গুরুচরণই সাদা রং দিয়ে গাড়িটির গায়ে তুফান মেইল লিখে দিয়েছিল একদা। সে আজ থেকে প্রায় ত্রিশ বছর আগের কথা। সবেমাত্র গু টানার গাড়িটি চালানোর দায়িত্ব পেয়েছে গুরুচরণ। জমাদারের ইঙ্গিতে মাস সাতেক আগে গাড়ি চালানোটা শিখে নিয়েছিল গুরুচরণ। জমাদার বলেছিল, 'ডেরাইভারিটা শিখে রাখ গুরুচরণ, একদিন কাজে লাগবে।' বার্ধক্যের কারণে গু টানার গাড়িটির ড্রাইভারের চাকরি চলে গেলে জমাদার করপোরেশনের বড়বাবুর কাছে নিয়ে গিয়েছিল গুরুচরণকে। বলেছিল, 'বড় ভালো ছেলে গুরুচরণ, স্যার। ফিরিঙ্গিবাজার মেথরপট্টিতে থাকে। শক্তি ও সাহস দুটোই রাখে, স্যার। ডেরাইভারিটা গুরুচরণকে দেন, স্যার।' বড়বাবু গভীর চোখে গুরুচরণের দিকে তাকিয়ে ছিলেন কিছুক্ষণ। গুরুচরণকে কিছু না বলে জমাদারের দিকে মুখ ফিরিয়েছিলেন সেদিন বড়বাবু। বলেছিলেন, 'কাল সকালে ওকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলো।' বলেই ফাইলে মনোনিবেশ করেছিলেন তিনি।

পরদিন থেকেই গুরুচরণ গু টানার গাড়িটির দায়িত্ব পেয়ে গেল। ওই দিন গুরুচরণের আনন্দ দেখে কে? কোমর থেকে গামছা খুলে ড্রাইভারের সিট, ড্রাইভিং হুইল বারবার ঘষে ঘষে মুছেছিল গুরুচরণ। বালতি বালতি পানি ঢেলে গাড়িটিকে ধুয়েমুছে একেবারে তকতকে-ঝকঝকে করে ফেলেছিল। তারপর গাড়িতে ভক্তিভরে মাথা ঠেকিয়ে 'জয় মা কালী' বলে পাদানিতে পা রেখেছিল গুরুচরণ। চারজন সঙ্গী নিয়ে গোটা সকালটা চষে বেড়ায় গুরুচরণ। বড় বড় রাস্তার মোড়ে জনচলাচল থেকে একটু দূরে গাড়িটি দাঁড় করায় সে। অলিগলি থেকে কাঁধে করে গু আসতে থাকে। সঙ্গী চারজন ঝটপট গু-ভর্তি পাতি টিন গাড়ির ওপর তুলে নেয়।

নিত্যদিনের কাজ শেষ হলে আন্দরকিল্লার করপোরেশন অফিসের মাঠের এক কোণে গাড়িটি দাঁড় করিয়ে চাবিটি জমাদারের হাতে জমা দিয়ে ঘরের দিকে রওনা দেয় গুরুচরণ।

একদিন গাড়ি নিয়ে মাঠে গিয়ে গুরুচরণ দেখল, রংমিস্ত্রিরা করপোরেশনের বিল্ডিংয়ের দেয়ালে সাদা রং লাগাচ্ছে। থুতনির নিচে বাম হাতের চেটো রেখে কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল গুরুচরণ। তারপর গাড়ি থেকে ছোট্ট একটা পট নিয়ে

BanglaBook.org

মিস্ত্রির দিকে এগিয়ে গেল। রং-ভর্তি পট নিয়ে গাড়িটির কাছে এসে ডান হাতের মধ্যমা পটে ডুবিয়ে ডুবিয়ে বড় বড় করে গাড়িটির গায়ে লিখল 'তুফান মেইল'। সেই থেকে চট্টগ্রাম শহরের গু টানার গাড়িটির নাম হয়ে গেল তুফান মেইল। ঢাকা-চট্টগ্রাম-ঢাকার গতিশীল ট্রেনটির নাম চট্টগ্রামের গু টানার গাড়িটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল সেদিন থেকেই।

তিন

বাপ গুরুচরণের পর শিউচরণ তুফান মেইলের ড্রাইভারির চাকরিটা নেয়নি। শিউচরণ বাপের মতো দাপুটে নয়; শান্ত, নিরীহ সে। করপোরেশনের সাধারণ চাকরিতেই সে তৃপ্ত। অধিক বেতন পাওয়ার লোভ বা করপোরেশনের ময়লা টানার কোনো গাড়ির ড্রাইভারি পাওয়ার বাসনা—কোনোটিই ছিল না তার। বাপের ডাকাবুকো ভাবটা তার মধ্যে নেই। মায়ের অচঞ্চল চারিত্র্যই তার মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে। বাপ কতবার বলেছে, 'ডেরাইভারিটা শিখে নে শিউ, একদিন কাজে লাগবে।' বাপের সামনে শিউচরণ যথারীতি মাথা নিচু করে থেকেছে। কিছু বলতে গিয়ে ঢোঁক গিলেছে সে।

গুরুচরণ আবার বলেছে, 'কী? কিছু বলছ না যে? আমার চাকরি শেষ হবার পর ডেরাইভারিটা তুমি পাবে। বড়বাবু আর জমাদারের হাত-পা ধরে ব্যবস্থা করব।' ছেলের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বলে গুরুচরণ। এবার ভীরু চোখ মাটি থেকে বাপের দিকে তুলল শিউচরণ। দ্বিধা কাটিয়ে বলল, 'বাবা, ডেরাইভারিটা আমি করতে চাই না।'

'কেন? কেন করতে চাও না? জানো, ডেরাইভারিতে বেতন কত বেশি?'

'জানি বাবা।' বলে শিউচরণ।

'তাহলে? যে চাকরিতে তোমার বেতন বাড়বে, বেতন বাড়লে সংসারে সুখ আসবে—সে চাকরি তুমি করতে চাও না কেন? মা ছাড়া তোমার ছেলে হয়েছে, সংসারের খরচ বেড়েছে। আমার চাকরি চলে গেলে সংসারের আয় কমবে। তখন বড় কষ্টে পড়ে যাব আমরা।' শান্ত-কোমল কণ্ঠে ছেলেকে বাস্তবতা

BanglaBook.org

সম্পর্কে বোঝাতে চাইল গুরুচরণ।

'তার পরও বাপ, আমার ওই চাকরি করতে ইচ্ছে করে না।' বাপের চেয়েও শান্ত কণ্ঠে বলে শিউচরণ।

এবার গুরুচরণ গর্জে ওঠে, 'কেন ইচ্ছে করে না তোমার ওই চাকরি করতে? হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে চাইছ? আমার মৃত্যুর পর যখন মা-বউ-বেটাকে খাবার দিতে পারবে না, মনের দুঃখে রাস্তায় রাস্তায় ফ্যা ফ্যা করে ঘুরবে, তখন মনে পড়বে এই গুরুচরণের কথা।'

অঞ্জলি বউ চাঁপারানীর সঙ্গে রান্নার কাজে হাত লাগিয়েছিল। স্বামীর গর্জন শুনে অনেকটা দৌড়ে এল গুরুচরণের সামনে, 'কী হলো, কী হলো? অত চেঁচাচ্ছ কেন? শিউচরণ আবার কী দোষ করল? ঘরে বউ, শিউচরণ দোষ যদি করেই থাকে, চুপকে চুপকে ধমকাও।'

গুরুচরণ আরও উচ্চ স্বরে বলে, 'কী ধমকাব আমি? ধমকানিতে কাজ হচ্ছে? ডেরাইভারির চাকরি করবে না! করপোরেশনের বড়বাবু হবে!' গুরুচরণের শেষ দিকের কথায় তাচ্ছিল্যই ঝরে পড়ে।

গুরুচরণের কথার মাথামুন্ডু কিছুই বুঝল না অঞ্জলি। গুরুচরণের তর্জনগর্জন আর শিউচরণের অসহায় ভঙ্গি অঞ্জলিকে দ্বিধায় ফেলে দিল। শেষ পর্যন্ত ছেলের দিকে তাকিয়ে অঞ্জলি জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে শিউ? তোমার বাপ এত চেঁচাচ্ছে কেন? বাপের সঙ্গে বিয়াদপি করেছ?'

ভীত চোখ তুলে মায়ের দিকে তাকায় শিউচরণ। বাপও শুনতে পায়-মতো করে বলে, 'মা, টাট্টির গন্ধ আমি সইতে পারি না। বড় ঘেন্না লাগে আমার। ময়লা-আবর্জনা সাফ করতে গিয়ে কতবার বমি করেছি। বমি করতে করতে রাস্তায় লুটিয়ে পড়েছি। কষ্ট পাবে বলে তোমাদের বলিনি। আবর্জনার গন্ধ সয়ে নিতে আমার অনেক সাল লেগেছে। এখন আবার নতুন করে টাট্টির গন্ধ আমাকে পাগল করে তুলবে।'

হুংকার দিয়ে উঠতে গিয়ে কেন জানি গুরুচরণ থমকে গেল। বড় বড় করে দুবার ঢোঁক গিলল। তার চোখের লাল রং ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে আসতে লাগল। সেদিনের সন্ধ্যার আলো-আঁধারিতে গুরুচরণ এই প্রথমবার শিউচরণের দিকে বেদনার চোখে তাকাল। ছেলের দিকে তাকিয়ে মমতাভরা কণ্ঠে গুরুচরণ বলল, 'কী করব আমরা বল, ছোট জাত আমরা, মেথরের জাত। ভদ্দরলোকদের লাথি খেতে খেতে বড় হই, কিল-গুঁতা খেতে খেতে শ্মশানে যাই। ছোটলোকদের কোনো রুচি থাকতে নাই, ঘেন্না-ভালোবাসা থাকতে নাই, কার্পেট হবার স্বপ্ন দেখতে নাই। সারাটা জীবন পাপোশ হয়ে থাকবার জন্যই

BanglaBook.org

আমাদের জন্ম। সুইপারের চাকরি ছাড়া অন্য চাকরি দেয় না আমাদের। কী করব আমরা? কী ক-র-ব?' বলতে বলতে গলাটা বন্ধ হয়ে এল গুরুচরণের।

চারদিকে নীরবতা। শুধু মাঝেমধ্যে নিচ থেকে মাতালদের হল্লা ভেসে আসছে। সেই হল্লার সঙ্গে এসে মিশছে নদী থেকে ভেসে আসা জাহাজের সিটি। ঘুম ভেঙে গেলে কোলের রামগোলাম ভ্যাঁ করে কেঁদে ওঠে এই সময়।

বেদনার জগতে হারিয়ে যাওয়া গুরুচরণের মন বাস্তবতায় ফিরে আসে। রাগহীন-বেদনাহীন কণ্ঠে ছেলেকে বলে, 'ঠিক আছে, তুই যা ভালো মনে করিস, তা-ই কর। তোর চিন্তার ওপর আমি হাত দেব না।' বলেই চুপ মেরে গেল গুরুচরণ। শিউচরণ ও অঞ্জলি অসহায় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকল গুরুচরণের সামনে।

কিছুক্ষণ পর দরদি কণ্ঠে অঞ্জলি বলল, 'তুমি রাগ করলে ছেলের ওপর? কী করবে বলো—ছেলে যখন চাইছে না টাট্টি...।'

অঞ্জলিকে কথা শেষ করতে দিল না গুরুচরণ, ডান হাত তুলে থামিয়ে দিল। বলল, 'টাট্টির গন্ধ বড় ভয়ংকর। শুধু পেট গুলায়, বমি আসতে চায় গলা ফেটে। আমি যখন ওই চাকরি পেলাম, মনে বড় আনন্দ লাগল প্রথম দিন। টাট্টি টানতে গিয়ে টের পেলাম। শিউচরণ ডাস্টবিনের ময়লার গন্ধে বমি করেছে, আমি করেছি টাট্টির গন্ধে। গাড়ির আড়ালে গিয়ে ভকভক করে বমি করেছি। কাউকে বুঝতে দিইনি। বমির ঠেলায় গলার তার ছিঁড়ে গেছে। বমির সঙ্গে রক্তও এসেছে। কতবার যে চাকরি ছেড়ে দিতে চেয়েছি! সামনে তোমার মুখ ভেসে উঠত, ছেলের মুখ ভেসে উঠত। তোমাদের খাওয়াব কী? টাট্টি টানার বিনিময়ে তোমাদের সুখ যে কিনেছি...।' একটা দীর্ঘশ্বাস গুরুচরণের গলা চিরে বেরিয়ে এল।

হঠাৎ ঝুপ করে গুরুচরণের সামনে শিউচরণ হাঁটু গেড়ে বসে। বাপের দুই হাঁটু জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে। বলে, 'বাপ, তুমি আমাকে মাফ করে দাও। তুমি রাগ করলে আমি অবশ্যই ডেরাইভারিটা নিব। তুমি দুঃখ পাও, এটা আমি চাই না, বাপজান। আমার যতই বমি আসুক, যতই গোন্না লাগুক, তুমি চাইলে আমি ওই চাকরিটা নিব।'

গুরুচরণ শিউচরণের মাথায় ডান হাতটা রাখল। কণ্ঠ তার বাষ্পরুদ্ধ। বড় করে গলা খাঁকারি দিয়ে ঢোঁক গিলল। ঘন কালো চুলে হাত বুলাতে বুলাতে বলল, 'রাগ করিনি রে বাপ তোর ওপর। আমি ওভাবে ভাবিনি। ভেবেছি আমার চাকরি শেষে টাকাপয়সার টানাটানির কথা। এমনিতেই সামান্য বেতন আমাদের। আমার চাকরি গেলে অকূলে পড়ব। দিশেহারা হয়েছিলাম

BanglaBook.org

ভবিষ্যতের কথা ভেবে। তোর কষ্টের কথা ভাবিনি। আবর্জনা টানতে গিয়ে দিনের পর দিন যে তুই এ রকম কষ্ট পেয়েছিস, জানতাম না।'

'মাফ করেছ কি না, বলো?' পাশে দাঁড়ানো অঞ্জলি জিজ্ঞেস করে।

'ও কি কোনো দোষ করেছে যে মাফ করব,' মুখে মৃদু হাসি ছড়িয়ে গুরুচরণ বলে, 'শিউচরণকে নিয়ে আমি গর্ব করি। এপাড়ায়-ওপাড়ায় শিউচরণের বয়সী কত ছেলেকে মদ খেয়ে হল্লা করতে দেখি, নালার ময়লাজলে খাবি খেতে দেখি। আর আমাদের শিউচরণ পান পর্যন্ত খায় না। ও আমার সোনার টুকরা।'

অঞ্জলি চোখ বড় বড় করে তাকায় গুরুচরণের দিকে। বলে কী! যে লোকটি সর্বদা রাগের তাওয়ার ওপর বসে থাকে, পরশুরামের মতন রাগ যার অন্তরে, সে লোকের এ কী রূপ! অবিশ্বাসীর কণ্ঠে স্বামীকে জিজ্ঞেস করে, 'সত্যি কি তুমি শিউচরণকে এ রকম করে ভাবো?'

'হ্যাঁ, ভাবি তো।'

'বিশ্বাস হয় না। রাগ দেখিয়েই তো তোমার জীবন কাটল। আমাদের ওপর রাগ, পাড়াপড়শির ওপর রাগ, বিচার-সালিস করতে বসে রাগ। এই তো।'

'আমার ভিতরে এ রকম রাগ কেন, জানি না। মা বলত—তোর বাপ অনেক রাগী মানুষ ছিল। বাপ তো আমায় জন্ম দিয়েই মারা গেল। আর সর্দারি করতে গেলে একটু-আধটু রাগ তো দেখাতেই হয়।' বলে থেমে গেল গুরুচরণ। বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আবার বলল, 'বুদ্ধি হওয়ার পর বাপকে তো দেখিনি। জন্মের পর শিউচরণকে যেদিন আমার কোলে দিলে, সেদিনই আমি বিশ্বাস করলাম—আমার বাপ শিউচরণ হয়ে আমার ঘরে এসেছে, তোমার পেটে জন্ম নিয়েছে। শিউ তো আমার ছেলে নয়, সে তো আমার অকালে মরে যাওয়া বাপ।' বলতে বলতে শিউচরণকে জাপটে বুকে টেনে নিল গুরুচরণ।

অঞ্জলির দুই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল দরদর করে। দরজার আড়ালে দাঁড়ানো চাঁপারানী আঁচল দিয়ে ঘন ঘন চোখ মুছতে লাগল।

'তুমি তাকে বুক ভরে আশীর্বাদ করো, ও যেন কোনো দিন অভাবে না পড়ে। তার ছেলে যাতে তোমার মতো সর্দার হয়, আমাদের ইজ্জত আরও বাড়িয়ে তোলে।' ধীরে ধীরে বলে অঞ্জলি।

চাঁপারানী এই সময় রামগোলামকে গুরুচরণের কোলে তুলে দেয়। এক হাতে শিউচরণ অন্য হাতে রামগোলামকে জড়িয়ে ধরে গুরুচরণ হু হু করে কেঁদে ওঠে। বলে, 'তোমার কাছে আমার কিছুই চাওয়ার নাই, ভগবান। শুধু আমার শিউকে, আমার রামগোলামকে তুমি দেখো। তারা যেন সরকারি চাকরি করে যেতে পারে, এই ঘর থেকে তারা যেন উচ্ছেদ না হয়।'

BanglaBook.org

বিষাদে-আনন্দে গুরুচরণের এই ক্ষুদ্র গৃহকোণটি ভরে উঠল। বাইরের চিল্লাহল্লা গুরুচরণের ঘর পর্যন্ত এসে পৌঁছাতে পারল না। নিচের তলার রামলালের বউয়ের চিৎকার, মন্দিরের বাজনা, মাতালদের মদো প্রলাপ—সবই গুরুচরণের দুয়ার থেকে ফিরে ফিরে যেতে লাগল।

বিয়ের পর শোবার ঘরটি শিউচরণদের ছেড়ে দিয়ে অপরিসর রান্নাঘরে আশ্রয় নিয়েছে গুরুচরণরা। রাতের খাবার শেষে লজ্জায় অনেকটা চোখ বন্ধ করেই অঞ্জলি তথাকথিত শোবার ঘরে ঢোকে। আস্তে করে ভেতর থেকে দরজায় খিল দেয়। অতি সতর্কতার সঙ্গে স্বামীর পাশে শুয়ে পড়ে। খাটিয়ার ক্যাঁচকোচ আওয়াজ বেটা আর বেটার বউয়ের কানে যাক—এটা অঞ্জলি চায় না। রাতের এ সময়ের দাম্পত্য জীবনটা বড় লজ্জার। এই সময় গুরুচরণ কখনো অঞ্জলির দিকে হাত বাড়ালে ভয়ে ও লজ্জায় কুঁকড়ে যায় অঞ্জলি। একদিকে স্বামীর কামনা, অন্যদিকে সন্তানের লজ্জা—এই দোটানায় ঘামতে থাকে সে। গুরুচরণের কানে মুখ ঠেকিয়ে অনুরোধের ভঙ্গিতে বলে, 'দোহাই তোমার, এখন না। ছেলে আর ছেলের বউ জাগা। রাত আরেকটু গভীর হোক। ঘুমিয়ে পড়ুক ওরা। তারপর...।'

অঞ্জলির অনুনয়ে গুরুচরণ চুপসে যায়। নিজের ওপর বড় ধিক্কার জাগে। হায় রে, এমন ঘরে জন্মালাম! বউকে কাছে পাওয়ার সুযোগ নেই। দরজার ওই পাড়ে শিউচরণেরও একই অবস্থা নিশ্চয়ই। বাসনাকে দমিয়ে রাখতে হচ্ছে হয়তো ওকেও। গুরুচরণের না হয় বয়স হয়েছে, নিজের কামনা দুমড়েমুচড়ে চেপে রাখে নিজের ভেতর, কিন্তু ছেলেটি! নতুন যৌবন তার। ভেতরে খাণ্ডবদাহের লেলিহান শিখা। পাশে যুবতী বউ। আহা রে বেটা, তোর যে কী কষ্ট! আমি বুঝি রে বেটা। ভাবতে ভাবতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ে গুরুচরণ। নাক ডাকে। পাশে গভীর রাত পর্যন্ত নির্ঘুম শুয়ে থাকে অঞ্জলি। তারও যে শরীর মোচড়ায় না, এমন নয়। কিন্তু কী করার আছে তার! ভেতরে কষ্টের দলা আথালিপাথালি করে। স্বামীর চাহিদা পূরণ করতে না পারার কষ্ট গভীর রাত পর্যন্ত কুরে কুরে খায় অঞ্জলিকে। পরম মমতায় ডান হাতটা তুলে দেয় স্বামীর গায়ের ওপর। মনে মনে বলে, 'আমাকে মাফ করে দাও, শিউচরণের বাপ। তোমার দাবি আমি পূরণ করতে পারলাম না। তোমার আকুতিতে আমারও যে মন জাগে না, শরীর জাগে না—তা নয়। কিন্তু কী করব বলো। বেটা জাগা, বেটার বউ জাগা। এই সময় তোমার দাবি আমি পূরণ করি কী করে, বলো! আমাকে মাফ করে দিয়ো।' তার দীর্ঘশ্বাস ছোট্ট ঘরটির চার

BanglaBook.org

দেয়ালের ভেতর গুমরে মরে।

আর ওই দিকে চাঁপারানীকে বুকে টানে শিউচরণ। খাটিয়ার এক পাশে রামগোলাম ঘুমাচ্ছে। অন্য পাশে শিউচরণ-চাঁপারানী পাশাপাশি। আজ মনে বড় ফুর্তি তার। বাপকে সে আজ বোঝাতে পেরেছে যে টাট্টির গন্ধ তাকে পাগল করে তোলে। তুফান মেইলের ড্রাইভারির কাজটা সে কেন নিতে চায় না, তা-ও বোঝাতে পেরেছে। বাপ যখন গর্জন করে উঠেছিল, বড় ভয় পেয়ে গিয়েছিল শিউচরণ। কিন্তু কী আশ্চর্যের ব্যাপার, রাগী বাপ তার আস্তে আস্তে ঠান্ডা হয়ে গেল। একটা সময় বাপ তার হাউমাউ করে কেঁদে দিল! নিজেকে বড় অপরাধী বলে মনে হয়েছিল তখন তার। বাপের শেষের কথাগুলো শুনে তারও চিৎকার করে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করেছিল। কিন্তু চিরদিনের চাপা শিউচরণ গলা ছেড়ে কাঁদতে পারল না। তার চোখের জল বাইরে বেরিয়ে এল না বটে, কিন্তু ওই জল ভেতরে জমে থাকা সব ভয়, সব কষ্ট ধুয়ে সাফ করে দিল। ভয় ও কষ্ট থেকে মুক্তি পেয়ে তার মন আজ এক অপার আনন্দে ডুবসাঁতার দিতে লাগল। ঘরকন্নার কাজ সেরে বউটি যখন কাছে এল, তখন তাকে নিবিড়ভাবে পেতে চাইল মন। স্বামীর আকর্ষণে চাঁপারানী সাড়া না দিয়ে পারল না। চরম মুহূর্তে তারা খাটিয়া থেকে নেমে এল। তাদের ঘরটা যে রান্নাঘরের চেয়ে বড়।

চট্টগ্রাম শহরের এই এলাকাটি এখন নির্জীব হয়ে শুয়ে আছে কর্ণফুলীর পাড়ে। কোর্ট বিল্ডিংয়ের দিক থেকে নেমে আসা রাস্তাটি মুসলিম হাইস্কুলের পাশ দিয়ে দক্ষিণ দিকে ফিরিঙ্গিবাজার পর্যন্ত এসে থেমে যায়নি। ফিরিঙ্গিবাজার মেথরপট্টিকে পাশ কাটিয়ে অভয় মিত্র ঘাট পর্যন্ত পৌঁছে নদী দেখে থমকে গেছে। এই হরিজনপাড়াটির তিন দিকে নানা দোকানপাট থাকলেও দক্ষিণ দিকটি একেবারে খোলা। গভীর রাতের হু হু বাতাস সেবক কলোনিকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে মূল শহরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমে হেলে পড়া বাঁকা চাঁদ ম্লান আলো ছড়িয়ে দিয়েছে শহরজুড়ে। রিকশার টুং-টাং আওয়াজ থেমে গেছে অনেক আগে। খাতুনগঞ্জের মালবাহী গরুর গাড়িগুলো ক্যাঁচোরকোচোর করতে করতে শহরতলির দিকে যাচ্ছে। দিনের বেলায় শহরের রাস্তা দিয়ে গরুর গাড়ি চালানো নিষেধ। তাই রাতকেই মালামাল বহনের উপযুক্ত সময় হিসেবে বেছে নেয় গাড়িয়ালরা। এই শহরের রাস্তা দিয়ে হইহই হট আওয়াজ তুলে ঘোড়ার গাড়ি চলে। ক্বচিৎ দু' চারটা মোটরগাড়ি বড় রাস্তা দিয়ে চলে। চকবাজার থেকে স্ট্র্যান্ড রোড ধরে এসব গাড়ি এয়ারপোর্ট পর্যন্ত যাত্রী বহন করে। মোটরের বিকট আওয়াজ আর ড্রাইভারের দেয়া হর্ন অন্যমনস্ক শহরের বুকেও ভয় জাগায়।

BanglaBook.org

এসব গাড়ির যাতায়াত শুধু দিনের বেলায়। রাত গভীর হলে রাস্তাগুলো শহরের বুকে মুখ থুবড়ে শুয়ে থাকে। আজও শুয়ে আছে। ব্যতিক্রম শুধু ওই রাস্তার ওপর চাঁদ তার মৃদু আলো ছড়িয়ে পরিবেশটাকে ভৌতিক করে তুলেছে।

সেই রাতে চাঁপারানী আর শিউচরণ একসময় বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। প্রাপ্তির যে উত্তেজনা কিছুক্ষণ আগে দুটো শরীরে শিহরণ তুলেছিল, তা এখন অনেকটা স্তিমিত হয়ে গেছে। কিন্তু উভয়ের মনে এক নিবিড় আনন্দ এখনো ছড়িয়ে আছে। পাশাপাশি দুজন দাঁড়িয়ে, কিন্তু কেউ কথা বলছে না। শিউচরণের এখন কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। আর অনেক কথা খলবল করে চাঁপারানীর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে বলে চাঁপারানীও কথা বলতে পারছে না। একসময় চাঁপারানী নীরবতা ভাঙে, 'আজ তোমার বড় আনন্দের দিন। বাপকে তুমি বোঝাতে পেরেছ—টাট্টির গন্ধ তোমার ভালো লাগে না।'

'তুমি ঠিকই বলেছ। আসলে তা-ই। ভদ্দরলোকরা নিজের ছোট্ট ছাওয়ালের টাট্টির গন্ধ সইতে পারে না, নাকে কাপড় চাপা দেয়। আর আজেবাজে খাবার খাওয়া বয়স্ক মানুষের টাট্টির বদবু যে কত বাজে, তা তুমি বুঝবে না।' শিউচরণ বলে।

'কিন্তু বাপ যে তোমার কী কষ্ট পেয়েছে, তা খেয়াল করছ?' চাঁপারানী জিজ্ঞেস করে।

শিউচরণ আহত কণ্ঠে বলে, 'হ্যাঁ, করেছি। এ-ও খেয়াল করেছি, বাপ আমায় শেষ পর্যন্ত ক্ষমা করে দিয়েছে।'

'তোমার বাপের, মানে আমার শ্বশুরজির স্বপ্ন ছিল সামান্য, ছেলেকে তুফান মেইলের ডেরাইভার করা। তা আর হলো না। তুমি তোমার বাপের স্বপ্ন ভাঙলে। তুমি কিন্তু আমার স্বপ্ন ভাঙতে পারবে না।' অনুনয় এবং অনুযোগ মিলেমিশে আছে চাঁপারানীর গলায়।

'কী তোমার স্বপ্ন?' চকিতে শিউচরণ চোখ ফেরায় চাঁপারানীর দিকে। দীর্ঘক্ষণ চুপ থাকে চাঁপারানী। তাকে নীরব দেখে শিউচরণ আবার জিজ্ঞেস করে, 'বললে না তো তোমার স্বপ্নের কথা!'

'আমি কিন্তু আমার রামগোলামকে পড়াব। স্কুলে ভর্তি করাব তাকে। ভদ্দরলোকদের বাচ্চার মতো সে প্রতিদিন স্কুলে যাবে। আমি তাকে সকালে স্কুলে পৌঁছে দেব। পড়তে পড়তে একসময় বড় পাস দেবে আমাদের রামগোলাম। টাট্টি আর আবর্জনা টানার কাজ সে করবে না। অফিসার হবে সে, বউ-ছাওয়াল নিয়ে ভদ্রপাড়ায় থাকবে। কী যে আনন্দ লাগবে তখন আমার!' থেমে থেমে সেই গহন-গভীর রাতে চাঁপারানী আবেগভরা কণ্ঠে তার স্বপ্নের কথাগুলো বলে যায়।

BanglaBook.org

শিউচরণ চাঁপারানীর কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে, কিন্তু মুখে কিছু বলে না। কী বলবে শিউচরণ? বললে তো সত্য কথাগুলো মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসবে। চাঁপারানী যে বড় কষ্ট পাবে শিউচরণের কথা শুনে! চাঁপারানীর স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের যে কত বড় ফারাক, তা বোঝাবে কী করে শিউচরণ! মেথরদের যে লেখাপড়া করতে নেই, তাদের যে স্কুলে যেতে নেই, স্কুলে বসার ঠাঁই নেই, ভদ্রলোকের সন্তানদের পাশে বসে মেথর সন্তানের পড়ার যে অধিকার নেই—এই রূঢ় কঠিন কথাগুলো এই প্রশান্ত রাতে চাঁপারানীকে বলতে ইচ্ছে করল না শিউচরণের। বেদনার নিবিড় এক দীর্ঘশ্বাস বুকের ভেতর চেপে রেখে নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকল শিউচরণ চাঁপারানীর পাশে। চাঁপারানী শিউচরণের হাতে মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী, কিছু জবাব দিচ্ছ না যে?'

শিউচরণ বলল, 'কী জবাব দেব? কোন কথার জবাব দেব?'

চাঁপারানী অবাক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, 'তুমি আমার কথা ভালো করে শোনো নাই? রামগোলামকে স্কুলে ভর্তি করানোর কথা বলছিলাম!'

'আচ্ছা, রামগোলাম বড় হোক, তখন দেখা যাবে।' পাশ কাটাতে চায় শিউচরণ।

'অত কিছু বুঝি না, তুমি আজকে আমাকে কথা দাও, রামগোলামকে পড়াবে।'

শিউচরণ মুখের ভেতর হঠাৎ করে তেতো অনুভব করতে থাকে। প্রচণ্ড ক্রোধ তার ভেতর দলা পাকিয়ে উঠতে থাকে। এই ক্রোধ কার ওপর—চাঁপারানীর, না ভদ্রসমাজের ওপর, বুঝতে পারে না শিউচরণ। তেতো কণ্ঠে সে বলে ওঠে, 'তোমাকে কথা দিলেই কি রামগোলাম বেরিস্টার হয়ে উঠবে? স্কুল-কলেজে পড়ে বড় অফিসার হয়ে ঘোড়াগাড়িতে চড়ে হাওয়া খেয়ে বেড়াবে?'

শিউচরণের রাগী কণ্ঠ শুনে চাঁপারানী বিস্মিত হয়। ঠান্ডা প্রকৃতির এই মানুষটির মুখ দিয়ে তো কোনো দিন কঠিন কথা বের হয়নি! চার বছরের বিবাহিত জীবনে স্বামী কোনো দিন তো তাকে কষ্ট দেয়নি! তাহলে আজ কেন এ রকম করে কথা বলছে? চাঁপারানী বিস্মিত কণ্ঠে বলে, 'তুমি এ রকম করে কথা বলছ কেন?'

'কী রকম করে বলছি?'

'এই যে রাগী রাগী গলায়?'

'রাগী গলায় বলব না তো মিঠা গলায় বলব?'

স্বামীর এ রকম আচরণ দেখে চাঁপারানী আকাশ থেকে পড়ে। দৃঢ় অথচ স্পষ্ট

BanglaBook.org

গলায় জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছে তোমার? ছেলের পড়ার কথা শুনে এত রেগে যাবার কী আছে?'

'রাগব না তো গান গাইব? তোমার ছেলেকে পড়তে দেবে ওরা? স্কুলে ভর্তি করাবে শিক্ষিত মাস্টাররা? মেথরের বেটা বলে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবে স্কুলের উঠান থেকে। স্কুলঘরে ঢুকতে দেবে না রামগোলামকে। বলবে, মেথরের ছেলের আবার পড়া! বলবে, যা বেটা, যা; টাট্টি টান গে মানুষের বাড়ি বাড়ি থেকে।'

হঠাৎ ফুঁপিয়ে ওঠে চাঁপারানী, 'তুমি এসব কী বলছ?'

'হ্যাঁ, ঠিক বলছি। ওরা পড়তে দেবে না রামগোলামকে। ওরা মেথরদের পড়তে দেয় না। ওই যে আমাদের পট্টির পাশে স্কুলটা দেখছ, একসময় সরকার ওই স্কুলটা শুধু আমাদের ছেলেমেয়েদের পড়বার জন্য দিয়েছিল। বছর দুই চলার পর ভদ্রলোকরা স্কুলটা কেড়ে নিল। আমাদের বাচ্চাদের পড়তে বাধা দিল। আমার বাবা প্রতিবাদ করল। এই শহরের হরিজনদের একত্র করল। সবাই মিলে করপোরেশনে নালিশ জানাল, শিক্ষা অফিসে নালিশ জানাল। বাবা সর্দার বলে এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করল বেশি। এক রাতে বাপকে মেরে রাস্তায় শুইয়ে দিয়ে গেল ওরা। ভোর-সকালে আমরা যখন খবর পেলাম, তখন অনেক রক্ত বাবার শরীর থেকে বেরিয়ে গেছে।'

'এসব কী বলছ তুমি?' কাঁপা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে চাঁপারানী।

শিউচরণ চাঁপারানীর হাত জড়িয়ে ধরে বলে, 'হ্যাঁ বউ, সত্যি বলছি—বাপের মাথা থেকে, শরীর থেকে অনেক খুন ঝরেছিল সে রাতে। এরপর অনেক প্রতিবাদ করেও আমরা স্কুলটা আর ফিরে পাইনি। মেথর-সন্তানদের স্কুলে যাওয়া প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ওই সময় থেকে। সেই থেকে এখন পর্যন্ত স্বাভাবিকভাবে স্কুলে যেতে পারে না তারা। তোমার রামগোলাম পড়বে কোথায়? পড়বে কার কাছে?'

চাঁপারানী হাঁ করে তাকিয়ে থাকে শিউচরণের দিকে। চাঁদের মৃদু আলো আর রাতের নিবিড় কালোর মেশামেশিতে চাঁপারানী দেখল, শিউচরণের চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ভেতরের জমাটবাঁধা এত দিনের ক্রোধ দুই চোখ দিয়ে যেন আগুন হয়ে বেরিয়ে আসছে। ঘনিষ্ঠ হয়ে থাকা চাঁপারানী একসময় অনুভব করল, থরথর করে কাঁপছে শিউচরণ। সারা জীবনের শান্ত মানুষটির উত্তেজনা দেখে চাঁপারানী ভয় পেয়ে গেল। সে তাড়াতাড়ি বলল, 'আচ্ছা, ঠিক আছে। রামগোলামকে পড়াতে হবে না। তুমি শান্ত হও।'

চাঁপারানীর কথার কোনো জবাব না দিয়ে শিউচরণ বলতে থাকে, "যেদিন

BanglaBook.org

বাপ দলবল নিয়ে শিক্ষা অফিসে প্রতিবাদ করতে যায়, সেদিন বাপকে কী অপমানটাই না করল অফিসার! আমাদের আরজি শুনে প্রথম থেকেই গালাগাল শুরু করল ওছমান সাহেব, 'শুয়োরের বাচ্চারা, কুত্তির বাচ্চারা স্কুলে পড়বে!' বাপের চিৎকার শুনে পিয়ন-আরদালি লেলিয়ে দিল। তারপর তো বাপকে আমার মেরে তক্তা বানাল, রক্ত ঝরাল। সেসব মনে পড়লে দিল বেচাল হয়ে যায়।"

সে রাতে আর কথা বাড়াল না চাঁপারানী। কর্ণফুলীকে সামনে রেখে দীর্ঘক্ষণ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকল এই হরিজন দম্পতি। একসময় পূর্বাকাশে শুকতারা দেখা দিল। মৃদু বাতাস এই দম্পতির মুখে-চোখে স্নিগ্ধ পরশ বুলিয়ে দিতে লাগল।

চার

গ্রামে মাঠে-খালপাড়ে, জঙ্গলে, রাস্তার দুই ধারে, নদী-সমুদ্রের নির্জন তীরে অথবা বাড়ির কাছে গর্ত খুঁড়ে পায়খানার কাজটি সারা হয়। শহরে এই প্রাতঃকৃত্যটি গ্রামের মতো সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। খাটা পায়খানায় শহুরেরা এই কাজটি সারত। মল পরিষ্কার করার জন্য কিছু মানুষকে নিযুক্ত করত শাসক সম্প্রদায়। ভারতবর্ষ যেমন, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও তেমনি এই ব্যবস্থার প্রচলন হয়েছিল। কিন্তু ভারতবর্ষেই শুধু এই কাজের সঙ্গে ঈশ্বরের বিধান ও শাস্ত্রীয় অনুশাসন যুক্ত হয়েছে। ঈশ্বরীয় বিধানে বলা হয়েছে, সমাজের বিশেষ এক শ্রেণীর মানুষ এই কাজ করবে। শাস্ত্রকাররা পুরাণের কাহিনির মোড়কে তাদের অভিসন্ধিকে প্রথাবদ্ধ করেছে। ব্রহ্মা বিশ্ব সৃষ্টিকর্তা, তাই সব মানুষের পিতাও তিনি। একদিন এই বিশ্বপিতা বনপথে হাঁটছিলেন। হঠাৎ মহর্ষি ব্রহ্মা পথের ঠিক মাঝখানে একদলা গু দেখলেন। গা গুলিয়ে উঠল তাঁর, মন বিষণ্ণতায় ভরে গেল। বিষণ্ণ ব্রহ্মা বেকায়দায় পড়লেন। পবিত্র দেবতা তিনি। তিনি তো আর নোংরা মল অতিক্রম করতে পারেন না! আবার অনন্ত সময় পথিমধ্যে থেমে থাকাও সম্ভব নয় ব্রহ্মার পক্ষে। কী করা যায়? চিন্তাক্লিষ্ট হলেন বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা। কিছুক্ষণের মধ্যেই সমাধানের দ্বার খুলে গেল। তিনি অনেকক্ষণ

BanglaBook.org

পথ হাঁটছিলেন, তিনি ঘর্মাক্ত হয়েছেন। রাস্তার ধুলো তাঁর গায়ে লেগে গেছে। দেহের চামড়ায় আঙুল ঘষলেন ব্রহ্মা, ঘষায় দেহ থেকে কালো নোংরা কিছু পদার্থ বেরিয়ে এল। আঙুল থেকে পথে পড়ে গেল ওগুলো। ঘামে-ধুলোয় জড়ানো ওই বর্জ্য পদার্থ থেকে জন্ম নিল একজন মানুষ। ব্রহ্মা আদেশ দিলেন, 'মাত্রক, ওই মহী-মাটি থেকে মলগুলো পরিষ্কার করে দে, ওগুলো আমার পথচলায় বিঘ্ন ঘটিয়েছে।' মাত্রক আনতমস্তকে তার স্রষ্টার আদেশ পালন করল। অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে ঘষে ঘষে পথ থেকে গু-গুলো পরিষ্কার করে দিল সে। ব্রহ্মা খুশি হলেন। বললেন, 'আজ থেকে তুই মহীথর। ভদ্র মানুষদের মল পরিষ্কার করবি তুই। তাতেই তোর জীবন ধন্য হয়ে উঠবে।' ব্রহ্মা পথ দিয়ে হেঁটে চলে গেলেন তাঁর গন্তব্যে। পথের মাঝে অসহায় মহীথর দাঁড়িয়ে থাকল ভদ্র-শিক্ষিতজনের মল পরিষ্কার করার জন্য। ব্রহ্মা প্রজাপতি। মানুষ-প্রকৃতি, পশু-পাখি, নদী-সমুদ্র—সবই ব্রহ্মা সৃষ্টি করেছেন। তিনি আদি পিতা। তাঁর সৃষ্ট মানুষরা অমৃতের পুত্র নামে পরিচিত; শুধু মহীথর ছাড়া। না হলে কেন সর্বশক্তিমান ব্রহ্মা সামান্য মল অতিক্রম করে যেতে পারেন না? পারেন না এই জন্য যে, মল টানার অস্পৃশ্য সন্তানটিকে জন্ম দেয়ার গভীর অভিলাষটি তখন তাঁর ভেতর তোলপাড় করছে। তাই তো তিনি নোংরা বস্তু থেকে নোংরা সন্তানটির উদ্ভব ঘটালেন। অমৃতের পুত্রদের থেকে আলাদা করে এই সন্তানটিকে অভিশপ্ত করে রাখলেন মহর্ষি ব্রহ্মা। এ ব্যাপারে তাঁর ভেতর কোনো অনুকম্পা কিংবা উদার স্নেহ জাগল না। প্রকৃতপক্ষে, এই কাহিনির স্রষ্টা পুরোহিত সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়টি মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টিতে পারঙ্গম, মানবতার অন্তহীন অপমানে এরা উল্লাস বোধ করে। অনুশাসন নির্মাণের প্রবল ক্ষমতা তাদের হাতে। শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে তারা মানুষের যুক্তিকে গলা টিপে মারে। শাস্ত্রীয় অনুশাসনের এমন অপার শক্তি যে, একসময় সমাজ-মানুষরা পুরোহিতের মিথ্যা বাণীকে বিশ্বাস করতে শুরু করে। মিথ্যা পরাক্রমশালী সত্য হয়ে মানুষের মধ্যে জায়গা করে নেয়। নোংরা কাজে একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে নিযুক্ত করার জন্য পুরোহিত গোষ্ঠী শাস্ত্রবাণীকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে এবং সার্থক হয়েছে। ধর্মীয় অনুশাসনের কুযুক্তি মেথর সম্প্রদায়কে হিন্দু জাতিস্তম্ভের নিম্নতম স্তরে ঠেলে দিয়েছে।

সুবিধাভোগী ধূর্ত সমাজপতিরা নিরলসভাবে শক্তি ও শাস্ত্রের ভয় দেখিয়ে সমাজে এই মিথ্যাটিকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে যে সমাজের সবচেয়ে নিচু স্তরের মানুষের নাম শূদ্র। আর শূদ্রদের মধ্যে সবচেয়ে পাপিষ্ঠ হলো মেথররা এবং ঈশ্বরেরই নির্দেশে মল-আবর্জনা টানার কাজটি করতে হবে মেথরদেরকে।

BanglaBook.org

একটি সম্প্রদায়কে এভাবে অবদমন ও অপমান করার দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না।

মুসলমান রাজত্বের দীর্ঘ সময়সীমায় ভারতে প্রকৃত নগরসভ্যতার পত্তন ঘটে। ভারতজুড়ে বিস্তর নগর গড়ে ওঠে। বিপুলসংখ্যক মানুষ ওই নগরগুলোতে বসবাস করতে থাকে। নগরসভ্যতার প্রধান সমস্যার একটি মল ও আবর্জনা সমস্যা। এই অপরিচ্ছন্ন কাজে মেথররা নিযুক্তি পায়। মোগল-রাজত্বের পর ব্রিটিশ শাসন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি থেকে মহারানি ভিক্টোরিয়া। এই ব্রিটিশ উপনিবেশে গড়ে উঠল অসংখ্য নগর, নদী ও সমুদ্রের তীরে তীরে তৈরি হলো বন্দর আর বাণিজ্যকেন্দ্র। ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত রেলপথ তৈরি হলো। গড়ে উঠল শত-সহস্র রেলস্টেশন, রেলওয়ে জংশন আর রেলকলোনি। শহরে শহরে পৌরসভা গঠিত হলো। কর্মীর সমাগমে বাণিজ্যকেন্দ্রগুলো গমগম করতে লাগল। ভারতবর্ষের সবকিছুর রূপ-রূপান্তর ঘটলেও স্যানিটারি পায়খানার ব্যাপারটি তখনো নাগরিকদের মনে দানা বাঁধেনি। তখনো নগরজীবন চলছে খাটা পায়খানায়। এই খাটা পায়খানার মজদুর হলো মেথররা।

ব্রিটিশ আমলে তৎকালীন পূর্ববঙ্গে মেথরদের আনা হয়েছে কানপুর, এলাহাবাদ, চারগাঁও প্রভৃতি জায়গা থেকে। এসব জায়গার নিম্নবর্গীয় মানুষগুলো অত্যন্ত দরিদ্র ছিল। দারিদ্র্যের যন্ত্রণায় আর চাকরির লোভে জন্মভূমি ছেড়ে এসব মানুষ অজানা দেশে পাড়ি জমিয়েছে। তেলেগুভাষী আর হিন্দিভাষী ঝাড়ুদার সম্প্রদায়টি পূর্ববঙ্গে এসে সাংস্কৃতিক সংকটে যেমন পড়েছে, তেমনি পড়েছে ভাষাসংকটে। কাশ্যপ বর্ণের সনাতনধর্মী এই মানুষরা শুধু দু'বেলা পেটের খাবার জোগাড় করার জন্য নিদারুণ অবহেলা আর বিদঘুটে অপমান সয়ে গেছে বছরের পর বছর ধরে। ব্রিটিশ আমলে তাদের চাকরির অনেকটা নিশ্চয়তা ছিল, পারিশ্রমিক ছিল জীবনরক্ষার উপযোগী। পাকিস্তান আমলে তাদের স্বস্তির জায়গায় ভাঙন শুরু হয়, ময়লা পরিষ্কারের চাকরি নিয়ে টানাটানি শুরু হয়। ব্রিটিশদের প্রচলিত রেশন তখনো মেথররা পেত। মায়ের পেটে সন্তান এলে সেই সন্তানও সরকারি ভাতা পেত। স্বাধীনতার পর তাদের অর্থনৈতিক জীবনের ভাঙন প্রায় সম্পূর্ণ হয়। তাদের বলা হয়—চাকরির বয়স শেষ হয়ে গেলে কলোনি ছাড়তে হবে। পেটের সন্তানকে ভাতা দেয়া তো দূরের কথা, রেশন প্রথাও বন্ধ করে দিল করপোরেশন। করপোরেশন সবার জন্য ঝাড়ুদারের চাকরি উন্মুক্ত করার উদ্যোগ নিল। ধীরে ধীরে উন্মূল হয়ে পড়তে লাগল চট্টগ্রামের মেথর সম্প্রদায়। একটা সময়ে ফিরিঙ্গিবাজার মেথরপট্টির মন্দিরে জড়ো হলো মেথর

BanglaBook.org

সম্প্রদায়ের বয়স্করা, তরুণরা। মাঝখানে সর্দার গুরুচরণ, তার পাশে অন্য তিন পট্টির মুখ্যরা। সবার মুখে এক প্রশ্ন—এখন আমাদের কী হবে? ঘর যাচ্ছে, রেশন গেছে, চাকরি যাচ্ছে। কোথায় যাব আমরা? খাব কী? সন্তানদের বাঁচাব কী করে?

বান্ডেলের মুখ্য চেদিলাল হাহাকার করে উঠল। বলল, 'বল সর্দার, এবার আমাদের কী হবে? করপোরেশন বলছে—এ চাকরি শুধু আমাদের হয়ে থাকবে না। হিন্দু-মুসলমান সবাই এই চাকরির সুযোগ পাবে। ওরা যদি দলে দলে আমাদের চাকরিতে ঢোকে, তাহলে আমরা যাব কোথায়?'

গুরুচরণ আজকে মিউনিসিপ্যাল অফিসে গিয়ে শুনেছে এ কথা। তার মাথা চক্কর দিয়ে উঠেছে। প্রতিবাদ করতে গিয়ে তার মুখ দিয়ে কথা বের হয়নি।

সমবেত মানুষের মধ্য থেকে কে যেন বলে উঠল, 'মেথরদের ছোঁয়া যাবে না। তারা কুত্তার গুয়ের মতো ঘৃণার। কেন? তারা টাট্টি টানে, ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করে। কিন্তু তাদের চাকরিটা এখন ঘৃণার নয়। করপোরেশন নোটিশ জারি করে আমাদের মাথায় বাড়ি দিয়েছে।'

এবার সর্দার গর্জে উঠল, 'বাড়ি আমরা দিতে দেব না। প্রতিবাদ করব। না মানলে খাটা পায়খানা থেকে টাট্টি টানা বন্ধ করে দেব।'

'আমার বাপ-দাদা, তাদের বাপ-দাদা, আমি-আমরা—সবাই এত দিন চাকরি করে আসছি। সেই ব্রিটিশ যুগ থেকে আমাদের চাকরি। শুনেছি, মল-ময়লা টানার চাকরির জন্য আমাদের পূর্বপুরুষদের আনা হয়েছিল ভারত থেকে। বহু বছর ধরে মানুষের নিন্দামন্দ সয়ে সয়ে মল টানার কাজ করছি। এত দিন কেউ তো আমাদের বাড়া ভাতে ছাই দেয়নি। আজ কেন আমাদের পেটে লাথি দেয়া?' বৃদ্ধ চেদিলাল ধীরে ধীরে বলে।

'করপোরেশনের আগের বড়বাবু বড় ভালো লোক ছিল। তার চাকরি শেষ হয়ে গেল। তার জায়গায় ছালাম সাব বড়বাবু হলো। আমাদের মতো মানুষদের জন্য তার মনে কোনো দরদ নেই। কথায় কথায় জাত তুলে কথা বলে। বলে, মেথরের জাত, ছোটলোক তোরা। যা করপোরেশন অর্ডার করবে, মাথা পেতে মেনে নিবি।' গুরুচরণ বলে।

মাদারবাড়ির হরিজনপল্লির কার্তিক উঁচু গলায় বলে ওঠে, 'আমাদের মতো ছোট জাতরাই ওদেরকে বড় জাত করে রেখেছে। আমাদের হাতের গুঁতায় আর পায়ের লাথিতে ওই সব হারামজাদা বড় জাতদের টাট্টিখানা আর রাস্তাঘাট পরিষ্কার না করলে কোথায় ভেসে যেত তারা। লাথি মারি আমি ওই শিক্ষিত বড় জাতের ভদ্রলোকদের মুখে।'

কার্তিক তরুণ। ত্রিশের কাছাকাছি বয়স। পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা।

BanglaBook.org

তার ঝাঁকড়া চুলের মাথায় উঁচু জাতের ভদ্রলোকদের জন্য একদলা ঘৃণা সর্বদা ঘুরপাক খায়।

চেদিলাল বলে, 'আহা কার্তিক, ওভাবে বলছ কেন? ওদের অপমান করতে নেই। ওরা না থাকলে আমরা কি থাকতাম? আমাদের চাকরি কি থাকত?'

কার্তিক রাগী গলায় বলে, 'তুমি ঠিক বলছ না, কাকা। বরং বলো, আমরা না থাকলে ওদের অস্তিত্ব থাকত না। ছোট জাত না থাকলে বড় জাত চেনা যেত কেমনে? তা ছাড়া আমরা খাটা পায়খানা থেকে টাট্টি না টানলে ওই সব শালা বড় জাতের লোকদের কী অবস্থা হতো, ভেবে দেখছ?'

মদো শ্যামল জড়ানো গলায় বলল, 'কী আর হতো, ভদ্দরলোকরা নিজেদের টাট্টি কাঁধে নিয়ে ছিপাতলির কুয়ার দিকে ছুটত প্রতি সকালে। আঁধার থাকতে থাকতে ছুটত অবশ্য, আমরা দেখলে যে লজ্জা পেত খুউব!'

গুরুচরণ বলল, 'আহ্, তুই থামবি শ্যামল! সারাটা সময় মদই খেয়ে গেলি তুই। আর আবুলতাবুল কথা বললি।'

'আবুলতাবুল কথা না সর্দারজি, ঠিক কথাই বলছি। সব সময় মদ খাই বটে, কিন্তু হক কথা বলি।' তারপর জড়ো হওয়া মানুষদের উদ্দেশ্য করে শ্যামল বলে, 'তোমরা ভেবে দেখছ, আমরা গু না টানলে সাহেব-সুবাদের কী অবস্থা হবে?'

জটলা থেকে একজন জিজ্ঞেস করল, 'কী অবস্থা হবে?'

'কম কম পায়খানা করবে ওরা। বেশি পায়খানা করলে খাটা পায়খানার পাতি টিন তো তাড়াতাড়ি ভরে যাবে। ভরে গেলে তো সকালে আবার টাট্টি নিয়ে দৌড়াতে হবে ছিপাতলির দিকে। কম পায়খানার জন্য তো কম খেতে হবে। ভদ্দরলোকরা কম খেলে আমাদের লাভ। বাজারে মালামাল সস্তা হয়ে যাবে। আমরা গরিব-গুর্বারা কম দামে কিনতে পারব।' শ্যামলের শেষের দিকের কথাগুলো জড়িয়ে গেল।

এবার চেদিলাল বলে উঠল, 'রাখো তোমার ঠাট্টা-মশকরা। কাজের কথা হোক। বলো সর্দার, এবার আমরা কী করব? হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ—সবাই তো এখন আমাদের চাকরির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।'

কার্তিক উগ্র গলায় বলল, 'ঝাঁপিয়ে পড়তে দেব না। আমরা চার পল্লির হরিজনরা মিলিতভাবে এই নোটিশের প্রতিবাদ করব। এই চাকরি শুধু আমাদের। সবার জন্য চাকরি খুলে দিলে আমরা পথের ভিখারি হয়ে পড়ব।'

ঝাউতলার মুখ্য যোগেশ বলল, 'সরকার যদি এ চাকরি সবার জন্য খুলে দেয়, তাহলে আমাদের করার কী আছে? আমরা কি সরকারের অবাধ্য হতে পারব? আমি বলি কি, হইহল্লা না করে এই আদেশ মেনে নেয়া ভালো।'

BanglaBook.org

করপোরেশনের বড়বাবুর সঙ্গে খুব মাখামাখি তার।

কার্তিক হুংকার দিয়ে ওঠে, 'খবরদার মেসো, তুমি বেশি কথা বলবে না।'

'কেন বলব না?'

'বলবে না এই জন্য যে তুমি বেইমান। বড়বাবুর সঙ্গে তোমার খায়খাতিরের কথা সবাই জানে। তোমার বউ তার বাংলোতে কাজ করে। তুমি ছালাম সাহেবের দালালি করছ। আমাদের পেটে লাথি দেয়ার দলে ভিড়েছ। তুমি হরিজন-সমাজের বিভীষণ।' রাগ ঝরে পড়ছে কার্তিকের কণ্ঠ থেকে।

যোগেশ চুপসে যায়। মিউমিউ করে কী যেন বলতে যায় সে। গুরুচরণ তাকে থামিয়ে দেয়। বলে, 'আমাদের মধ্যে বিবাদ করার দরকার নেই। আমরা সবাই সবাইকে চিনি। মনের কথা মনে চেপে রেখে আমরা একসাথ হয়ে করপোরেশনের এই নীতির প্রতিবাদ করব। তবে হইচই করে নয়। আমাদের বিশৃঙ্খলা আর বেইমানির সুযোগ নেবে ওরা। বুদ্ধি করে এগোতে হবে।'

চেদিলাল জিজ্ঞেস করে, 'কী বুদ্ধি?'

'আমি কালকে বড়বাবু ছালাম সাহেবের সঙ্গে দেখা করব। এই কালা আইনের বিরুদ্ধে বলব।'

'কী বলবে?'

'বলব, হরিজনদের চাকরিটা সবার জন্য খুলে দিলে না খেয়ে মরব আমরা। অন্য কোথাও চাকরি পাব না আমরা। ভিক্ষুক হয়ে যাব আমরা।' আবেগে কণ্ঠ বুজে এল সর্দারের।

সমবেত সবাই বলল, 'ঠিক আছে। কালকে এর একটা বিহিত করো, সর্দারজি।'

জলদগম্ভীর কণ্ঠে আওয়াজ হলো, 'সামালকে। ধীরে, ঠান্ডা মাথায় এগোতে হবে গুরুচরণ।'

সবাই ফিরে তাকাল। কণ্ঠটা বাবাঠাকুরের। বাবাঠাকুর হরিজনপল্লির পুরোহিত। অন্য তিনটি হরিজনপাড়ায়ও মন্দির আছে। তবে ফিরিঙ্গিবাজার সেবক কলোনির মন্দিরটি সবার বড়। কালীমন্দির এটি। পাকা। এই মন্দিরেই থাকেন বাবাঠাকুর। তাঁর আসল নাম কেউ জানে না। কুচকুচে কালো রং তাঁর। সত্তর পেরিয়ে যাওয়া শরীরের কোথাও এখনো ভাঙন ধরেনি। মাথাভর্তি ধবধবে সাদা চুল। কালো শরীরের ওপর সাদা চুলের মাথাটি যেন ঘনঘোর অমাবস্যার আকাশে প্রবল জ্যোৎস্নার পূর্ণ চাঁদ। চিরকুমার মানুষটি গোটা জীবন হরিজনপল্লিতেই কাটিয়ে দিচ্ছেন। তাঁর আচার-ব্যবহার, জীবনযাপন হিমালয়ফেরা সাধুদের মতো। নিরামিষাশী তিনি। একাহারী।

BanglaBook.org

দিনের শেষে সূর্য ডোবার আগে অন্ন গ্রহণ করেন তিনি। রাতের বেলা জল পর্যন্ত স্পর্শ করেন না বাবাঠাকুর।

কালীমায়ের কালোভক্ত বাবাঠাকুর। প্রতি সন্ধ্যায় মা কালীর সামনে চোখ বুজে প্রার্থনায় বসেন তিনি। সামনে জ্বলে ধূপকাঠি আর মোমবাতি। মোমবাতির পাশে জ্বলে সরষে তেলের প্রদীপ। প্রার্থনায় বসার আগে বাঁ হাতের তালুতে তুলা গড়িয়ে গড়িয়ে সলতে তৈরি করেন তিনি। সলতে তৈরির সময় মৃদু কণ্ঠে বলতে থাকেন 'জয় মা কালী, জয় মা কালী।' কোনো কোনো দিন প্রার্থনায় তিনি এত মগ্ন হয়ে যান যে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েন। বাবাঠাকুর হরিজনপল্লির মানসিক শক্তি। হরিজনরা তাঁকে খুব ভক্তি করে।

পুজোর জায়গাটি থেকে নাটমন্দির একটু তফাতে। নাটমন্দিরেই জমায়েত হয়েছে হরিজনরা। সর্দার-মুখ্যদের মধ্যে যখন কথা-চালাচালি হচ্ছিল, তখন বাবাঠাকুর প্রার্থনায় মগ্ন ছিলেন। বাস্তবে ফিরলে তাঁর কানে ভেসে আসে গুরুচরণের কথা—না খেয়ে মরব আমরা, ভিক্ষুক হয়ে যাব...।

বেশ কদিন আগে থেকে করপোরেশনের বড় সাহেবের অত্যাচারের কথা বাবাঠাকুরের কানে আসছিল। আজকে দুপুরে অঞ্জলি চাকরি থেকে ফিরে মন্দিরে দণ্ডবৎ করে বাবাঠাকুরকে বলেছিল, 'আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে ঠাকুর।' এরপর আরও যেন কী কী বলেছিল। স্নান সারার তাড়া ছিল বলে অঞ্জলির পরের কথাগুলো ভালো করে মনোযোগ দিয়ে শোনেননি। এখন গুরুচরণের কথা শুনে তিনি আঁচ করতে পারলেন, গুরুতর কিছু একটা হয়ে গেছে। চোখ তুলে সমবেত মানুষের দিকে তাকালেন তিনি। দেখলেন—রাগী, আশাহত, উদ্বিগ্ন হরিজনরা তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। তিনি এ-ও বুঝলেন, গুরুচরণ কিছু একটা কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে। এই দীর্ঘ জীবনযাপনে তিনি বুঝে গেছেন, বৈরীদের দ্বারা হরিজনরা ঘেরাও হয়ে আছে। তাদের মাথা উঁচু করে কথা বলার অধিকার নেই। ভদ্র, শিক্ষিত সমাজ তাদের এমন কোণঠাসা করে ফেলেছে যে ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ নেই। এ সময় উত্তেজনা বড় শত্রু হয়ে দাঁড়াবে হরিজনদের। অধিকারবঞ্চিত হয়ে আজ হরিজনরা সমবেত হয়েছে এক জায়গায়। তাদের অনেক হাত একহাত হয়ে আকাশের দিকে উত্থিত হচ্ছে। হাওয়ায় বজ্রমুষ্টি ঘুরিয়ে আজ তারা বলতে চাইছে, 'আমরা আর বঞ্চিত হতে চাই না। বেঁচে থাকার শেষ অবলম্বনটুকু কেড়ে নিতে দেব না।' কিন্তু বাবাঠাকুর জানেন, হরিজনদের ঐক্য বড় ঠুনকো। সামান্য প্রত্যাঘাতেই তারা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে। মেথরপল্লির অধিকাংশ পুরুষই মদ্যপ। মদের নেশায় তারা বুঁদ হয়ে থাকে। মদে তারা বিক্রি হয়ে যায়। যতবার তারা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, প্রতিপক্ষ

BanglaBook.org

মদ্যপ এই গোষ্ঠীটাকে মদের প্রলোভন দেখিয়ে, সামান্য টাকা হাতে গুঁজে দিয়ে ঐক্যে ফাটল ধরিয়েছে। দু-চারজন বেইমানকে খুঁজে নিয়েছে প্রতিপক্ষ। এর আগে যতবার অধিকার আদায়ের আন্দোলন হয়েছে, ততবার এই মুষ্টিমেয় বিশ্বাসঘাতকরাই ভাঙন ধরিয়েছে আন্দোলনে। আজকেও বাবাঠাকুর হরিজনদের প্রতিবাদ-আন্দোলনের কথা শুনে শঙ্কিত হয়েছেন। হঠাৎ উত্তেজনা তাদের অধিকার আদায়ে উজ্জীবিত করবে, কিন্তু সুখকর পরিণতিতে নিয়ে যাবে না। এই ঘটনা আজকের নয়। গত সত্তর বছরের জীবনে এ রকম ব্যর্থ আন্দোলন অনেক দেখেছেন তিনি। গুরুচরণের প্রতিবাদ আর সমবেত হরিজনদের উগ্র উত্তেজনা যাতে বুমেরাং হয়ে হরিজনদের জীবনে ফিরে না আসে, এটাই চাইছেন বাবাঠাকুর। তাই গুরুচরণকে বলছেন, 'সাবধানে পা ফেলো গুরুচরণ। হঠাৎ উত্তেজনায় অন্ধ হয়ে যেয়ো না। যা করবে, ভেবেচিন্তে করবে।' বাবাঠাকুরের গমগমে কণ্ঠস্বর শুনে গুরুচরণ জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। বলল, 'বুঝলাম না বাবাঠাকুর, কী বলতে চাচ্ছেন আপনি?'

বাবাঠাকুরের চোখ তখন মন্দিরের দেয়ালে টাঙানো আম্বেদকরের ছবির দিকে। ছবিটির দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন তিনি। দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, 'তোমরা এঁকে চেনো?'

সমবেত মানুষদের অনেকেই ছবির মানুষটিকে চেনে না। বহুকাল আগে থেকে ছবিটি দেয়ালে ঝুলে আছে। মন্দিরের দেয়ালে দেয়ালে আরও অনেকের ছবি আছে। ওসব ছবি যে গান্ধী, শ্রীকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ, ব্রহ্মা, মহাদেবের—তা সবাই জানে। ওসব ছবির এক পাশে ঝুলে থাকা ছবিটি যে আম্বেদকরের, তা অনেকে জানে না। অন্যরা না চিনলেও গুরুচরণ চেনে ছবির মানুষটিকে।

'আম্বেদকর, আম্বেদকরের ছবি ওটি।' শ্রদ্ধামিশ্রিত কণ্ঠ গুরুচরণের।

বাবাঠাকুর বলেন, 'হ্যাঁ, আম্বেদকরেরই ছবি ওটি মহান পুরুষ। উঁচু জাতের হিন্দুদের যেমন—শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্মা, মহাদেব; আমাদের জন্য তেমনই আম্বেদকর। মুচির ঘরে জন্মেছিলেন উনি। মুচি বলে যাদবরা বড় ঘৃণা করত তাঁকে। জল-অচল জাতে জন্ম তাঁর। স্কুলঘরের ভেতরে বসে পড়ার অধিকার ছিল না। মাস্টাররা অনুমতি দিত না স্কুলঘরে ঢোকার। দরজার পাশে বারান্দায় ছালার ওপর বসে মাস্টারের পড়া শুনতেন। তাতেই ক্লাসে ফার্স্ট হতেন। দমিয়ে রাখা যায়নি তাঁকে। সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়েছিলেন তিনি। বর্তমানের ভারত যে সংবিধানের নিয়মে চলছে, সেই সংবিধান তৈরি করার প্রধান কারিগরদের একজন ছিলেন। সরকারের বহু উঁচু পদে চাকরি করেছেন আম্বেদকর। তাঁর

BanglaBook.org

পরিণতি কী করেছিল ঠাকুররা, জানো?'

এতক্ষণ অবাক হয়ে চোখ বড় বড় করে সমবেত হরিজনরা বাবাঠাকুরের কথা গিলছিল। বিস্মিত চোখ গুরুচরণেরও। সে আম্বেদকরের ছবিটি চেনে বটে, কিন্তু তাঁর জীবনের এত কিছু জানে না। বাবাঠাকুরের প্রশ্ন শুনে বেশ কজন একসঙ্গে জিজ্ঞেস করল, 'কী করেছিল?'

'ধর্মত্যাগে বাধ্য করেছিল।' বাবাঠাকুরের কণ্ঠ থেকে বেদনা ঝরে পড়ছে।

'ধর্মত্যাগে বাধ্য করেছিল!' চেদিলাল আঁতকে উঠল।

চেদিলালের কথা যেন কানে যায়নি এমন কণ্ঠে বাবাঠাকুর বলতে শুরু করলেন, 'সরকারের উঁচু পদে চাকরি করতেন আম্বেদকর। তাঁর অফিস ছিল দিল্লিতে। অন্য হিন্দুদের কথা বাদ দাও, তাঁর যে খাস পিয়ন, সে পর্যন্ত আম্বেদকরকে ছুঁতো না।'

'মানে?' হতভম্ব গুরুচরণ জিজ্ঞেস করে।

বাঁ হাতটা মানা করার ভঙ্গিতে গুরুচরণের সামনে তুলে ধরেন বাবাঠাকুর। বলতে থাকেন তিনি, 'গরিব পিয়ন। কিন্তু জন্ম তার যাদব বংশে। আম্বেদকর যত বড় অফিসার হন, ছোট জাত তো! অস্পৃশ্য। ছোঁয়া যাবে না তাঁকে। ছুঁলে নরক গমন নির্ঘাত। তাই টেবিল থেকে দূরত্ব বজায় রেখে দূর থেকে ছুঁড়ে মারত ফাইলপত্র। এসব অপমান সয়ে সয়েও হিন্দুধর্মকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সে সময়ের ভারতের উঁচু জাতের লোকরাও নিচু জাতের এই লোকটিকে সহ্য করতে পারছিল না। তাঁর জীবনটাকে অতিষ্ঠ করে তুলছিল তারা। সরকারের নীতিনির্ধারকরা তাঁকে তাঁর এই দুঃসময়ে কোনো সাহায্য করেনি।' তারপর কিছুক্ষণ থামলেন বাবাঠাকুর। গভীর বিষণ্ণতা ফুটে উঠল তাঁর চোখেমুখে। দম নিয়ে তিনি আবার বলতে শুরু করলেন। 'কিন্তু তথাকথিত নিচু জাতের মানুষরা তাঁর চারদিকে এসে দাঁড়াল। তাঁকে সাহস জোগাল। সবাই জল-অচল জাত। অর্থাৎ, যাদব-ঠাকুরদের পুকুরের বা কুয়ার জল স্পর্শ করার অধিকার ছিল না তাদের। জল স্পর্শ করার অধিকার চাইল তারা। আম্বেদকর নেতৃত্ব দিলেন জল-অচল আন্দোলনে। আন্দোলনকে নস্যাৎ করবার জন্য সব রকম চেষ্টা চালাল উঁচু জাতের মানুষরা। সরকারের কাছে বারবার সাহায্যের হাত পাতলেন আম্বেদকর। কেউ এগিয়ে এল না ছোট জাতদের বাঁচানোর জন্য। তাঁর দলবল নিয়ে মুসলমান হয়ে যাওয়ার ভয় দেখালেন তিনি। তাতেও বর্ণবাদীরা অটল থাকল তাদের অত্যাচারে।'

'তারপর? তারপর কী হলো?' ভিড় থেকে কে যেন বলে উঠল।

BanglaBook.org

'তারপর প্রায় পঞ্চাশ হাজার ছোট জাতের মানুষ নিয়ে তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলেন।' বাবাঠাকুরের কণ্ঠ থেকে ঘৃণা না উপহাস ঝরে পড়ছে, বোঝার কোনো উপায় নেই। তাঁর চোখ বোজা। হাতের আঙুলে মৃদু কম্পন।

'তাই বলছিলাম—ধীরে, সামালকে। এত বড় পণ্ডিতের আন্দোলনকে থামিয়ে দিয়েছিল ধর্মান্ধ স্বার্থপররা। তোমরা তো চুনোপুঁটি। আন্দোলন-প্রতিবাদে নামার আগে দশবার ভেবে দেখো, আন্দোলন সার্থক হবে কি না।'

অনেকক্ষণ চুপ থাকার পর আবার কথা বলে উঠলেন বাবাঠাকুর।

'তাহলে আমরা এখন কী করব? চুপচাপ অত্যাচার সয়ে যাব?' মাথাগরম কার্তিক জিজ্ঞেস করে।

বাবাঠাকুরের মুখমণ্ডল থেকে কিছুক্ষণ আগের বিষণ্নতা তিরোহিত হয়ে গেছে। সৌম্য কণ্ঠে তিনি বললেন, 'একেবারে চরমপত্র না দিয়ে কালকে গুরুচরণ তোমাদের বড় সাহেবের সঙ্গে কথা বলুক। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেবে।'

সর্দার গুরুচরণ বলল, 'তা-ই হবে, বাবাঠাকুর।'

ধীরে ধীরে সবাই মন্দির চত্বর ত্যাগ করল। রাত অনেক দূর গড়িয়ে গেছে। দূর থেকে কুকুরের ঘেউ ঘেউ আওয়াজ ভেসে আসছে।

পাঁচ

স্কুলটা মেথরপট্টির ভেতরেই তৈরি করে দিয়েছিল পাকিস্তান সরকার। স্কুলের নাম—ফিরিঙ্গিবাজার সেবক কলোনি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। টিনশেডের সাত কামরার স্কুলটিতে শুধু হরিজনপল্লির সন্তানরাই পড়াশোনা করত। শিক্ষা অধিদপ্তরের অর্থায়নে স্কুলটি চলত। হরিজন সর্দার আর মুখ্যদের নিয়ে তৈরি হয়েছিল পরিচালনা কমিটি। পরবর্তীকালে টিনশেড ভেঙে দোতলা বিল্ডিং তৈরি করে দেয় সরকার। চারজন শিক্ষক ওই স্কুলের। প্রধান শিক্ষক নারী—কল্যাণী সরকার। অন্য তিন শিক্ষকের একজন মুসলমান, নাম কুতুবুদ্দীন। ভোলায় বাড়ি। টিংটিঙে লম্বা। পায়জামা-পাঞ্জাবি পরেন। পায়জামা পায়ের গোড়ালি

BanglaBook.org

পর্যন্ত পৌঁছে না। পাতলা দাড়ি, হাওয়ায় ওড়ে। ছোট্ট মুখের চোয়াল ভাঙা। সাদা পাঞ্জাবির আস্তিন দিয়ে ঘন ঘন মুখ মোছেন। সুযোগ পেলেই দাড়িতে বাঁ হাত বোলান। ভোলার আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলেন তিনি। কিন্তু আঞ্চলিক ভাষার মাঝখানে তৎসম শব্দ ব্যবহার করার অভ্যাস তাঁর। হরিজনপল্লির সন্তানদের জন্য তাঁর ভেতরে একটা দরদের জায়গা আছে। মেথর ছাত্রছাত্রীদের বলেন, 'এরই, তোরা এত কুঁচকাই থাকস কিয়ল্লাই! জানসনি, তোরাই তো এই দেশের আসল জাত। অতি প্রাচীনকালে তোরাই এই ভারতবর্ষের মালিক আছিলি।' কুতুবুদ্দীন সবার আগে স্কুলে আসেন, সবার পরে যান।

অন্যজন শ্যামলী দে। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স। নাম শ্যামলী হলে কী হবে, উজ্জ্বল রং তাঁর। পৃথুলা শরীর। এই বয়সেও শরীর থেকে গৌরবর্ণ মুছে যায়নি। চুলে পাক ধরেছে। সব সময় হাঁসফাঁস করেন। থলথলে শরীরের যন্ত্রণায় আকুল তিনি। সর্বদা ঘর্মাক্ত থাকেন। বাঁ হাতে তোয়ালেশ্রেণীর রুমাল দিয়ে মুখের, গলার, ঘাড়ের ঘাম মোছেন। ঘামে ও ময়লায় সেই রুমালটি সস্তা দামের চা-দোকানের টেবিল মোছার তেনার রং ধারণ করেছে। ছাত্রছাত্রীদের পড়ানোর দিকে তাঁর তেমন নজর নেই। বারবার ঘড়ি দেখেন। চারটা বাজলেই প্রধান শিক্ষিকাকে না বলে ছাতা মাথায় বাসার দিকে রওনা দেন। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা—সব ঋতুতে তাঁর ব্যাগে একটা রংচটা ছাতা থাকে। সব ক্লাসে তিনি বাংলা পড়ান। ঠোঁটকাটা-শ্রেণীর মহিলা এই শ্যামলী দে। ফটাফট মুখ দিয়ে যা আসে বলে ফেলেন। কল্যাণী সরকার তাঁকে ঘাঁটান না। না বলে স্কুল ত্যাগ করার অভব্যতায় ভেতরে ভেতরে গজরালেও মুখে কিছু বলবার সাহস দেখান না প্রধান শিক্ষিক। কল্যাণী সরকার একবার বলেছিলেন, 'শ্যামলীদি, ক্লাসে একটু দরদ দিয়ে পড়ান। ওদের উপকার হবে।'

'দরদ দিয়ে মানে? আমি কি বেদরদি হয়ে পড়াচ্ছি নাকি? মেথরদের উপকার করেই তো জীবনটা শেষ করলাম। বিশ বছর ফেলে রেখেছে আমাকে এই মেথরপট্টিতে। করপোরেশনকে ক-ত অনুরোধ করলাম। কান দিল না আমার অনুরোধে।' উষ্মা ঝরে পড়ে শ্যামলী দে'র কথায়।

শ্যামলী কল্যাণীর চেয়ে বয়সে বড়। আইএ পাস। কল্যাণী সরকার বিএ পাস বলে হেডমাস্টার হতে পেরেছেন। বছর দশেক আগে যোগদান করেছেন তিনি এই সেবক কলোনি স্কুলে। বয়স এবং অভিজ্ঞতার কারণে শ্যামলীর মধ্যে কল্যাণীর প্রতি একটা তাচ্ছিল্য ভাব দানা বেঁধেছে। নিজের মনোভাবকে তিনি চেপে রাখেন না। সুযোগ পেলে উদ্গিরণ করেন। আজকেও তা-ই করলেন।

BanglaBook.org

কল্যাণী সরকার আমতা আমতা করে বললেন, 'না, বলছিলাম কি, গতকাল দেখলাম পঞ্চম শ্রেণীর ক্লাসে আপনি ঘুমিয়ে পড়েছেন, ছাত্রছাত্রীরা গোলমাল করছিল।'

'কত আর পড়াব? বিশ বছর তো পড়ালাম। কী উন্নতি হলো তাদের? ফাইভ পাস করেই পড়া ছেড়ে দেয়, কেউ কেউ আগে স্কুল ছেড়ে যায়। ফ্যা ফ্যা করে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে। একটু সেয়ানা হয়ে উঠলে করপোরেশনে চাকরি নেয়। গু-মুত টেনে সারা জীবন কাবার করে।' বললেন শ্যামলী।

'শুধু মেথর-সন্তানরা তো এই স্কুলে পড়ে না। অন্যরাও তো পড়ে! তাদের কথা ভেবে হলেও তো ভালো করে পড়াতে পারেন।' তারপর একটু থেমে কল্যাণী বললেন, 'বলছিলাম কি, আপনাকে ক্লাসে ঘুমাতে দেখলাম।'

এবার শ্যামলী আয়েশি ভঙ্গিতে বললেন, 'ঘুমানো তো অপরাধ না। পড়া শেষ। ঘণ্টা বাজেনি। আগে চলে এলে তো আপনি আবার কোয়েরি করবেন। একটু চোখ জড়িয়ে এসেছিল। তাতে অপরাধটা কোথায়?'

কল্যাণী সরকার বুঝলেন, শ্যামলীর সঙ্গে আর কথা বাড়ানো ঠিক হবে না। মুখ দিয়ে আরও কী আজেবাজে কথা বেরিয়ে আসবে কে জানে? চুপ থাকা ভালো। চুপ মেরে যাওয়ার আগে নিচু স্বরে বললেন, 'না, বলছিলাম কি, হইচইটা পাশের ক্লাসে অ্যাফেক্ট করছিল।'

শ্যামলী হাত নেড়ে কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন। তাড়াতাড়ি কল্যাণী বলে উঠলেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। ঘণ্টা বেজেছে, চতুর্থ শ্রেণীর সঙ্গে আপনার ক্লাস আছে এখন।'

সেই রুমালটা গলার নিচে ঘষতে ঘষতে হেডমাস্টারের কক্ষ থেকে বেরিয়ে যান শ্যামলী দে। বিশ বছরের বিরক্তি ও অভিজ্ঞতা নিয়ে শ্যামলী চতুর্থ শ্রেণীর দিকে এগিয়ে যান।

আরেকজন শিক্ষক হরিমোহন জে. দাস। জে. দাস মানে জলদাস। 'জল' শব্দের মধ্যে যত অপরাধ আর লজ্জা লুকিয়ে আছে বলে তিনি মনে করেন। তাই 'জল' শব্দটিকে ইংরেজি 'জে' বর্ণটির মধ্যে লুকিয়ে ফেলেছেন। নাম বলার সময় 'জে' বর্ণটি চাপা স্বরে উচ্চারণ করেন। দাস-এর ওপর শ্বাসাঘাত করে 'জে'-কে প্রায় অনুচ্চারিত রেখে দেন তিনি। আইডেন্টিটি কার্ডও করেছেন তিনি। মানিব্যাগে সংরক্ষণ করেন। নব্য পরিচিতদের সামনে কার্ড মেলে ধরেন। কার্ডে লেখা—হরিমোহন জে. দাস, সিনিয়র সহকারী শিক্ষক, ফিরিঙ্গিবাজার সেবক কলোনি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

বাঁশখালীর খানখানাবাদে জন্ম তাঁর। বাবা মাছবিয়ারি ছিল। বহদ্দারদের

BanglaBook.org

কাছ থেকে মাছ কিনে হাটে-পাড়ায় বিক্রি করত। সামান্য আয়ের সংসার। সংবৎসর টানাটানি লেগেই থাকত। হরিমোহন জলদাসরা চার ভাইবোন। সমুদ্রের একেবারে কোল ঘেঁষেই তাদের শণের ছাওয়া বাড়িটি ছিল। ষাটের জলোচ্ছ্বাসে জেলেপাড়াটি ভেসে যায়। সে রাতে ঝড় আর জল মহাযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। প্রতি বাড়ির দু-চারজন করে মারা গিয়েছিল সে জলোচ্ছ্বাসে। হরিমোহনদের পরিবারে হরিমোহন ছাড়া সবাই মারা গিয়েছিল। ভাসন্ত ঘরের চাল ধরে বেঁচে গিয়েছিল হরিমোহন। শেষ পর্যন্ত হরিমোহন মনোহরখালীতে চলে এসেছিল। বাঞ্ছারাম তখন মনোহরখালীর নামকরা বহদ্দার। তার তিন-তিনটি মাছ মারার বোট জলে ভাসে। ঘরের ফাইফরমাশ খাটার জন্য ছেলেছোকরা দরকার। বাঞ্ছারামের বাড়িতে হরিমোহন আশ্রয় পেল।

হরিমোহনের ভেতর পড়ার ইচ্ছা খলবল করে। এতিম হওয়ার আগে বর্ণগুলো শেখা হয়ে গিয়েছিল তার। সময় পেলে রামসুন্দর বসাকের *বাল্যশিক্ষা* নাড়াচাড়া করে। একদিন বাঞ্ছারামের চোখে পড়ে গেল হরিমোহন। বাঞ্ছারাম জিজ্ঞেস করে, 'কিরে, পড়া জানস না রে তুই?'

হরিমোহন ওপরে-নিচে মাথা নাড়ে। পাথরঘাটা জলদাস প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হরিমোহনকে ভর্তি করিয়ে দেয় বহদ্দার। কাজের ফাঁকে ফাঁকে পড়াশোনা চলতে থাকে। বাড়িভর্তি কাজের মানুষ। একজন হরিমোহন একটু কম কাজ করলে কিছু আসে-যায় না। এভাবে বেশ ক-বছর কেটে যায়। হরিমোহন তখন ক্লাস নাইনে, মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলের ছাত্র। আশ্বিনের ঝড়ে বাঞ্ছারামের বোট ডুবে বঙ্গোপসাগরে। বাঞ্ছারাম পথে বসে। আশ্রিতরা একে একে চলে যায়। হরিমোহনও আশ্রয় হারায়। কিন্তু তখন তাকে পড়ায় পেয়ে বসেছে। যেভাবেই হোক, এসএসসি পাস করতে হবে। কলাবাগিচার বলরামের এক কামরার ঝুপড়িঘর ভাড়া নিল হরিমোহন। তারপর অন্য রকম জীবনসংগ্রামের শুরু। চাকতাইয়ের কলার আড়ত থেকে কলা কিনে পথে পথে বিক্রি শুরু করে হরিমোহন। বিক্রির পর স্কুল, স্কুলের পর বিক্রি। এভাবে জীবনকে টানতে টানতে হরিমোহন একদিন আইএ পাস করল। শিক্ষকতার চাকরিটাও পেয়ে গেল।

শিক্ষক হওয়ার পর হরিমোহনের মধ্যে নিজের পদবি নিয়ে দোলাচল শুরু হলো। হীনম্মন্যতা তাকে পেয়ে বসল। ঘটনাচক্রে সুখলতা দত্তের সঙ্গে তার বিয়ে হলো। সুখলতাও শিক্ষক, তবে লক্ষ্যারচর হাইস্কুলের। দত্ত পদবির সুখলতাকে বিয়ে করে তার পদবি-সমস্যা বেড়ে গেল। কথায় কথায় স্ত্রী জানান দেয়—সে উঁচু বংশের মেয়ে। হরিমোহনের এসএসসির সার্টিফিকেটে জলদাস

BanglaBook.org

পদবিটি লেখা আছে। সার্টিফিকেটকে অস্বীকার করার উপায় নেই। বাস্তবজীবনে তিনি 'জল' শব্দটিকে অস্বীকার করলেন, তবে বুদ্ধি খরচ করে। তিনি কার্ড করলেন জে. দাস নামে, পরিচয় দিতে লাগলেন হরিমোহন জে. দাস নামে। ক্লাসে ছাত্রছাত্রীদের বলেন, 'আমি তোমাদের জে. দাস স্যার।' ছাত্রছাত্রীরা আড়ালে বলা শুরু করল, জেঠা দাস স্যার। প্রায় বছর সাতেক হয়ে গেল, জেঠা দাস এই সেবক কলোনি স্কুলে পড়াচ্ছেন।

জেঠা দাসের সঙ্গে শ্যামলী দে'র খুব খাতির। মেথর-সন্তানদের বিষয়ে দুজনের একই মত, এ জাত কখনো মানুষ হবে না। নোংরা ঘৃণ্য এই মানুষগুলো ভদ্রলোকদের গু-মুত টানার জন্য জন্মেছে। পড়ালেখা তাদের জন্য না। আগের জন্মে দুজনের বড় পাপ ছিল। নইলে কেন মেথরপট্টিতে চাকরি করতে হয়! অস্পৃশ্য এই জাতের বালবাচ্চাদের ছুঁয়ে ছুঁয়ে কী জঘন্য পাপ যে হচ্ছে, তা ঈশ্বর জানেন। মদো সম্প্রদায়, সারা দিন হইহল্লা লেগে থাকে। হল্লার মধ্যে মেথর-সন্তানদের পড়ালেখা কিছুতেই হবে না। হবে না যে তার প্রমাণ শ্যামলী দে'র গত বিশ বছরের অভিজ্ঞতা। এই পাড়া থেকে একজনও এসএসসি পাস করতে পারেনি। ধর্ম আর মদে পাওয়া জাত এরা। মদ খায় আর সন্ধেয় এসে মন্দিরে মাথা কুটে। মাতাল মেথররা মা কালীর সামনে নানা অঙ্গভঙ্গি করে কীসব বলে, মা, আমার বউয়ের যেন ইনকাম বাড়ে, বউটি যেন সুখলালের খপ্পরে না পড়ে, বড়বাবু যেন আমাকে নেক-নজরে দেখে। মদোরা এ-ও বলে, নেশা করা কি খারাপ কাজ মা? যদি খারাপ কাজ হয়, তাহলে তোমার স্বামী মহাদেব মদ-ভাং খায় কেন? আমরা তো শ্মশানে গিয়ে গায়ে ছাই মেখে বসে থাকি না। তোমার স্বামীর মতো গান গাই না, 'গাঁজা খেয়ে শুয়ে থাকি, গাছের আগায় কুকুর দেখি, বিছানাতে হাতাই ধরি মাছ রে মোহিনীর গাঁজা; তুই আমারে করলি দেওয়ানা।' নারীরা মা কালীর সামনে ধূপকাঠি-মোমবাতি জ্বালিয়ে উপুড় হয়ে প্রণাম করে। মাথা ঠেকিয়ে বিড়বিড় করে প্রার্থনা করে, 'হে মা কালী, তুমি আমার মরদের মধ্যে সদ্বুদ্ধি সৃষ্টি করো। সে যেন মদ খাওয়া ছেড়ে দেয়—এই আশীর্বাদ করো মা। নিজের আয়ের টাকা সে মদের পেছনে উড়ায়; সন্ধেয় আমার ইনকামটাও কেড়ে নেয় সে। ছেলেমেয়ের অন্নের টাকা কেড়ে নেয় আমার মরদ। টাকা না দিলে পেটায় আমাকে, চুলের মুঠি ধরে বেদম পেটায়। তারপর আমার কোঁচড় থেকে টাকাগুলো ছিনিয়ে নেয়। পাশের ভাটিখানা থেকে মদ এনে গিলতে বসে। তারপর শুরু হয় হল্লা, হইচই, অকথ্য গালিগালাজ। তুমি মা আমার মরদটাকে ভালোমানুষ করে দাও। তোমার কাছে আর কিছুই চাই না মা। শুধু আমার স্বামী মদ ছেড়ে দিক—এই আশীর্বাদ চাই।'

BanglaBook.org

প্রথম দিকে কল্যাণী সরকার কুতুবুদ্দীনকে খুব বেশি আমলে আনেননি। ঢ্যাঙা আকার, কোটরে বসা চোখ, থুতনিতে পাতলা দাড়ি, চোয়াল ভাঙা—এই লোকটি প্রথম দিকে খুব নজর কাড়েননি কল্যাণী সরকারের। একদিন স্কুল ছুটির পর কুতুবুদ্দীন কল্যাণীর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ম্যাডাম, আপনার লগে আমার কিছু কথা আছিল। অনুমতি দিলে বইসতে পারি।'

কল্যাণী সরকার নিস্পৃহ ভঙ্গিতে বলেছিলেন, 'বসুন।'

চেয়ার টেনে বসে পড়েছিলেন কুতুবুদ্দীন। ছাত্রছাত্রীরা যার যার ঘরে ফিরে গেছে। ফিরে গেছেন শ্যামলী দে আর হরিমোহন জে. দাস। দপ্তরি শ্রেণীকক্ষে তালা লাগাচ্ছে। স্কুল কম্পাউন্ড নির্জন হয়ে পড়েছে। কল্যাণী এই লোকটিকে বসার অনুমতি দিয়ে ভুল করলেন না তো! একটু শঙ্কাগ্রস্ত হলেন তিনি। মুখেও বোধ হয় অস্বস্তির ভাবটা ফুটে উঠেছিল।

কুতুবুদ্দীন বললেন, 'ভয় পাবেন না ম্যাডাম। আল্লা আমারে বেঢইক্যা করি বানাইছেন। এতে আমার হাত নাই। কিন্তু মন নির্মাণে আমার হাত আছে। ভালো মাইনষের মতন মন তৈরি কইত্তে আজীবন চেষ্টা করি যাচ্ছি।'

কুতুবুদ্দীনের দিকে চোখ তুলে কল্যাণী বললেন, 'আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না।'

'আঁই ভালা মানুষ কি না—এই ব্যাপারে আন্নার মনে সন্দেহ আছে। একে তো টিংটিঙা, মুখে দাড়ি, হরহামেশা মাথায় টুপি। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ হড়ি আঁই। ভাবেন—মোল্লা টাইপের এই মানুষটি আর কত্তুন ভালা অইবো।' ধীরে ধীরে কথাগুলো বলে গেলেন কুতুবুদ্দীন।

কল্যাণী অবাক চোখে তাকিয়ে থাকলেন কুতুবুদ্দীনের দিকে। কী আশ্চর্য, এই মানুষটি তাঁর মনের কথা জানলেন কী করে? অন্তর্যামী নাকি? কল্যাণী ইতস্তত করে বললেন, 'না, ঠিক তা না।'

'ঠিক তাই ম্যাডাম।' মুখের কথা কেড়ে নিলেন কুতুবুদ্দীন। তারপর বললেন, 'দরিদ্র ঘরে জন্ম আমার। মাঝির পোলা আমি। বাবা কালাম মোল্লার বোটে মাঝিগিরি কইত্তো। বেশির ভাগ সময় নদী-সমুদ্রে হড়ি থাইকতো। আমাদের ভাইবোনদের কাছে মা-ই ছিল সব। বাবা মাদ্রাসায় হড়তে দিছিল আমারে। মা ছাড়াইয়া আনল। স্কুলে হাডাইল। কী কষ্ট না কইছে মা আমার জইন্য!' বলে একটু থামলেন কুতুবুদ্দীন।

নিজের অজান্তেই যেন কল্যাণী বলে উঠলেন, 'তারপর?'

'একদিন হুইনলাম, বাবা ডাকাইত। মাঝিগিরির নামে ডাকাতি কইত্তো বঙ্গোপসাগরে। ধরা পইল্লো। থানা অন্য পাঁচজনের লগে আমার বাপেরও

BanglaBook.org

চালান দিল। দশ বছরের জেল অইল বাপের। খুনাখুনির লগে তার নাম জড়াই গেছিল।'

কল্যাণী কুতুবুদ্দীনের কথাগুলো যেন গিলছিলেন। দপ্তরি কখন দরজার বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে খেয়াল করেননি। বড় একটা ঢোক গিলে কল্যাণী জিজ্ঞেস করলেন, 'তারপর? তারপর কী হলো?'

'কী আর অইবো! গেরামের মানুষ আমারে ডাকাইতের পোলা বইলা ডাইকতে লাইগলো। যেখানেই যাই খুনি জেলবন্দী আসামির পোলা হিসাবে নিন্দা পাইতে লাগলাম। এর মইধ্যে এসএসসি পাস কইল্লাম। সন্দ্বীপ কলজত্তোন আইএ পাস করি সহকারী শিক্ষক পদের হরীক্ষা দিলাম। এইখানেই পোস্টিং দিল আমারে সরকার।' অনেকক্ষণ কথা বলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন কুতুবুদ্দীন। এক গ্লাস পানি খেতে চাইলেন। দপ্তরি এক গ্লাস পানি এনে তাঁর সামনে রাখল। খালি গ্লাস টেবিলে নামিয়ে রেখে কুতুবুদ্দীন বললেন, 'অসহায় মেথর-সন্তানদের আমি বড় ভালোবাসি ম্যাডাম। মা মারা যাওনর পর পিছুটান নাই আমার। অভয় মিত্র ঘাট এলাকায় থাকি। মেথররা বড় অসহায়। তাদের সন্তানদের শিক্ষিত হওন বড় জরুরি।'

কল্যাণী বললেন, 'আমারও তো একই অভিমত। শিক্ষিত হওয়া ছাড়া মুক্তি নেই এদের। শহরের ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করার চাকরিটা আগে শুধু ওদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। পুরুষানুক্রমে ওই চাকরিটা তারা করত। এখন শুনছি করপোরেশনের বড় সাহেব আবদুস ছালাম সবার জন্য চাকরিটা উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।'

'তাইলে মেথরদের জীবন আরও অন্ধকারে ভরি যাইবো।' কুতুবুদ্দীন বললেন।

'মদ-ভাং খাওয়া এই জাতটার চাকরিটা নিশ্চিত ছিল বলে দুবেলা দুমুঠো খেতে পারত। হিন্দু-মুসলমানরা কাড়াকাড়ি করে চাকরিটা ছিনিয়ে নেবে। চাকরি না পেলে ভিক্ষুকে পরিণত হবে ওরা।' কাতর গলায় কথাগুলো বললেন কল্যাণী।

কুতুবুদ্দীন বললেন, 'হুনছি এরা নাকি একজোট অইছে। প্রতিবাদ কইরবো নাকি এরা।'

'সেটাই শঙ্কা। একবার প্রতিবাদ করেছিল, রক্ত ঝরেছিল। আরেকবার প্রতিবাদ করলে ওদের আরও কোণঠাসা করে ফেলবে করপোরেশন। ছালাম সাহেব ভালো লোক নন। বড় ঘরের সন্তান তিনি। কিন্তু মনটা বড় ছোট। মেথরদের তিনি ঘৃণা করেন। যেভাবেই হোক আন্দোলন-প্রতিবাদ থামিয়ে

BanglaBook.org

দেবেন।' বললেন কল্যাণী।

'ইসলাম তো এই দুনিয়ার মানুষদের সাইম্যের বাণী হুনাইছে। মুসলমান অইয়াও কেন যে তাঁর কানে আল্লার বাণী হৌছাইল না, কে জানে!'

কল্যাণী বললেন, 'ছালাম সাহেবের কানে পৌঁছালেও বাণীর মর্মার্থ তিনি হৃদয়ে ধারণ করেননি।'

কুতুবুদ্দীন দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'আন্নে বলছেন কিছুই অইতো নো? আন্দোলন-ফান্দোলন হগলকিছু দমাই ফেইলবো?'

'শেষ পর্যন্ত স্কুলটারও কী অবস্থা হবে জানি না। অধিদপ্তর পরিচালিত স্কুল। করপোরেশন কৌশলে স্কুলটার দায়িত্বভার নিয়ে নিয়েছে। বলেছে, সেবকরা করপোরেশনের অধীনে চাকরি করে। তাদের সুখ-দুঃখ করপোরেশন ভাল বোঝে। তাই স্কুল পরিচালনার দায়িত্বটা তাদের দেয়া উচিত। শিক্ষা অধিদপ্তর তাদের যুক্তি মেনে নিয়েছে। একদিন ছালাম সাহেব আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। বলেছিলেন, স্কুল পরিচালনা কমিটির সভাপতি আর সেক্রেটারি হবে এই অফিসের কেউ। মেথরদের দু-একজন সদস্য-মদস্য থাকবে।' বললেন কল্যাণী।

'কী বলেন ম্যাডাম?'

কল্যাণী সরকার বললেন, 'শুধু তা-ই না, ছালাম সাহেব বলেছিলেন, এই স্কুলটি শুধু মেথর-সন্তানদের জন্য সীমিত থাকবে না। অন্যান্য সম্প্রদায়ের সন্তানরাও পড়বে। দেয়াল ভেঙে স্কুলের গেইট বাইরের দিকে করা হবে। ভেতরদিকে দেয়াল তোলা হবে। তা-ই করেছিলেন তিনি। ফলে হরিজনপল্লি থেকে স্কুলটি বিচ্ছিন্ন হলো।'

কুতুবুদ্দীন দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'ঘরের লগে লাগানো স্কুল। তাও ওরা হড়তে আসে না। রাস্তা ঘুরি যাইতে অইলে স্কুলে আসাই ছাড়ি দেওনর কথা। আরও অন্ধকার নামি আইয়নর কথা হেগো জীবনে।'

'আ-র-ও অন্ধকার নেমে এল তাদের জীবনে।' বেদনা জড়ানো কণ্ঠে টেনে টেনে কথাগুলো বললেন কল্যাণী সরকার। 'অল্প ক-মাসের মধ্যে ছালাম সাহেব যা বলেছিলেন, তা-ই করলেন। স্কুলের গেইট বাইরের দিকে ঘুরে গেল। মেথরপল্লি আর স্কুলের মাঝখানে দেয়াল উঠল। পরিচালনা কমিটি থেকে গুরুচরণকে অব্যাহতি দিল। কন্ট্রাক্টর হাজি আবদুল হাকিমকে পরিচালনা কমিটির সেক্রেটারি করা হলো। আবদুস ছালাম নিজে সভাপতি হলেন।' কল্যাণী বলে গেলেন। তারপর ক্লান্ত কণ্ঠে দপ্তরিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আমাকেও এক গ্লাস পানি দাও ইউনুছ।'

BanglaBook.org

পানি খেয়ে কল্যাণী আবার বলা শুরু করলেন, 'সেবক কলোনির সবাই মিলে প্রতিবাদ করল। গুন্ডা লেলিয়ে দিল করপোরেশন। পিটিয়ে গুরুচরণকে আধা মরা করা হলো। অন্যদের চাকরি কেড়ে নেয়ার ভয় দেখাল।'

কুতুবুদ্দীন জিজ্ঞেস করলেন, 'হরিজনরা কী করল?'

'কী আর করবে! আন্দোলন-প্রতিবাদ থেমে গেল। মেথর-সন্তানরা স্কুলে আসা বন্ধ করে দিল। হাজি সাহেবের প্ররোচনায় আশপাশের এলাকা থেকে অন্যান্য সম্প্রদায়ের বাচ্চারা স্কুলে আসা শুরু করল।' কল্যাণী বললেন।

'হরিজন-সন্তানদের হিরাই আইনবাল্লাই আন্নে কিছু করেন নাই?'

'করেছি। হরিমোহনবাবু, শ্যামলীদি আর হাজি সাহেবের বাধাকে তোয়াক্কা না করে আমি সেবক কলোনিতে গিয়ে গুরুচরণকে অনুরোধ করেছি তাদের বাচ্চাদের স্কুল পাঠানোর জন্য।'

'সর্দার কী বললেন?' মাথার টুপি ঠিক করতে করতে কুতুবুদ্দীন জিজ্ঞেস করলেন।

'প্রথমে তো সর্দার কিছুতেই রাজি হচ্ছিল না। বললাম, সর্দার, তোমার কষ্টটা আমি বুঝি। তার পরও বাচ্চাদের স্কুলে না পাঠালে তোমাদের রাগটা বজায় থাকবে, কিন্তু বড় ধরনের ক্ষতি হয়ে যাবে তোমাদের। সামনে তোমাদের আরও দুর্দিন আসছে। শিক্ষা দিয়েই শুধু তা তোমরা ঠেকাতে পারবে।'

'শেষ পর্যন্ত রাজি হইলেন না সর্দার?'

কল্যাণী সরকার বললেন, 'আমার ভারী ভারী কথা শুনে সর্দার বেশ কিছুক্ষণ গুম মেরে থাকল। জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাল। তারপর মন্দিরে ঢুকল। বাবাঠাকুরের সঙ্গে নিচু স্বরে কী যেন কথাবার্তা হলো। বেরিয়ে এসে বলল, ঠিক আছে দিদি। হরিজনদের মধ্যে যারা যারা ইচ্ছুক, তারা তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাবে। আমি আপত্তি তুলে নিলাম।'

'খুব বেশি সংখ্যায় তো তারা হড়তে আসে না।' কুতুবুদ্দীন বললেন।

'সর্দার তার নাতির হাত ধরে প্রথমে স্কুলে এল। ভর্তি করিয়ে দিয়ে গেল ওয়ানে। তার দেখাদেখি অনেক হরিজন-সন্তান স্কুলে আসা শুরু করল। কিন্তু আগের মতন না। যারা এল তারাও খুব স্বস্তিতে পড়াশোনা করতে পারছে না। আমাদের দুই শিক্ষক তাদের পেছনে লেগে আছে। হাজি সাহেব তো আছেই।'

'সে তো অনেক বছর আগের কথা ম্যাডাম। আজ হেই রামগোলাম এসএসসি পাস কইছে।' কুতুবুদ্দীন বললেন।

কল্যাণী দরদি কণ্ঠে বললেন, 'এই শহরে যে চারটি সেবক কলোনি আছে, তাদের মধ্যে প্রথম এসএসসি পাস রামগোলাম। সেই ছোট্ট ছেলেটি আজ তরুণ

BanglaBook.org

হয়ে উঠেছে।'

'তারে দেখলে বড় আনন্দ লাগে আমার,' কুতুবুদ্দীন বলেন।

'আমারও।' বলতে বলতে বাইরে তাকালেন কল্যাণী সরকার। কখন আঁধার হয়ে এসেছে কথায় মগ্ন ছিলেন বলে টের পাননি। একটু উঁচু কণ্ঠে বললেন, 'ইউনুছ, কোথায় গেলে? দরজা বন্ধ করো। চলো যাই। আপনিও আসেন কুতুব সাহেব।'

'ঠিক আছে ম্যাডাম। আমার যাওয়া আর কী! অন্ধকার ঘুপচি ঘরে ফিরে যাওয়া। নিজের হাতে ভাত রাঁধা, ডিম সিদ্ধ করা। তারপর গোগ্রাসে গিলা। এরপর বিছানায় শুয়ে পড়া।'

কল্যাণী অবাক চোখে তাকিয়ে রইলেন কুতুবুদ্দীনের দিকে, কী আশ্চর্য! কুতুবুদ্দীন তো গরগর করে বিশুদ্ধ বাংলায় কথা বলছেন! তাহলে আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলেন কেন? প্রশ্নটি করবেন করবেন করেও করলেন না কল্যাণী। ব্যাগটা কাঁধে তুলে নিলেন, তারও তো কুতুবুদ্দীনের মতো একাকিত্বের ঘরে ফিরে যেতে হবে।

ছয়

গুরুচরণের শরীরে ভাটা লেগেছে। চাকরিও যায় যায়। ক্লান্তি প্রায় সময়ই পেয়ে বসে তাকে। তখন বারান্দায় মাথা নিচু করে বসে থাকে। অঞ্জলি জিজ্ঞেস করে, 'শরীর খারাপ? পানি দেব এক গ্লাস?'

'দাও পানি! শরীর খারাপ না। বয়স বলছে—তোমার দিন ফুরিয়ে এসেছে গুরুচরণ।' নিচের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বলল গুরুচরণ। নিচের কাদাময় উঠানের এক পাশে বেশ কয়েকটি শূকর তাদের ছানাদের নিয়ে লুটোপুটি খাচ্ছে। একটা মাদি শূকর কাদায় গা ডুবিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। তার গায়ের ওপর চার-পাঁচটা বাচ্চা উঠছে, আবার হুড়মুড় করে থকথকে কাদায় গড়িয়ে পড়ছে। মা-শূকরটি কিছুক্ষণ পর পর কান ও পা ঝাঁকাচ্ছে। যেন আনন্দে শিহরিত হচ্ছে সে।

BanglaBook.org

'কী কথা বলছ তুমি? তোমার দিন ফুরিয়ে আসবে কেন?' অঞ্জলির অভিমান ভরা কণ্ঠ।

'তোমার কি মনে আছে, তোমাকে যে সময় বিয়ে করে ঘরে আনলাম, কী তরুণ ছিলাম আমরা! আজ দেখো, আমরা কত বুড়া হয়ে গেছি। তোমার আমার সব চুল পেকে গেছে, দাঁতও পড়ে গেছে অনেকগুলো। আমাদের চামড়া কুঁচকে গেছে—ঠিক ওই মাদি শুয়োরটির মতো।' নিচে ক্রীড়ারত মা-শুয়োরটির দিকে আঙুল তুলল গুরুচরণ।

অঞ্জলি নিচের দিকে তাকাল। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস তার বুক চিরে বেরিয়ে এল। ধীরে ধীরে বলল, 'তুমি ঠিকই বলেছ, কীভাবে ফুরিয়ে গেল আমাদের জীবনটা।'

'ফুরায়নি। বলো, নতুন করে আমরা যৌবন পেয়ে গেছি। রামগোলামের দিকে তাকালে তোমার তাই মনে হয় না?' গুরুচরণ বলে।

আজ একটু আগেভাগে ফিরে এসেছে গুরুচরণ। শিউচরণ এখনো ফেরেনি। আগ্রাবাদের অফিসার্স কলোনিতে আজ শিউচরণের ডিউটি পড়েছে। ইদানীং রাস্তার পাশে পাশে ইটের ডাস্টবিন তৈরি করে দিয়েছে করপোরেশন। ছোট ছোট ট্রলিতে করে গলি-উপগলির আবর্জনাগুলো ওই সব বড় ডাস্টবিনে ফেলে শিউচরণরা। ওখান থেকে খোলা ট্রাকে করে ওগুলো নিয়ে যাওয়া হয় হালিশহরের রেললাইনের পাশে। ওখানকার খানাখন্দগুলো ভরাট করা হচ্ছে শহরের আবর্জনা দিয়ে। ফিরিঙ্গিবাজার থেকে হালিশহর অনেক দূরে। কাজ শেষে হালিশহর থেকে ফিরতে শিউচরণের তাই দেরি হচ্ছে। চাঁপারানীও সিটি করপোরেশনে কাজ পেয়ে গেছে বেশ ক-বছর আগে। তার চাকরি পেতে খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি। সর্দার গুরুচরণের পুত্রবধূ বলে জমাদার ওকে চাকরিতে বহাল করার ক্ষেত্রে গাঁইগুঁই করেনি। আন্দরকিল্লা এলাকার রাস্তা পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে চাঁপারানী এবং আরও কয়েকজনকে। চারহাতি চিকন বাঁশের আগায় শলার ঝাড়ু বাঁধা। এগুলোকে ডান্ডাওয়ালা ঝাড়ু বলে ওরা। হাতলঝাড়ু ঘষে ঘষে ধুলাবালি রাস্তার পাশে জড়ো করে চাঁপারানীরা। পুরুষরা ওই বালি বেলচামতন দুটি টিনের টুকরা দিয়ে লোহার ট্রলিতে তুলে নেয়। ট্রলিতে দুটি হাতল আছে। তার নিচ বরাবর লোহার দুটো ঠ্যাং, সামনের দিকে একটি ঢাকা। বালি-আবর্জনায় ওই ট্রলি ভরে গেলে হাতল ধরে পুরুষরা বড় ডাস্টবিনের দিকে নিয়ে যায়। বড় ডাস্টবিন থেকে ওগুলো সিটি করপোরেশনের ট্রাকে ওঠে।

কাজ শেষ করে ক্লান্ত দেহে বাড়ি ফেরে চাঁপারানী। বাড়ি পৌঁছার আগে

BanglaBook.org

ফিরিঙ্গিবাজারে ঢোকে। নিত্যদিনের বাজার এখন সে করে। শাশুড়ি এখন বুড়ো হয়ে গেছে। একা হাঁটতে কষ্ট হয়। একটানা দীর্ঘপথ হাঁটতে পারে না। কিছুদূর হেঁটে কোমর সোজা করে দাঁড়ায় অঞ্জলি। গাছতলা বা বিল্ডিংয়ের ছায়া দেখে জিরিয়ে নেয় কিছুক্ষণ। বাজারের থলে নিয়ে তার পক্ষে হাঁটা দুষ্কর। তাই চাঁপারানী বাজার করার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। হরিজনপল্লির পুরুষরা নিত্যদিনের বাজার করার ব্যাপারটিকে বোঝা মনে করে। তারা বিশ্বাস করে—এটা মেয়েলি কাজ। ওসব ছুটকাছাটকা কাজে অপচয় করার মতো সময় তাদের কোথায়? তার চেয়ে মন্দির চত্বরে বা রকে বসে আড্ডা দেয়া অনেক ভালো, দু-চার গ্লাস বাংলা গিলে একটু মাতাল হওয়া অনেক পৌরুষেয়। নিদেনপক্ষে তাস পেটানো বা গাঁজার কলকি নিয়ে গোল হয়ে বসে সিনেমার গল্প করার মধ্যে পুরুষত্বের যথার্থতাকে খুঁজে পেতে ওরা আনন্দ পায়। মেথরসমাজে সন্তান ধারণ করা থেকে লালনপালন, অসুখে রাতজাগা থেকে মন্দিরে পুজো, বাজার করা থেকে ঘরদোর ঝাঁট দেয়া—সবই নারীদের কাজ। পুরুষরা শুধু বউয়ের পেটে সন্তান আনবে, মদের টাকার জন্য বউ পেটাবে, সময়মতো হাত ধুয়ে পাতে বসবে আর মদ খেয়ে হয় নালায় পড়ে থাকবে, নয় গভীর রাত পর্যন্ত হল্লা করবে।

গুরুচরণ মদাসক্ত নয়, শিউচরণ মদ ছোঁয় না। হল্লা-হইচইয়ে মশগুল হওয়া এই পরিবারের পুরুষদের বৈশিষ্ট্য নয়। কিন্তু অন্যান্য হরিজনের মতো তারাও ডাল-তরকারি, মাছ-আটা-চাল-পেঁয়াজ কেনাকে পুরুষের কাজ বলে মনে করে না। তাই বাজার করার দায়ভার ছিল অঞ্জলির ওপর, অঞ্জলির পর দায়িত্ব বর্তেছে চাঁপারানীর ওপর। ভোর-সকালে রওনা দেয়ার সময় বাজারের থলেটি সঙ্গে নেয় চাঁপারানী। কাপড়ের থলে। টুকরাটাকরা কাপড় দিয়ে গলির মুখের দর্জিকে দিয়ে সেলাই করে নিয়েছে। দুপুরে থলে থেকে মাছ-তরকারি নামিয়ে, ধুয়ে বারান্দার শিকে শুকাতে দেয়। রওনা দেয়ার সময় ভাঁজ করে কোমরে গুঁজে নেয় থলেটি। দুপুরের দিকে ফিরিঙ্গিবাজার ভাঙার মুখে। অনেক দোকানদার তাদের ব্যবসাপাতি গুটিয়ে বাড়িতে চলে যায়। ঝাড়াঝুড়া মাছ-তরকারি নিয়ে দু-চারজন বসে থাকে। চাঁপারানীর মতো মেথরপট্টির অনেকেই তখন বাজারে ঢোকে। চেয়েচিন্তে দরদাম করে তরিতরকারি কেনে, মাছ কেনে, পেঁয়াজ-রসুন কেনে।

অঞ্জলি প্রসঙ্গ পাল্টায়। বলে, 'বউটি এখনো ফিরল না, অনেক দুপুর হয়ে গেল।'

গুরুচরণ শিউচরণের বউকে বউ বলে না, বলে রামগোলামের মা। বলে

BanglaBook.org

'কাজের চাপ বেশি বোধ হয় আজকে। তা ছাড়া বাজার করে আনবে তো রামগোলামের মা! বড় কষ্ট মেয়েটার!'

'কী করব আমি, বলো! লাভলেইনের মুখে রাস্তা সাফাই করতে দিয়েছে আমাকে। কাজ শেষে ওখান থেকে হেঁটে আসতে কষ্ট হয় আমার। টাকা কোথায় যে রিকশায় আসব! বউ আমার কষ্ট বোঝে। বাজারের থলে নিয়ে কুঁজো হয়ে হাঁটতে দেখেই না বউ একদিন আমার হাত থেকে থলেটা কেড়ে নিল। বলল, তোমাকে আর বাজার করতে হবে না মা। আজ থেকে আমিই সব করব। বড় ভালো মেয়ে। আমাদের শিউর জন্য একজন ভালো বউ ঘরে তুলেছিলে তুমি।' বলতে বলতে হাঁপিয়ে উঠল অঞ্জলি।

গুরুচরণ বলল, 'অত কথা বোলো না। হাঁপিয়ে উঠেছ তুমি। তুমি বাধা দিলে আমি কি সেদিন রামগোলামের মাকে বউ করে আনতে পারতাম? পারতাম না।'

'বউটি আমাদের একটি ফুটফুটে নাতি উপহার দিল। বংশ রক্ষা হলো আমাদের।' অঞ্জলি বলল।

'সেদিনের সেই ফুটফুটে ছোট্ট নাতিটি আজ তরুণ। বড় পাস দিয়েছে সে। সামনে দিয়ে যখন ঘুরে বেড়ায় কী অহংকার লাগে আমার, বলে বোঝাতে পারব না!' গুরুচরণের অবয়বে আনন্দের ঝিলিক।

অঞ্জলি বলল, 'সেদিন যদি তুমি রাগ করে থাকতে, অভিমান করে যদি কল্যাণী দিদির কথা না শুনতে, আজ আমাদের রামগোলাম মূর্খ হয়ে থাকত।'

'ঠিক বলেছ তুমি। আমার ওই দিনের রাগে বড় ক্ষতি হয়ে যেত আমাদের।' আস্তে আস্তে বলল গুরুচরণ।

অঞ্জলি প্রসঙ্গ পাল্টায়। বলে, 'রামগোলামের মধ্যে আমরা বেঁচে থাকব। সে শিউর মতো চুপচাপ নয়, তোমার মতো প্রতিবাদী। শরীরটা পেয়েছে শিউচরণের, মেজাজটা পেয়েছে তোমার।'

'ঠিক বলেছ তুমি, রামগোলামকে দেখলে আমার তরুণজীবনের কথা মনে পড়ে। আবার ফিরে যেতে ইচ্ছে করে সেই বয়সে।'

'সেটা কি আর সম্ভব? ক-ত বছর আগে ফেলে এসেছ সেই বয়স, সেই জীবন।'

'কেন সম্ভব নয়? পুরানা কালে নাকি সম্ভব ছিল, ছেলের যৌবন নাকি বাপ ধার নিয়েছিল।' হাত নেড়ে কথাগুলো বোঝাতে গিয়ে পাশে রাখা খালি গ্লাসটিতে হাত লাগল গুরুচরণের। মেঝেতে গড়িয়ে পড়ে ঝনঝনাৎ আওয়াজ তুলল গ্লাসটি।

BanglaBook.org

গ্লাসটি কুড়িয়ে নিতে নিতে অঞ্জলি বলল, 'সে কেমন? শুনিনি তো আগে কখনো?'

'আমিও জানতাম না। বাবাঠাকুরের কাছে সেদিন শুনলাম। বার্ধক্যের কথা উঠল, মৃত্যুর কথা উঠল। বাবাঠাকুর আমাদের রাজা যযাতির কথা শুনালেন।' আবেগপ্রবণ কণ্ঠে বলে গেল গুরুচরণ।

'যযাতি কে? কী তাঁর কাহিনি?' প্রবল আগ্রহে জানতে চায় অঞ্জলি। বাবাঠাকুরের সেদিনের কথা বলে যায় গুরুচরণ। বাবাঠাকুরের চারপাশ ঘিরে মেথরপট্টির অনেকে বসেছিল সেদিন। বান্ডেল থেকে এসেছিল রামলাল, বদন, সুখলাল এরা। পশ্চিম মাদারবাড়ি থেকে এসেছিল রাখাল কাকা। ঝাউতলার পট্টি থেকে সদলবলে এসেছিল মুখ্য রামকিঙ্কর। ফিরিঙ্গিবাজার মন্দির চত্বরে এ রকম আসর বসে মাঝেমধ্যে। বাবাঠাকুরের কাছে শুনতে চায় নানা কথা। যেদিন বাবাঠাকুরের মন ভালো থাকে, সেদিন কথা বলেন—ধর্মের নানা কথা, পুরাণের নানা গল্প। যেদিন মন খারাপ থাকে, সেদিন চোখ বন্ধ করে চুপচাপ মা কালীর সামনে বসে থাকেন। আগতরা বসে থাকে। একসময় তারা যখন বোঝে যে, বাবাঠাকুর চোখ খুলবেন না, কথা বলবেন না—একে একে চত্বর ত্যাগ করে তারা।

আজ বাবাঠাকুরের মন ভালো। কে যেন জীবন ফুরিয়ে যাওয়ার কথা তুলল, মৃত্যু-জরার কথা তুলল। তাকে থামিয়ে দিয়ে তিনি মহাভারতের রাজা যযাতির গল্প বলা শুরু করলেন।

চন্দ্রবংশের রাজা যযাতি। দুই স্ত্রী তাঁর—দেবযানী আর শর্মিষ্ঠা। দুজনের গর্ভেই সন্তান উৎপাদন করে রাজা। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীর ঘরে দুই পুত্র—যদু ও তুর্বসু। দৈত্যরাজ বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠার গর্ভে জন্মাল তিন পুত্র—দ্রুহ্য, অনু আর পুরু। বিয়ের আগে দেবযানীর কোপানলে পড়ে রাজকন্যা হয়েও দেবযানীর সখী হতে হলো শর্মিষ্ঠাকে। সখী মানে দাসী। জলবিহারের স্থলে জলপানরত যযাতিকে দেখে আত্মহারা হলো দেবযানী। যযাতির স্ত্রী হতে চাইল দেবযানী, দুই সহস্র দাসী আর সখী শর্মিষ্ঠাসহ। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বিয়ে সমাজ-অসমর্থিত। তাই রাজি হলো না যযাতি। শুক্রাচার্যের চাপাচাপিতে শেষ পর্যন্ত বিয়েতে সম্মতি দিল রাজা। দেবযানীর চেয়ে শর্মিষ্ঠার দিকেই রাজার টান। শর্মিষ্ঠার পেটে প্রথম বাচ্চা আসার পর দেবযানী খেপে যায়। শর্মিষ্ঠার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'আমার অধীনস্থ হয়ে আমার পতির সঙ্গে তুমি গর্হিত কর্ম করেছ কেন?' শর্মিষ্ঠা অবিচল চিত্তে উত্তর দেয়, 'আমার দ্বারা কোনো গর্হিত কর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি ন্যায় আর ধর্মের পথে চলেছি। তুমি রাজা যযাতিকে

BanglaBook.org

পতিরূপে গ্রহণ করেছ, আমি যেহেতু তোমার সখী এবং তোমার অধীন, সেহেতু তোমার স্বামী আমারও স্বামী।'

যুক্তিটিকে আপাতত মেনে নিল দেবযানী। কিন্তু ভেতরের ক্ষোভ গেল না। অসুরকন্যার কাছে স্বামী-সমর্পণে রাজি নয় সে। পিতা শুক্রাচার্যের কাছে যযাতি এবং শর্মিষ্ঠার বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। কন্যার সুখই পিতার সুখ। যযাতির আচরণে আর বিশ্বাসঘাতকতায় ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন শুক্রাচার্য। অভিশাপের বিধ্বংসী তর্জনী তুললেন দৈত্যগুরু। গর্জন করে বললেন, 'হে যযাতি, তুমি পথভ্রষ্ট, কামান্ধ তুমি। নইলে কেন দ্বিগামী হলে, কেন দেবযানী থেকে শর্মিষ্ঠার দিকে চোখ ফেরালে?'

যযাতি শুক্রাচার্যের সামনে অবনত মস্তকে নীরব রইল। যযাতির নীরবতা শুক্রাচার্যকে আরও ক্রুদ্ধ করে তুলল। বললেন, 'অভিশাপ দিচ্ছি তোমাকে—জরাগ্রস্ত হও তুমি, তোমার যৌবন তিরোহিত হোক। তোমার ভেতরে কামনা ধিকিধিকি জ্বলবে, কিন্তু ওইটুকই। কামনাকে চরিতার্থ করার জন্য যে শারীরিক শক্তি ও প্রত্যঙ্গ সবলতার প্রয়োজন, তা তোমার থাকবে না।'

যযাতি শুক্রাচার্যের হাঁটুর কাছে ভেঙে পড়ল। বলল, 'এত বড় অভিশাপ আমাকে দেবেন না প্রভু। নবীন বয়স আমার। জীবনকে এবং পৃথিবীকে আমি এখনো ইচ্ছেমতো ভোগ-উপভোগ করতে পারিনি। আমার জীবন, আমার যৌবন ভোগ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করবেন না প্রভু।' যযাতির অনুনয়-বিনয়ে দৈত্যগুরুর অন্তর কোমল হয়ে গেল। তাঁর মন থেকে রাগ তিরোহিত হল। শুক্রাচার্য বললেন, 'ব্রাহ্মণ আমি, আমার অভিশাপের ব্যত্যয় হবে না কখনো। তবে এই জরাগ্রস্ততা থেকে আপাত মুক্তি পেতে পারো তুমি। একটা পথ খোলা আছে।'

'কী পথ প্রভু! সেই পথের সন্ধান দিন আমাকে।' কাতর কণ্ঠে বলল রাজা। এবার স্নিগ্ধ কোমলকণ্ঠে দৈত্যগুরু বললেন, 'ইচ্ছে করলে তুমি অন্যের দেহে তোমার জরা স্থানান্তরিত করতে পারো।'

'সে কেমন প্রভু?'

'যার সঙ্গে বদলাবদলি করবে, তার যৌবন অর্থাৎ সামর্থ্য তোমার দেহে আর তোমার জরা তথা অসামর্থ্য তার দেহে স্থানান্তর হবে।' শুক্রাচার্য বললেন। বলে স্থান ত্যাগ করলেন তিনি।

এরপর জরাগ্রস্ত যযাতি একে একে পুত্রদের আহ্বান জানালেন, 'হে পুত্রসকল, তোমাদের যৌবন ঈর্ষা-জাগানিয়া। তোমরা সুপুরুষ। তোমাদের কামনা অগ্নিসম, সৌন্দর্য কন্দর্পতুল্য। তোমাদের মতো আমিও সুপুরুষ ছিলাম,

BanglaBook.org

কামনাঋদ্ধ যৌবন ছিল আমার। দুর্ভাগ্যবশত পতির দায়িত্ব সম্পাদন করতে গিয়ে আমি অভিশপ্ত হয়েছি; আমি জরাগ্রস্ত হয়েছি। আমার যৌবন গেছে সত্য, কিন্তু কামনার অগ্নিকুণ্ড আমার ভেতরে জ্বলন্ত। পৃথিবীর অনেক কিছু এখনো আমার অধরা রয়ে গেছে, আমার অনেক কামনার বাস্তব রূপ দিতে পারিনি। এগুলোর বাস্তব রূপ দিতে গেলে যৌবন চাই। আমি তোমাদের কাছে যৌবন ভিক্ষা চাইছি। আমি তোমাদের যৌবন নিয়ে কিছুদিন পৃথিবীর সুখ ভোগ করব। মাত্র এক হাজার বছরের জন্য তোমাদের যৌবন ভিক্ষা চাইছি। এক হাজার বছর পর তোমাদের শরীর থেকে আমি জরা ফিরিয়ে নেব, যৌবন ফিরিয়ে দেব। তোমরা আমার পাঁচ পুত্র। কে দেবে যৌবন, কে নেবে আমার জরা?'

দেবযানীর বড় পুত্র যদু বলল, 'ভরা যৌবন আমার, পুষ্পিত রমণীসমৃদ্ধ পৃথিবী আমাকে আহ্বান জানাচ্ছে, এই সময়ে আমার যৌবন তোমাকে ধার দিতে পারি না।'

পেছনে দাঁড়িয়ে যদুরই সহোদর তুর্বসু। পিতার দিকে স্তম্ভিত চোখে তাকিয়ে আছে। স্পষ্টভাষী সে। পিতাকে সে বলল, 'অভিনব কৌশল বাবা তোমার। যৌবন চুরির প্রস্তাব দিচ্ছ তুমি আমাদের। এক-দুই, পাঁচ-দশ এমনকি এক শ বছরের জন্যও না; একেবারে এক হাজার বছরের জন্য! যৌবন বদলাবদলির কুহকে আমি আটকে যেতে চাই না। তোমার প্রস্তাবকে আমি ফিরিয়ে দিচ্ছি।'

শর্মিষ্ঠার পুত্ররা পরিশীলিত। তারা সৌম্য, সৌষ্ঠবময়। দ্রুহ্য যযাতির সামনে এগিয়ে এল। মাটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার প্রস্তাব যুক্তিগ্রাহ্য। কিন্তু বাবা আমার যে প্রেমিকা আছে! সে আমার সৌন্দর্যকে উপভোগ করে, যৌবনকে স্পর্শ করে। আমি জরাগ্রস্ত হলে এক হাজার বছর সে অপেক্ষা করবে না। অন্য পুরুষে মগ্ন হয়ে পড়বে সে। আমি যৌবন এবং প্রেমিকা দুটোকে একসঙ্গে হারাতে চাই না, বাবা।' বলে যযাতির সম্মুখভাগ থেকে দ্রুত সরে গেল দ্রুহ্য।

নতমস্তকে যযাতির সামনে এসে দাঁড়াল অনু। অনু শর্মিষ্ঠার দ্বিতীয় পুত্র। নির্বাক সে। পুত্রকে নির্বাক দেখে জরাগ্রস্ত যযাতি জীর্ণ কণ্ঠে বলল, অন্য তিন ভাইয়ের মতো নিশ্চয়ই তোমারও একই অভিমত। তোমার কাছে নিশ্চয়ই তোমার যৌবনই বড়, পিতা কিছু নয়?'

অনু নিরুত্তর। যযাতি মর্মাহত কণ্ঠে বলল, 'ঠিক আছে অনু। মৌনতা সম্মতির লক্ষণ—এ কথা শাস্ত্রকাররা বলে গেছেন। কিন্তু মৌনতা যে সর্বদা সম্মতির লক্ষণ নয়, তা তোমার মুখাবয়ব দেখে বোঝা যাচ্ছে। তুমি সরে যাও আমার সম্মুখভাগ থেকে। তোমাদের জন্ম বৃথা, আমার পিতৃত্ব বৃথা!' বলতে বলতে আবেগে চোখ বুজে ফেলল যযাতি।

BanglaBook.org

'তোমার ধারণা সঠিক নয় বাবা। তোমার পিতৃত্ব বৃথা হবে কেন? তোমার যৌবনের ফসল আমরা। তুমি আমার পিতৃদেব। আমার সুন্দর শরীর, আকর্ষণীয় যৌবন—সব তোমারই কল্যাণে পেয়েছি আমি। আমার যৌবন তোমাতে অর্পণ করতে আমি রাজি বাবা।' ভিন্ন একটা কণ্ঠ শুনে ত্বরিত চোখ খুলল যযাতি। দেখল—সামনে পুরু দাঁড়ানো। বিস্মিত চোখে তাকিয়ে থাকল যযাতি, মুখে তার কথা নেই।

বাবাকে নির্বাক দেখে পুরু বলল, 'হ্যাঁ বাবা, আমি সম্মত আছি। তোমার জরা গ্রহণ করে এক সহস্র কেন, সহস্র সহস্র বছরের জন্য আমার যৌবন তোমার চরণে অর্পণ করতে আমি খুশিমনে সম্মত আছি, বাবা।'

স্নেহসিক্ত দৃষ্টি যযাতির। অনেকক্ষণ পুত্র পুরুর দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর অন্য চার পুত্রকে অভিশাপ দিল যযাতি। পুরুকে কাছে টেনে নিল। তারপর পুত্রের যৌবন গ্রহণ করল যযাতি, জরা সমর্পণ করল পুরুকে।

এক হাজার বছর যৌবনকে উপভোগ করার পরও যযাতির ভেতর থেকে ভোগ-তৃষ্ণা তিরোহিত হলো না। যযাতি বুঝল, কাম্যবস্তুর উপভোগে কামের উপশম হয় না। পৃথিবীর সমস্ত ধন ও সমস্ত রমণী সম্ভোগ করলেও পরিতৃপ্তি আসে না। পুত্র পুরুকে তার যৌবন ফিরিয়ে দিল যযাতি, রাজপদে অভিষিক্ত করল তাকে। তারপর বাণপ্রস্থ অবলম্বনপূর্বক কঠোর তপস্যায় রত হলো যযাতি।

'তুমি কি রাজার মতো রামগোলামের যৌবন কেড়ে নিতে চাও?' হাসতে হাসতে অঞ্জলি জিজ্ঞেস করে।

পাকা চুলের ভেতর ডান হাতের আঙুল চালাতে চালাতে গুরুচরণ বলে, 'এটা কলি যুগ। সত্য, ত্রেতা আর দ্বাপর যুগে এটা সম্ভব ছিল। কলি যুগে যৌবন-জরা বদলাবদলি করা সম্ভব নয়।'

অঞ্জলি বলে, 'তাহলে তুমি ভাবলে কেন এ রকম?'

'মানুষের মন তো, ভাবতে তো আর পয়সা খরচ হয় না!' একটু থেমে আবার বলল গুরুচরণ। 'এত বছর হয়ে গেল আমার বয়স, তার পরও বেঁচে থাকার, জীবনকে ভোগ করার আশা মরল না। কী আশ্চর্য! তাই না?'

'তুমি আমাদের রামগোলামকে আশীর্বাদ করো। যাতে সে তোমার মতো তেজি হতে পারে, সে যাতে আমাদের সমাজকে না ভোলে। এদের কষ্টের ভাগীদার হয়।' অঞ্জলি আঁচল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বলল।

'তা-ই হবে রামগোলাম। আমার চেয়েও বড় সর্দার হবে সে। দেখে নিয়ো তুমি অঞ্জলি।' স্নেহ ও আকুতি গুরুচরণের কণ্ঠে মিলেমিশে একাকার।

BanglaBook.org

সাত

রামগোলাম কৈশোরে পা দিলে গুরুচরণের পরিবারে আবাসন-সমস্যা প্রকট হয়ে ওঠে। ছেলেকে বিয়ে করানোর পর থেকে গুরুচরণ-অঞ্জলি রান্নাঘরে ঠাঁই নিয়েছিল। শিউ-চাঁপা শুতো শোবার একমাত্র ঘরটিতে। এই ঘরের খাটিয়াটি দেয়ালে ঠেসে রাখা হতো দিনের বেলায়; শুধু দিনের বেলায় কেন, রাতে রান্না এবং খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত। তারপর খাটিয়া বিছানো হতো; চাঁপারাণী এবং শিউচরণ সতর্কতার সঙ্গে দেহ পাতত সেই খাটিয়ায়। এখনো সেই নিয়ম অব্যাহত আছে। দুপুরে বা বিকেলে, গুরুচরণের শরীরটা যখন একটু আইঢাই করে শোয়ার জন্য, সম্ভব হয় না। অঞ্জলি মাঝেমধ্যে বউয়ের বিছানায় একটু জিরিয়ে নেয়, কিন্তু গুরুচরণ তা-ও করে না। বিবাহিত ছেলের বিছানায় শোয়াকে গর্হিত কাজ মনে করে গুরুচরণ। শরীর যেদিন একেবারেই বাধা মানে না, বারান্দার এক পাশে একটা কাঁথা বিছিয়ে শুয়ে পড়ে।

রামগোলাম যখন একটু মাথা তোলা হলো, শিউচরণ বিছানা ছাড়ল। মা-ছেলে খাটিয়ায় শুতো। খাটিয়ার পাশে একজন মানুষের চিত হয়ে শোয়ার মতো জায়গা। ওখানেই চাটাই পেতে কোনোরকমে রাত কাবার করত শিউচরণ। কোনো কোনো রাতে মনটা একেবারে পাগলপারা হয়ে উঠত, হাত বাড়ালেই চাঁপারানীকে ছোঁয়া যায়, কিন্তু পাওয়া যায় না। চাঁপারানীর ডান হাতটা নিজের দিকে টেনে নিত শিউচরণ, আঙুলের ভাষা দিয়ে চাঁপারানীকে বুঝিয়ে দিত—আজ আমার দেহটা বড় আকুলিবিকুলি করছে চাঁপা, তুমি একটা কিছু করো। আঙুল দিয়ে কোমল পরশ বুলাত চাঁপা শিউর হাতে। হাতের ভাষায় সে এই আকুতি প্রকাশ করত—আমি কী করতে পারি বলো! তুমি যেমন আমাকে চাইছ, আমিও তো তোমাকে চাইছি। কিন্তু কী করে সম্ভব? রামগোলাম বড় হয়ে উঠছে, ধীরে ধীরে সব বুঝতে শিখছে। সে জেগে আছে না ঘুমিয়ে পড়েছে—বুঝতে পারছি না। কী করে আমি তোমার ডাকে সাড়া দিই বলো।

আস্তে করে শিউচরণ হাত ছাড়িয়ে নেয়। দীর্ঘশ্বাসের আওয়াজ চাঁপারানীর

BanglaBook.org

কানে পৌঁছে। ঈশ্বরের ওপর তার খুব রাগ হয় এ সময়। ছোট জাতে পাঠিয়েছ প্রভু, তা-ও মেনে নিলাম। তাই বলে কি আমাদের দুটো শোবার ঘর থাকতে নেই? গরিব করেছ তা-ও ঠিক আছে প্রভু, স্বামীতে-স্ত্রীতে একসঙ্গে রাত কাটাবার জায়গাটুকু পর্যন্ত দিলে না!

যে রাতে দুজনে দুজনকে পাওয়ার জন্য মাতাল হয়ে ওঠে, বারান্দায় বেরিয়ে আসে। বারান্দার দক্ষিণ কোণে চেয়ার ভাঙা, সাইকেলের নষ্ট টায়ার, ছেদা প্লাসটিকের বালতি-গামলা, ভাঙা বেতের দোলনা জড়ো করে রাখা। ওইগুলোকে একটু সরিয়ে-নড়িয়ে মা-বাপের চোখের আড়ালে একটি কোটরের মতো করেছে শিউচরণ। ওই কোটরেই ঢুকে পড়ে। দুজনে।

রামগোলাম যখন ফাইভ পাস করে মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলে ভর্তি হলো, তখন চাঁপারানী বেঁকে বসল—রামগোলামকে আলাদা ঘর দিতে হবে, পড়াশোনার সুবিধা করে দিতে হবে। এসব দাবির মুখে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকত শিউচরণ।

'তুমি কিছু বলছ না যে?' চাঁপার কণ্ঠে মৃদু উষ্মা।

'আমি কী করব বলো। ভেতর-বাহির সব তোমার জানা। তুমি যদি এখন আমাকে একটা শাড়ি এনে দিতে বলো, পারব। যদি বলো একটা নতুন খাটিয়া এনে দিতে, তা-ও পারব। যদি বলো আমি এখনই শূকরের মাংস খেতে চাই, যেকোনো দামে জোগাড় করব। কিন্তু ঘর? ঘর আমি কোথা থেকে জোগাড় করব চাঁপা?' দুর্মর বেদনা শিউচরণের কণ্ঠে।

চাঁপারানী সে বেলা চুপ মেরে যায়। কিন্তু দিন দশেক পরে উভয়ের মধ্যে কথা-কাটাকাটি তুঙ্গে ওঠে। প্রসঙ্গ একটাই—যে করেই হোক, রামগোলামের আলাদা শোবার ঘরের ব্যবস্থা করতে হবে। এবারও শিউচরণ কী একটা খোঁড়া যুক্তি খাড়া করাতে চাইল চাঁপারানীর সামনে। চাঁপারানী এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিল শিউচরণের যুক্তি। চাঁপারানীর উষ্মামিশ্রিত উচ্চকণ্ঠের নিচে শিউচরণের হতাশ কণ্ঠ চাপা পড়ে গেল। ওপাশের ঘর থেকে গুরুচরণ বউয়ের কথা শুনল—'আমাকে আর কোনো যুক্তি দেখাবে না। মাথা তোলা ছেলে নিয়ে শুয়োরের জীবন কাটাতে পারব না একঘরে। তোমার লজ্জা না থাকতে পারে, আমার আছে। কালকে যেভাবেই হোক, রামগোলামের জন্য আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করবে, ব্যস। এই আমার শেষ কথা।'

শিউচরণ মিউমিউ করে কী যেন বলল। কথাগুলো গুরুচরণ ভালো করে শুনতে পেল না।

খুব ভোরে চাঁপারানী বিছানা ছাড়ে। আলু ভাজে বা একটা সবজি রাঁধে।

BanglaBook.org

তারপর রুটি তৈরিতে বসে। মোটা সেঁকা রুটি। প্রত্যেকের জন্য দুটো করে মোট দশটি রুটি সেঁকতে সেঁকতে অঞ্জলি পাশে এসে বসে। সকালের রুটি সেঁকা বা সবজি রাঁধার কাজটি বারান্দায় করে চাঁপারানী। কেরোসিনের স্টোভে রান্না-সেঁকার কাজ শেষ করে আনতে না-আনতে গুরুচরণ, শিউচরণও এসে যায় চুলার পাশে। রুটি-সবজি খেয়ে করপোরেশনের উদ্দেশে রওনা দেয়। মেয়েদের একটু পরে গেলে চলে। স্নান সেরে, নিজেদেরটা খেয়ে, রামগোলামের রুটি-সবজি ঢেকেঢুকে বউ-শাশুড়ি রওনা দেয় কাজের উদ্দেশে। রামগোলাম একটু দেরিতে ওঠে।

আজ গুরুচরণ রুটি-সবজি খেল, কিন্তু কাজে গেল না। অঞ্জলির জিজ্ঞাসার উত্তরে বলল, 'আজ কাজে যেতে ইচ্ছে করছে না। যাব না। তোমরা যাও।'

'মানে? জমাদারবাবু বকবে না?' অঞ্জলি জিজ্ঞেস করে।

'বকলে একটা জবাব দিয়ে দেব। আমার জন্য কাজ আটকে থাকবে না। তোমরা যাও। রামগোলামের স্কুলে যাওয়া দেরি আছে। তাকে নিয়ে সময় কেটে যাবে আমার।' গুরুচরণ বলল।

ওরা চলে গেলে গামছা কোমরে বেঁধে কাজে হাত দিল গুরুচরণ। দক্ষিণ দিকের বারান্দায় জমানো ভাঙাচোরা জিনিসপত্র টেনে-ছেঁচড়ে উত্তর দিকে নিয়ে এল। নিচে গিয়ে শ্যামলালকে ডেকে আনল। মদ খেয়ে বড়বাবুকে 'বেহেনচোদ শালা' বলার অপরাধে চাকরি গেছে শ্যামলালের। তাকে নিয়ে সেই বারান্দার ডানে-বাঁয়ে মাপজোক করল। ব্রিজঘাটে গিয়ে পাতিবাঁশ নিয়ে এল। তার নিয়ে এল জসিমের দোকান থেকে। তারপর বাঁশে এবং তারে দুজনে হাত লাগাল। রামগোলাম স্কুলে রওনা দেয়ার আগে জিজ্ঞেস করল, 'দাদা কী করছ?'

গুরুচরণ হাসতে হাসতে উত্তর দিল, 'রাজমহল তৈয়ার করছি রামচন্দ্রের জন্য।'

রামগোলাম কিছুই বুঝল না। একটু থমকে দাঁড়িয়ে কী যেন ভাবল, তারপর স্কুলের উদ্দেশে রওনা দিল।

দুপুরে সবাই ফিরে দেখল, দক্ষিণের বারান্দায় একটা ঘর তৈরি হয়ে গেছে। ফিরিঙ্গিবাজার মেথরপট্টির সর্দারজি বিল্ডিংয়ের তৃতীয় তলার চাঁদ নম্বর ঘরের সামনের বারান্দায় এই ছোট্ট কামরাটি অন্যজনের জন্য কিছুই না, কিন্তু বেড়া-প্লাস্টিক আর পুরোনো পত্রিকায় তৈরি এ ঘরটি গুরুচরণের পরিবারে বিপুল আনন্দের সঞ্চার করল। চাঁপারানী লজ্জা লজ্জা মুখ নিয়ে একবার ঘরটির দিকে, আবার শ্বশুরের দিকে তাকাতে লাগল। তার অন্তরে পরম তৃপ্তির ঢেউ। শিউচরণ হতভম্ব হয়ে ঘরটির দিকে তাকিয়েই থাকল। ভাবল—রাতে চাঁপারানীর কথাগুলো

BanglaBook.org

নিশ্চয়ই বাপজি শুনতে পেয়েছে। তাই চাকরিতে না গিয়ে ঘরটি তুলেছে বাপ। আফসোস হলো—চাঁপারানী তো অনেক দিন ধরে আলাদা ঘরের দাবি জানিয়ে আসছিল। বোকা হাঁদারাম আমি! আমার মাথায় বাপের এই বুদ্ধিটা খেলল না কেন? বাপের এই কাজটি যদি আমি করতাম, তাহলে চাঁপা কী খুশিই না হতো! বিয়ের পর থেকে চাঁপা বিশ্বাস করে এসেছে যে সর্দারজির সামান্য বুদ্ধিও আমার ঘটে নেই। বাপের অর্ধেক গুণও যদি আমি পেতাম, তাহলে সমাজের মানুষ আরও শ্রদ্ধার চোখে দেখত আমাকে। নিজেকে গুণী এবং করিৎকর্মা হিসেবে প্রমাণ করার একটা সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেল। আবার আনন্দে মন ভরে গেল এই ভেবে যে এত বড় বুদ্ধির কাজটি আমার বাপই তো করেছে। হরিজনপল্লির কারও দুটোর ওপর তিনটি ঘর নেই। সবার ঘরের সামনে দিয়ে টানা বারান্দা, সেখানে মানুষের নিত্য হাঁটাহাঁটি। বাপ সর্দারজি বলে ওই সময়ে দক্ষিণের ঘরটি পেয়েছিল। বারান্দার এ অংশটি এত দিন অকেজো অবস্থায় পড়ে ছিল। আজ বাপ সেই ভাঙাচোরা জিনিসে ভরা দক্ষিণের বারান্দাটিকে একটি সুন্দর ঘরে পরিণত করেছে। চাঁপারানীর চাপা ক্ষোভ এবার কমবে।

রামগোলাম স্কুল থেকে ফিরে ধেই ধেই করে নাচতে নাচতে ঘরটিতে ঢুকে গেল। দক্ষিণের ছোট্ট খুপড়িতে মাথা গলিয়ে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল, 'দাদু, এ ঘর কার জন্য? তুমি আর দাদি থাকবে বুঝি এ ঘরে? কী মজা হবে।'

গুরুচরণ ঘরে ঢুকে রামগোলামের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলেছিল, 'নারে পাগলা, দাদির জন্য নয়, তোমার জন্যই এই ঘর বানিয়েছি। আজ থেকে এই ঘরে তুমি থাকবে। পড়বে, শোবে।'

শুধু অঞ্জলি কিছু বলল না। ঘরটির সামনে স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। মুখে প্রশংসা আর আনন্দের কারিকুরি। স্বামীর জন্য নিবিড় প্রশংসা তার অজস্র বলিরেখাময় মুখে ঝিলিক দিচ্ছে।

রাতে পাশে শুয়ে অঞ্জলি জিজ্ঞেস করল, 'আজ তাহলে তুমি এই জন্যই কাজে যাওনি সর্দারজি?'

'তুমি কাল রাতে নাক ডেকে ঘুমাচ্ছিলে। অর্ধেক রাতে রামগোলামের মায়ের আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল আমার। সব কথা বুঝতে পারলাম না। শুধু শিউর বউয়ের একটি কথা আমার কানে ধাক্কা মারল—তোমার লজ্জা না থাকতে পারে, আমার আছে। কালকে যেভাবেই হোক, রামগোলামের জন্য আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করবে।' গুরুচরণ বলল।

'কালকে খুব খাটুনি গেছে শরীরের ওপর দিয়ে। বেশি ঘুম পেয়েছিল আমার। শুনতে পাইনি আমি বউয়ের কথা।' অঞ্জলি বলল।

BanglaBook.org

গুরুচরণ বলল, 'ঘুম ঘুম চোখ ছিল আমারও। রামগোলামের মায়ের কথায় ঘুম ভেঙে গেল। ওর গলায় হতাশা ছিল। সবচেয়ে বেশি ছিল লজ্জা।'

'কী জীবন আমাদের! কুকুর-শেয়ালের জীবন।' বেদনা মেশানো কণ্ঠ অঞ্জলির।

অঞ্জলির কথা যেন কানে ঢোকেনি গুরুচরণের। আপনমনে বলতে লাগল, 'চার পল্লির সর্দার আমি। সবাই শ্রদ্ধা করে আমাকে। মনে করে, আমার অনেক ক্ষমতা। কিন্তু আমি যে ঠুঁটো জগন্নাথ। ছেলে আর ছেলের বউকে নিজেদের মতো করে রাতে শোবার জায়গাটি পর্যন্ত দিতে পারি না। বউ দাবি জানাচ্ছিল শিউর কাছে—রামগোলামের জন্য আলাদা ঘর চাই। ছেলের সামনে আর নির্লজ্জ হতে পারবে না সে।'

'হায় রে, ঈশ্বর!' অঞ্জলির বুক চিরে বড় একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

গুরুচরণ বলল, 'ঈশ্বরকে আর দোষ দিয়ে লাভ কি? ছোট জাতে জন্মেছি। আগের জীবনের কর্মফলের সাজা তো আমাদের পেতে হবে। মাত্র দুটো ঘরই তো আমাদের জন্য নির্ধারিত।' বলেই হা হা হা করে হেসে উঠল। গুরুচরণের গম্ভীর কণ্ঠের উচ্চহাস্য রান্নাঘর ছাপিয়ে শিউচরণের ঘর পেরিয়ে হরিজনপল্লিতে ছড়িয়ে পড়ল সেই নিবিড়-নির্জন রাতে। অঞ্জলি তাড়াতাড়ি বলল, 'আহা! পাগলের মতো হাসছ কেন? ছেলে আর বউ শুনতে পেলে কী ভাববে?'

'হাসছি কি এমনে এমনে। বাবাঠাকুরের কথা মনে পড়ে গেল, তাই হাসলাম।'

'কী কথা মনে পড়ল তোমার?'

'মনু নামে নাকি এক ঋষি ছিল পুরানাকালে। একটা বই লিখে গেছে নাকি সেই ঋষি। কী সংহিতা যেন, ও মনে পড়েছে *মনুসংহিতা*। উঁচু বর্ণের মানুষের জীবনটিবন নিয়ে নাকি অনেক কথা বলে গেছে সে ওই বইতে। আর লিখেছে আমাদের কথা।' গুরুচরণ বলল।

'আমাদের কথাও লিখেছে সেই মুনি?'

'হ্যাঁ লিখেছে। তবে পোন্দে বাঁশ ঢুকিয়ে দেয়ার কথা।' ব্যঙ্গ মেশানো কণ্ঠে বলল গুরুচরণ।

অঞ্জলি তাড়াতাড়ি বলল, 'আহা! তুমি অসভ্যতা করছ শিউচরণের বাপ। মুনিঋষিদের সম্বন্ধে ও রকম করে বলতে নেই।'

'আসল কথা শুনলে তোমার ভক্তি-শ্রদ্ধা সব উবে যাবে কর্পূরের মতো। এই ঋষি আমাদের কী ক্ষতি করে গেছে, শুনবে?' গুরুচরণের গলায় রাগের ঝাঁজ।

'কী ক্ষতি করেছে?' অঞ্জলি জিজ্ঞেস করে।

BanglaBook.org

'মনু তার বইতে লিখে গেছে—আমাদের মতো ছোট জাতদের শহরে বা ভদ্রমানুষদের কাছাকাছি বাস করার অধিকার নাই। আমরা নাকি থাকব শহর বা গ্রামের বাইরে। গাছের তলা, শ্মশান, পাহাড় বা বন নাকি আমাদের বাস করার উপযুক্ত স্থান।' গুরুচরণ বলে।

'কিন্তু এখন তো আমরা শহরে থাকছি।' যুক্তি দাঁড় করায় অঞ্জলি। গুরুচরণ হতাশ গলায় বলে, 'পাগলি! শহরে, কিন্তু শহরের কোথায়? শহরের এক কোনায়, নদীর কাদা-প্যাঁকে ভরা পাড়ে।'

'ঠিক তো, এভাবে তো ভাবিনি কোনো দিন।' অঞ্জলি বলে।

গুরুচরণ আগের কথায় ফিরে যায়। বলে, 'ওই মনু আরও তাজ্জব কথা লিখে গেছে। বাবাঠাকুর বলেছে, ওই মনু নাকি লিখেছে, ব্রাহ্মণের ঘর থাকবে পাঁচটা, ক্ষত্রিয়দের ঘর হবে চারটা। বৈশ্যরা তিনটা ঘর বাঁধতে পারবে। কিন্তু শূদ্রদের ঘরের সংখ্যা হবে দুইটা, ইচ্ছে করলে বা সামর্থ্য থাকলেও দুইটার বেশি ঘরের মালিক আমরা নাকি হতে পারব না।'

'কী আশ্চর্য!' অঞ্জলি বলে ওঠে।

'আমাদের করপোরেশনের বড় বড় সাহেব সবাই মুসলমান। হিন্দুধর্মের প্রায় কোনো কিছুই মুসলমানরা মানে না। মনুঋষির এই বাজে কথাগুলো মুসলমানদের মানার কথা নয়। তুমি ঠিকই বলেছ, কী আশ্চর্য, আমাদের ঘর বানানোর সময় তারা কিন্তু মনুর নির্দেশ মাথা পেতে মেনে নিয়েছে। মনুর লিখে যাওয়া নিয়ম মেনে করপোরেশনের বড়কর্তারা আমাদের প্রত্যেক পরিবারের জন্য দুটি করে ঘরই বরাদ্দ করেছে। একটি রান্নাঘর, আরেকটি শোবার ঘর।' কষ্টে গুরুচরণের কণ্ঠ বুজে আসে। অঞ্জলি চুপচাপ। গুরুচরণ অপেক্ষা করে অঞ্জলির কথার জন্য। কিন্তু অঞ্জলি কথা বলে না। গুরুচরণ অঞ্জলির বড় বড় নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পায় শুধু। একসময় গুরুচরণ জিজ্ঞেস করে, 'ঘুমিয়ে পড়লে নাকি শিউর মা?'

'না, ঘুমিয়ে পড়িনি। ভাবছি।'

'কী ভাবছ?'

'ভাবছি আমাদের দুর্ভাগ্য নিয়ে।'

গুরুচরণ বলে, 'তুমি জিজ্ঞাসা করছিলে না—ঘরটি বানানোর জন্যই আজকে আমি চাকরিতে যাইনি কি না? হ্যাঁ, ওই জন্যই আমি আজ কাজ করতে যাইনি। রামগোলামের মায়ের কথা শুনে কালকে গভীর রাত পর্যন্ত ঘুমাতে পারিনি। আমরা না-হয় বুড়া হয়ে গেছি। কিন্তু শিউদের তো যৌবন আছে। তারা কেন বঞ্চিত হবে? ভাবতে ভাবতে হঠাৎ দক্ষিণ দিকের বারান্দাটির কথা মনে পড়ে

BanglaBook.org

গেল। তারপর কী করেছি, তা তো দেখলে।'

'তো, আমাকে তো তুমি বলতে পারতে! আমিও চাকরিতে যেতাম না। তোমার সঙ্গে হাত লাগাতাম।' অঞ্জলি বলে।

'তাহলে আজ দুপুরের আনন্দটুকু পেতাম না। তোমরা সবাই তো অবাক হয়েছ? খুশিও হয়েছ সবাই। তোমাদের অবাক চোখ-মুখ দেখে আমি খুব আনন্দ পেয়েছি। সবচেয়ে বেশি কে খুশি হয়েছে জানো?'

'কে?' অঞ্জলির মুখে চাপা হাসি। ঘন অন্ধকারে সে হাসি চাপা পড়ে থাকে। গুরুচরণ বুঝতে পারে না সে হাসির মাহাত্ম্য।

গুরুচরণ বলে, 'সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছে রামগোলামের মা, আমাদের শিউর বউ।'

'কেন?' এ প্রশ্নটি করবে করবে করেও করল না অঞ্জলি। এর উত্তর গুরুচরণ যেমন জানে, অঞ্জলিরও তা অজানা নয়। আহা বেচারি! আজ নিশ্চয়ই ছেলের বউটি আনন্দে রাত কাটাচ্ছে।

কখন আকাশে শুকতারা ভেসে উঠল, কখন ভোরের স্নিগ্ধ সমীরণ বইতে শুরু করল—অন্ধকার কোটরিতে শুয়ে থাকা এই প্রাচীন দম্পতি টের পেল না সে রাতে। শুধু শুনতে পেল ফজরের আজানের সুমধুর ধ্বনি—

আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার
আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার।
আশ্‌হাদু আঁল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ
আশ্‌হাদু আঁল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।
আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ
আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ।

আট

BanglaBook.org

শৈশব-কৈশোর পেরিয়ে রামগোলাম আজ তরুণ। এসএসসি পাস করার পর তার আর পড়া হলো না। গুরুচরণ ভাবল, আর পড়ার দরকার নেই, যথেষ্ট

হয়েছে। বিদ্যার পরিমাণে চাকরি পাবে না রামগোলাম। যতই পাস দিক, চাকরি তো একটাই—গু-মুত আর আবর্জনা সাফাই করা। ভদ্রলোকদের অফিসে চাকরি চাইতে গেলে রামগোলামকে চাকরি দেবে না। সে যে অস্পৃশ্য; ঘৃণার। মেথর-সন্তান হিসেবে পরিচয় পেয়ে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবে। বেশি বিদ্যা রামগোলামের জীবনে তখন কাল হয়ে দেখা দেবে। তখন রামগোলাম না পাবে অফিসে কোনো চাকরি, না করতে পারবে আবর্জনা-ময়লা টানার কাজ। তখন ওর জীবন কষ্টে ভরে যাবে। দরকার নেই আমাদের রামগোলামের জীবন কষ্টে ভরে যাওয়ার। আর বেশি পড়ারও দরকার নেই। তার চেয়ে জমাদার আর বড়বাবুকে বলে রামগোলামের একটা চাকরির ব্যবস্থা করতে পারলে অনেক ভালো হবে। আর বেশি দিন নেই গুরুচরণের চাকরি খতম হওয়ার। এর মধ্যে যে করেই হোক, রামগোলামের চাকরিটা জোগাড় করে দিতে হবে। কিন্তু কীভাবে সম্ভব, গুরুচরণ ভেবে কূলকিনারা পায় না। আগে চাকরি পাওয়া খুব সহজ ছিল। পাকিস্তানি আমলে আজ চাকরি চাইলে তো আজকেই চাকরি পাওয়া যেত। স্বাধীনতার প্রথম দিকে বড় সাহেবের পেছনে দু-চার দিন ঘুরলে, জমাদারের পকেটে দু-চার শ টাকা গুঁজে দিলে চাকরি মিলত। কিন্তু যত দিন যেতে লাগল, চাকরি পাওয়ার সংকট তত বাড়তে লাগল। প্রথম প্রথম মিথ্যা পরিচয় দিয়ে জলদাস-নাপিত-ধোপারা রাস্তার আবর্জনা সাফাইয়ের কাজ নিতে শুরু করল। তবে সেটা খুব বিপুল হারে নয় এবং তা করা হতো অতি গোপনে। শহরের অধিকাংশ ঘরে স্যানিটারি টাট্টিখানা চালু হয়ে গেলে এই কাজে প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা বেড়ে গেল। টাট্টিকে মানুষ বড় ঘৃণা করে। তাই খোলা পায়খানা থেকে যারা টাট্টি টানত, তাদেরও ঘৃণা করত ভদ্র-শিক্ষিতজনরা। শহরের অধিকাংশ জায়গায় টাট্টি টানা বন্ধ হয়ে গেছে। তাই এই কাজের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষ। বাংলাদেশের হতদরিদ্র মানুষরা চট্টগ্রাম শহরে এসে জমা হতে থাকে। বেঁচে থাকার জন্য, একটুখানি ঠাঁইয়ের জন্য যেকোনো চাকরি করতে তারা রাজি। তাই করপোরেশনের হর্তাকর্তাদের ওপর চাপ বাড়ে। করপোরেশনের সাফাইয়ের কাজ পাওয়ার অধিকার শুধু মেথরদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। বড়বাবু থেকে স্থানীয় রাজনীতিবিদ পর্যন্ত এ দাবি প্রসারিত হয়। জনগণের ভোটে নির্বাচিত কমিশনার, চেয়ারম্যানরা নীতিনির্ধারকদের কাছে এই দাবির যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। বারবার দাবির মুখে করপোরেশনের নীতিনির্ধারকরা ঠিক করে—করপোরেশনের ময়লা-আবর্জনা সাফাইয়ের কাজ সব ধর্মের মানুষের জন্য উন্মুক্ত করা হবে। মেথররা এমনিতেই সমাজের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন-বিপন্ন মানুষ। এই সিদ্ধান্ত তাদের

BanglaBook.org

অসহায়তার শেষ সীমায় পৌঁছে দেবে। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তারা জোটবদ্ধ হলো। চট্টগ্রামের চারটি মেথরপট্টির মানুষ মুষ্টিবদ্ধ হাত ওপরের দিকে তুলে ধরে উচ্চকণ্ঠে বলল—'আমরা এই কালাকানুন মানি না। এই চাকরি করার জন্য আমাদের পূর্বপুরুষদের আনা হয়েছিল এই দেশে। গু-মুত টেনে টেনে, নোংরা জায়গায় বসবাস করে করে ওরা জীবন কাবার করেছে। কই, তখন তো দেশের কোনো মানুষ এই চাকরি করতে চায়নি। আমরাই ঘৃণা সয়ে সয়ে, কষ্ট বুকে চেপে চেপে এই কাজ করে গেছি। আজ কেন অন্য জাতের মানুষ আমাদের চাকরি নিয়ে টানাটানি করবে? আর করপোরেশনের বড়বাবুই বা কেমন? যুগ যুগ ধরে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে করপোরেশনকে আমরা বাঁচিয়ে রেখেছি, আজ সেই করপোরেশন আমাদের পেটে লাথি মারবে? তা হতে দেবো না। কিছুতেই আমাদের চাকরিতে ভাগ বসাতে দেবো না।'

কিন্তু বিশৃঙ্খল উত্তেজনা কোনো সুফল বয়ে আনবে না। আগের মতো হরিজনদের সকল আন্দোলন বিফলে যাবে। বাবাঠাকুর বলে দিয়েছে—মাথা ঠান্ডা রেখে এগোতে হবে। বড় সাহেবকে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হবে, এ চাকরি শুধু তাদের জন্য, অন্যরা এই কাজে ভাগ বসালে তারা স্রেফ পথের ভিখারি হবে। তা-ই করবে গুরুচরণ—ঠান্ডা মাথায় বড়বাবু আবদুস ছালামের সঙ্গে দেখা করবে। প্রয়োজন হলে তার পায়ে লুটিয়ে পড়বে। জুতায় কপাল ঘষতে ঘষতে বলবে—আমাদের অধিকার কেড়ে নিয়ো না বড়বাবু। নিজের সমাজের মানুষের জন্য এগুলো করতে তার শরম করবে না। কিন্তু বড় সাহেব কি শেষ পর্যন্ত তার কথা শুনবে? ছালাম সাহেব উচ্চশিক্ষিত; বর্তমানের জমাদার হারাধনবাবু বড় ধুরন্ধর। তাদের যুক্তির সামনে, ধুরন্ধরতার সামনে সে কি দাঁড়াতে পারবে? বয়স হয়ে গেছে তার। স্মৃতিশক্তিও সর্বদা সঠিকভাবে কাজ করে না। যদি বেফাঁস কিছু বলে ফেলি, যদি তাদের কুযুক্তির সামনে ন্যায্য যুক্তি তুলে ধরতে না পারি, তাহলে তো সবকিছু ভেস্তে যাবে। এ ব্যাপারে কার্তিকের সঙ্গে কথা বলা দরকার। কার্তিকের মাথা গরম, কিন্তু হরিজনদের স্বার্থরক্ষার জন্য সে জান দিতে প্রস্তুত। ছালাম সাহেবের সঙ্গে দেখা করার আগে এক বিকেলে গুরুচরণ ডাকিয়ে আনাল কার্তিককে। নাটমন্দিরের এক কোনায় বসল দুজনে।

'বল জ্যাঠা, কী জন্য ডেকেছ আমাকে?' গুরুচরণের চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করে কার্তিক।

পড়ন্ত বিকেল। চারদিকে ম্লান হলদে আলো। জ্যৈষ্ঠ মাস। গোটা দিন খররোদ ছড়িয়ে সূর্য যেন আলোশূন্য হয়ে পড়েছে। ক্লান্তও যেন সূর্যদেব। কোনোরকমে ঘরে যেতে পারলে বাঁচে। তাপদগ্ধ বাংলাদেশ যেন এই বেলা বড়

BanglaBook.org

বড় শ্বাস নিচ্ছে। এই নদীপাড়, নদীপাড়ের লোকালয়, পিচঢালা রাস্তা, উঁচু-নিচু চট্টগ্রামের নানা অলিগলি গরমে হাঁসফাঁস করছে। কর্ণফুলীর পাড়ের এই মেথরপট্টিও জ্যৈষ্ঠের খরতাপে বিপর্যস্ত। সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়ায় বিল্ডিংয়ের ছায়া এসে পড়েছে নাটমন্দিরে। মেথরপট্টির অন্যান্য অংশের তুলনায় নাটমন্দিরটি ছায়াশীতল। দেয়াল ঘেঁষে যে বড় আমগাছটি আছে, তার মাথায় অসংখ্য কাক ভিড় করছে। সমস্ত দিন শহরের ডাস্টবিনে ডাস্টবিনে উড়ে-ঘুরে খাবার জোগাড় করেছে তারা। মনোহরখালীর ফিশারিঘাটে দল বেঁধে পচা মাছ ও মাছের নাড়িভুঁড়ি খেয়েছে, নদীপাড়ে মরা গরু ঠোকরেছে, রেয়াজউদ্দিন বাজারের কসাইখানার ওপর ঘুরে ঘুরে টুকরাটাকরা মাংসের ওপর ছোঁ মেরেছে, ঠোঁট ডুবিয়ে নালার রক্ত খেয়েছে। নাদান কাকগুলো কচি বাচ্চার হাত থেকে বিস্কুট কেড়ে নিয়েছে। দিন শেষে ওই কাকগুলোর কেউ কেউ ফিরিঙ্গিবাজার মেথরপট্টির এই বড় আমগাছটিতে আশ্রয় নিয়েছে। কত কথা তাদের মধ্যে! মায়ে-ছেলে কথা হচ্ছে, স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া হচ্ছে, শ্বশুর-শাশুড়ি সেই ঝগড়া থামাতে চেষ্টা করছে, তরুণ-তরুণীরা ঝাঁকড়া গাছের মগডালে বসে চুপে চুপে হৃদয় বিনিময় করছে, ছোটরা এডালে-ওডালে লুকোচুরি খেলছে আর সমানে চিৎকার করছে। গুরুচরণ ওই কাকদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমগাছের ওই কাকগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখ কার্তিক।'

কার্তিক অবাক হয়ে একবার কাকদের দিকে, আরেকবার গুরুচরণের দিকে তাকায়। বলে, 'কাকদের দিকে তাকাতে বলছ কেন? ওদের দিকে তাকিয়ে কী হবে? কেন ডেকেছ তাই বলো।'

'কাকদের জীবন আর আমাদের জীবন সমান।' কাকদের ওপর চোখ রেখে গুরুচরণ বলল।

'মানে? তোমার কথা বুঝতে পারছি না জ্যাঠা। খোলাসা করে বলো।' গুরুচরণ গামছা দিয়ে মুখ ও ঘাড়ের ঘাম মুছে নেয়। কাকদের ওপর থেকে কার্তিকের দিকে মুখ ফেরায়। তারপর ধীরে ধীরে বলে, 'সকালবেলা এই কাকগুলি উড়াল দেয়। উড়ে উড়ে খাবার খোঁজে। ওরা খায় কী? আবর্জনা, ময়লা, মরা চিকার পেট ঠোকরায় এরা, মরা গরু-ছাগলের নাড়িভুঁড়ি খায়। খেতে খেতে দিন শেষ হয়। আঁধার লাগতে লাগতে ফিরে আসে। ফিরে এসে আশ্রয় নেয় কোথায়?'

কার্তিক জিজ্ঞেস করে, 'কোথায়?'

গুরুচরণ বলে, 'কোথায় আবার। এই রকম বড় বড় গাছের ডালে। চট্টগ্রাম শহরে এখনো বড় গাছের অভাব নেই। দিনশেষে ওই সব গাছের ডালে ডালে

BanglaBook.org

আশ্রয় নেয় আর ঝগড়া করে।'

কার্তিক ভাবে—কাকের জীবনকাহিনি শোনানোর জন্য কি সর্দারজি এই ভ্যাপসা গরমের পড়ন্ত বিকেলে তাকে ডেকে পাঠিয়েছে? মনে হয় না। সর্দারের এত সময় কোথায় যে এ রকম হালকা গল্পগুজবে সময় অপচয় করবে? কাকদের নিয়ে এসব কথাবার্তার মধ্যে নিশ্চয়ই একটা বিশেষ কিছু লুকিয়ে আছে। এই ভেবে কার্তিক বিরক্ত হয় না। ধৈর্য ধরে সর্দারের আসল কথার জন্য অপেক্ষা করে।

কার্তিক তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছে কি না, সেদিকে খেয়াল নেই গুরুচরণের। যেন নিজের সঙ্গে কথা বলছে, এমনি স্বরে আবার বলতে শুরু করে, 'আমরা আর কাকরা সমান। সকাল হবার সাথে সাথে ওরা ময়লা-আবর্জনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর সকাল হলে আমরা কী করি? কাঁটা, টুকরি, বেলচা-কোদাল নিয়ে এই আবর্জনা সাফাইয়ে লেগে যাই। রাস্তার পাশে পড়ে থাকা গু খায় কাকরা। আর আমরা সেই গু মাথায়-কাঁধে করে ছিপাতলির কুয়ার দিকে রওনা দিই। কাকদের সাথে আমাদের পার্থক্য আছে কি কোনো?'

কার্তিকের মুখ দিয়ে কথা বের হয় না। সর্দারের মতো করে ভাবেনি তো কোনো দিন সে। সর্দারের ভাবনা সত্যি। কাকরা আবর্জনা খেয়ে খেয়ে শহর পরিষ্কার রাখে আর মেথররা ময়লা-আবর্জনা মাথায়-কাঁধে বয়ে বয়ে শহরের রাস্তাঘাট, গলি-উপগলি, পাড়া-মহল্লা সাফ রাখে। তাহলে তো কাক আর মেথরদের মধ্যে তেমন কোনো তফাৎ নেই। ময়লা-আবর্জনার ব্যাপারটি ছাড়া আর কোনো কি মিল আছে ওদের সাথে কাকদের?

'আছে। আরেকটা ব্যাপারে মিল আছে।' সর্দার যেন কার্তিকের মনের কথা শুনতে পেল।

'কী মিল জ্যাঠা?' কার্তিকের মুখ দিয়ে প্রশ্নটি বেরিয়ে এল।

'কাকদের কোনো ঘর নাই। বাসা বানাতে জানে না তারা। তাই ডালে ডালে ঘুরে বেড়ায়। আমাদেরও কি ঘর আছে? এক পরিবারে আমরা অনেক মানুষ। শোবার ঘর একটা। কাকদের মতো আমরাও একরকম বাস্তুহারা।' গুরুচরণ বলে।

কার্তিক বলে, 'তুমি ঠিক বলেছ জ্যাঠা। এই রকম আমি ভাবিনি কোনো দিন। তাইলে এক অর্থে আমরা কাউয়ার জাত!'

গুরুচরণ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, 'এত দিন তাই ছিলাম। কাউয়ার সমান আমরা ছিলাম। এখন কাউয়ার চেয়েও এক ধাপ নিচে নেমে যাচ্ছি আমরা।'

'সে কেমন?' কার্তিক জিজ্ঞেস করে।

BanglaBook.org

'কাকরা স্বাধীনভাবে খাবার জোগাড় করতে পারে। আমাদের খাবার জোগাড়ের পথ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। করপোরেশনের বড়বাবু আমাদের মুখের খাবার কেড়ে নিচ্ছে। আমাদের গোষ্ঠীগত চাকরিতে ভাগ বসাচ্ছে। আমাদের চাকরি কেড়ে নেয়ার ব্যাপারটি পাকাপোক্ত করে ফেলেছে। তাই বলছিলাম, কাউয়াদের খাবার আছে, আমাদের থাকবে না। কাকদের চেয়েও অধম হয়ে পড়লাম আমরা!' গুরুচরণ বলল।

'ছালাম সাহেবের চালাকি সফল হতে দেব না আমরা।' তারপর প্রতিবাদী কণ্ঠ খাদে নামিয়ে বলল, 'তুমি আমাদের পথ দেখাও জ্যাঠা!'

গুরুচরণ বলে, 'ওই জন্যই তোমাকে ডেকেছি আমি। কালকে বড়বাবু ছালাম সাহেবের সঙ্গে দেখা করব আমি। আমি চাই, তুমি আমার সঙ্গে থাকো। তুমি সঙ্গে থাকলে আমি সাহস পাব।'

কার্তিক বলে, 'কী বলছ তুমি জ্যাঠা? তুমি আমাদের হরিজন সম্প্রদায়ের সাহস। তোমার শক্তিতে আমরা শক্তিমান। তুমি ভয় পাচ্ছ কেন জ্যাঠা?'

'দেখ, আমার বয়স হয়ে গেছে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের শক্তি আর মনের জোর কমে এসেছে। স্মরণশক্তিতেও টান পড়েছে। ছালাম কি কথাতে কি কথা পেঁচিয়ে যদি আমাকে রাজি করিয়ে ফেলে! যদি আমি তার প্রস্তাবে হ্যাঁ বলে ফেলি! তাহলে গোটা মেথরজাতির কাছে আমি মীরজাফর হয়ে যাব।' গুরুচরণ বলে।

কার্তিক তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'তা কি তুমি করবে? জান গেলেও তা তুমি করবে না। তোমার কাছে জানের চেয়েও জাতের স্বার্থ বড়।'

গুরুচরণ বলে, 'তা তো সত্যি। কিন্তু যদি আমাকে বুদ্ধির জালে আটকে ফেলে, তাহলে বিপদ।'

'ঠিক আছে জ্যাঠা, আমি তোমার সাথে যাব। কিন্তু করপোরেশনের সাহেবরা শিক্ষিত। বিদ্যার দোহাই দিয়ে আমাদের দাবিয়ে রাখার চেষ্টা চালাবে ওরা। আমি বলি কী?' বলেই কার্তিক গুরুচরণের চোখের দিকে তাকাল।

গুরুচরণ মুখে কিছু বলল না। কিন্তু দুই চোখে জিজ্ঞাসা—কী বলতে চায় কার্তিক। বাঁ হাতের চেটো দিয়ে নাকের মাথাটা ঘষতে ঘষতে কার্তিক বলল, 'রামগোলাম আমাদের সঙ্গে চলুক। পড়ালেখা জানে আমাদের রামগোলাম। ওরা কুযুক্তি দিলে ও তার উচিত জবাব দিতে পারবে। আর আমরা তো আছি।'

গুরুচরণ বেশ কিছুক্ষণ চুপ মেরে থাকল। ডানে-বাঁয়ে, ওপরে-নিচে মাথা নাড়তে নাড়তে বিড়বিড় করে কী যেন বলল। তারপর স্পষ্ট গলায় কার্তিককে উদ্দেশ্য করে বলল, 'ঠিক আছে। রাতে রামগোলামের সঙ্গে কথা বলব। রাজি

BanglaBook.org

করাব তাকে। তুমি কালকে দশটার দিকে করপোরেশনের মাঠে থাকবে। একসঙ্গে বড়বাবুর কাছে যাব।' মা কালীর সামনে দণ্ডবৎ করে কার্তিক মাদারবাড়ি মেথরপট্টির দিকে এগিয়ে গেল। গুরুচরণ পা বাড়াল সর্দারজির বিল্ডিংয়ের দিকে।

প্রায় এগারোটা বাজে। এখনো গুরুচরণ আর কার্তিক এসে পৌঁছায়নি। রামগোলাম করপোরেশনের মেইন বিল্ডিংয়ের সামনে খোলা মতন জায়গাটির দক্ষিণ পাশে দেয়াল ঘেঁষে যে কৃষ্ণচূড়া গাছটি দাঁড়িয়ে আছে, তার ছায়ায় অপেক্ষা করছে অনেকক্ষণ। এই খোলা জায়গাটি আগে অনেক বড় ছিল। মূল বিল্ডিংটার দুদিকে তিনতলার আরও দুটো বিল্ডিং হওয়ায় খোলা জায়গাটি সংকীর্ণ হয়ে গেছে। গুরুচরণের যৌবন বয়সে এ স্থানটি অনেক খোলামেলা ছিল বলে হরিজনরা একে করপোরেশনের মাঠ বলত। এখন স্থানটি অনেক ছোট হয়ে গেছে। এটা এখন মাঠ নয়, সিমেন্টে বাঁধানো বড় উঠানজাতীয় কিছু। তার পরও হরিজনরা এখনো এটাকে করপোরেশনের মাঠ বলে। সেই মাঠের এক পাশে গাছতলায় দাঁড়িয়ে তরুণ রামগোলাম মানুষজন দেখছে। গেট দিয়ে কেউ ঢুকছে, কেউ বের হচ্ছে। কারও পায়ে তাড়া, কেউ ধীর পায়ে হাঁটছে। কারও চেহারা উদ্বিগ্নতায় ভরা, আর কেউ কেউ হাসতে হাসতে যাতায়াত করছে। দু-চারটা কার এবং জিপ করপোরেশনের মূল বিল্ডিংয়ের মুখে এসে থামছে। ওসব গাড়ি থেকে বনেদিমুখো সাহেবরা নেমে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে। রামগোলামের বুঝতে অসুবিধা হয় না—এরাই এই করপোরেশনের দণ্ডমুন্ডের মালিক। এদের অঙ্গুলিহেলনে করপোরেশন ওঠে আর বসে। এদের মধ্যে কেউ একজন হয়তো আবদুস ছালাম—করপোরেশনের বড়বাবু। আবদুস ছালাম সাহেবের হাতে হরিজনদের মরা-বাঁচার নাটাই।

এসএসসি পাস করার পর দাদু আর বাপ মিলে যেদিন বলল— রামগোলাম, তোমার আর পড়ার দরকার নাই। রামগোলাম জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিল—কেন পড়ার দরকার নাই? কিন্তু জিজ্ঞেস করার আগেই গুরুচরণ বলেছিল—আমরা ছোট জাত। ছোট জাতের লোকদের বেশি পড়তে নেই। বেশি পড়লে জীবনে বিড়ম্বনা বাড়ে শুধু। এই যে তুমি ম্যাট্রিক পাস দিলে, করপোরেশনে তারও দাম পাবে না। এই পাস দিয়ে অন্য জাতের মানুষরা যে চাকরি পাবে, তা তুমি পাবে না। কেন পাবে না? পাবে না এ জন্য যে তুমি মেথর। মেথরদের বেশি পড়তে নেই, বড় চাকরি পেতে নেই। আর জোর করে তুমি বেশি পড়বে? পড়ো। যতই পড়ো না কেন, করপোরেশনের গু-মুত টানা, নর্দমা সাফ করা আর রাস্তা ঝাঁট দেয়ার চাকরিই তোমার জন্য নির্ধারিত। তোমার আগে এই হরিজনপল্লির কেউ

BanglaBook.org

সাহেবি চাকরি পায়নি, তোমার পরেও কেউ পাবে না। সুতরাং তুমি আর পড়ো না। অপেক্ষা করো, করপোরেশনের সাহেবদের হাতে-পায়ে ধরে একটা চাকরির ব্যবস্থা করছি তোমার।

রামগোলাম সেদিন কিছু বলেনি। বলার ভাষাও তার মুখে ছিল না। দাদু তো মিথ্যা বলেনি। এই শহরের চার-চারটি মেথরপট্টি। কেউ তো সাফাইয়ের কাজ ছাড়া বড় কোনো কাজ করে না। অবশ্য তার মতো এত বেশি লেখাপড়া কেউ করেইনি আগে। করলে কী হতো? বড় অফিসার হয়ে যেত? দাদু বলছে—কখনো না। মেথরের ছেলে মেথর। বাপদাদা যা করেছে, ছেলে-নাতিকেও তা করতে হবে। কোনো মুক্তি নেই ভদ্রসমাজের এই শৃঙ্খল থেকে। কেন মুক্তি নেই? তারা যে অচ্ছুত, তারা যে সমাজের আবর্জনা। আবর্জনাকে যেমন মানুষরা বাড়ির এক কোণে ফেলে রাখে, আবর্জনার দুর্গন্ধ থেকে বাঁচার জন্য নাকে রুমাল চাপা দেয়—তারাও তেমনি সমাজের আবর্জনা; সমাজের এক কোণে ঠাঁই তাদের, তাদের দেখলে ভদ্রলোকরা এক পা দুই পা করে দ্রুত এগিয়ে যায়। এগুলো রামগোলামের ভাবার কথা না। কিন্তু যেদিন দাদু বলল, আমরা হীন জাত, আমরা পাপোশ, সমাজে মাথা নিচু করে থাকার জন্যই আমাদের জন্ম, লাথি-ঝাঁটা খাওয়ার জন্যই আমাদের জীবন—সেদিন থেকেই রামগোলাম এসব ভাবতে শুরু করল। মেথর কারা, কোথা থেকে তারা এল, বাঙালি সমাজে তাদের অবস্থান কোথায়, তারা কেন শুধু গু-মুত টানার কাজ করবে, লেখাপড়া করার পরও কেন তারা ভালো চাকরি পাবে না, সমাজ-মানুষরা কেন তাদের অস্পৃশ্য বলবে, কেন তাদের স্কুলটা কেড়ে নেয়া হয়েছে, কেন সেই স্কুলে স্বচ্ছন্দে ও নিরাপদে মেথর-সন্তানরা পড়ালেখা করতে পারে না—এসব ভাবতে শুরু করল রামগোলাম। মা-বাবা-দাদু কাজে বেরিয়ে পড়ার একটু পরে সে-ও বেরিয়ে পড়ে। পট্টি থেকে পট্টিতে ঘুরে বেড়ায় সে। ফিরিঙ্গিবাজার থেকে মাদারবাড়ি, মাদারবাড়ি থেকে ঝাউতলা আর ঝাউতলা থেকে বান্ডেল মেথরপট্টিতে। বুড়ো-বুড়িরা চাকরিতে যায় না। তাদের সঙ্গে কথা বলে রামগোলাম। বয়সী বুড়োরা রামগোলামের সঙ্গে কথা বলতে চায় না। ভাবে—পিচ্চি এই ছেলেটি কী কী সব জিজ্ঞাসা করে? কী কী সব জানতে চায়? মেথরদের প্রাচীন ও বর্তমানকাল সম্পর্কে কী কী সব জানতে চায়? সর্দারের নাতি তো! অভাব নাই ঘরে। তাই ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়ায় এপট্টি থেকে ওপট্টিতে। প্রথম প্রথম বুড়ো-বুড়িরা রামগোলামকে হেলা-অবহেলা দেখাল। পরে রামগোলামের সহিষ্ণুতা দেখে, তার জানার আগ্রহ দেখে, রামগোলামের প্রশ্নের উত্তর দিতে শুরু করল তারা। তাদের কাছ থেকেই রামগোলাম জানতে

BanglaBook.org

পারে, চট্টগ্রামে দুই ভাষাভাষীর ঝাড়ুদার সম্প্রদায় আছে। একটি তেলেগুভাষী, অন্যটি হিন্দিভাষী। তেলেগুভাষীরা এসেছে ভারতের অন্ধ্র প্রদেশের বিশাখাপত্তম থেকে এবং হিন্দিভাষীরা এসেছে উত্তর প্রদেশের কানপুরের হামিরবাগ থেকে। ব্রিটিশরাই তাদের এখানে নিয়ে আসে। ওই সময়ে ব্রিটিশ সরকার মেথরদের পর্যাপ্ত বেতন দিত, বাসস্থানের ব্যবস্থা করত। এমনকি গর্ভস্থ সন্তানের জন্যও ভাতা দিত। তাদের যাতায়াত ভাড়া ছিল ফ্রি, রেশনও পেত তারা। রামগোলাম এপট্টি-ওপট্টি ঘুরে বেড়ায় আর মেথরজীবনের এসব ইতিহাস শোনে। বুড়ো-বুড়িদের দিকেই তার ঝোঁক বেশি। কারণ, তারাই জানে হরিজন সম্প্রদায়ের প্রাচীন ইতিহাস। এদের কাছেই সে তার প্রশ্নগুলোর উত্তর জেনে নেয়। ওরা বলে, আমাদের বাপদাদারা কলকাতা করপোরেশনের বিরুদ্ধে পাঁচ-পাঁচবার ধর্মঘট করেছে, সেই সাতচল্লিশের আগে। বেতন বাড়ানোর জন্য এই ধর্মঘট ছিল। জমাদার, ঝাড়ুদার, মেথর ও আবর্জনা টানার গাড়ির গাড়োয়ানও এই ধর্মঘটে অংশ নেয়। কলকাতা করপোরেশনের মেয়র তখন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। তাঁর আগে মেয়র ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। তাঁর কাছে ধাঙড়দের জনপ্রতি মাত্র দুই টাকা বাড়ানোর আবেদন ছিল। তিনি দেশনেতা ছিলেন। সাধারণ মানুষের মুক্তির জন্য চিত্তরঞ্জন কত সংগ্রাম করেছেন! কিন্তু মেথরদের বেতন বৃদ্ধির ব্যাপারে তিনি সম্মতি দেননি। চিত্তরঞ্জন দেশবন্ধু হতে পারেন, মেথরবন্ধু তো নন। তাই ধাঙড়দের আবেদন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের দরবারে মাথা কুটে মরেছে। ধর্মঘটে গেছে মেথররা। প্রথম দফার ধর্মঘট ছয় দিন টিকেছিল। ধর্মঘটের কারণে চিত্তরঞ্জনের পরবর্তী মেয়র যতীন্দ্রমোহন এক টাকা বেতন বাড়াতে সম্মত হলেন, তা-ও জমাদারদের, সাধারণ ধাঙড়দের না। কিন্তু সেই সময়ের কলকাতা করপোরেশন যতীন্দ্রমোহনের এ সম্মতি মেনে নেয়নি। ওই সময় মেথরদের মাসিক বেতন ছিল মাত্র বার টাকা।

রামগোলাম জিজ্ঞেস করে—তারপর? প্রাচীনরা বলে, ওই সময় ধাঙড়দের মাঝখানে এসে দাঁড়ান বেগম সকিনা। এই সকিনার পুরো নাম বেগম সকিনা ফারুক সুলতানা মোয়াজ্জিদা। বাবা ইরানে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের নেতা। এই সকিনা কলকাতা করপোরেশনের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন ১৯৪০ সালে। এ সময় বিভিন্ন দাবিতে মেথররা আবার ধর্মঘট করে। ব্যাপক ধরপাকড় ও দমনপীড়ন শুরু হয়; গুলিও চালানো হয় ধর্মঘটিদের ঘায়েল করার জন্য। বেগম সকিনা করপোরেশনের নীতিনির্ধারণী সভায় ধর্মঘটি ঝাড়ুদার-মেথরদের পক্ষে তুমুল বাগ্‌যুদ্ধ চালান, আবার বাইরে এসে ধর্মঘটিদের নেতৃত্ব দেন। আট দিন ধর্মঘট চলার পর কলকাতা করপোরেশন আলোচনায় বসতে বাধ্য হয়।

BanglaBook.org

করপোরেশনের পক্ষে আলোচনায় নেতৃত্ব দেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। কিন্তু মেথরদের মতো ছোটলোকদের দাবি মানে কে! কোনো দাবিই মানলেন না লোকমান্য সুভাষ বসু। ধাঙড়রা লৌহকঠিন ঐক্যে দাঁড়িয়ে থাকে। শেষ পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রের জেদ মেথরদের দৃঢ় মনোবলের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে। যাদের বেতন ত্রিশ টাকা, তাদের মহার্ঘ এক টাকা করে বাড়বে—সম্মত হলেন সুভাষ বসু। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সম্মত হলো না করপোরেশনের হর্তাকর্তারা।

মেথরদের ধর্মঘটের এই বিচিত্র ইতিহাস রামগোলামকে অবাক করে, সে সবচেয়ে বেশি বিস্মিত হয় চিত্তরঞ্জন, যতীন্দ্রমোহন আর সুভাষ বসুর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কথা শুনে।

প্রাচীনরা বলে, শুধু এদের ওয়াদা ভঙ্গের কথা শুনে দুঃখিত হচ্ছ কেন? দুঃখ পাওয়ার আরও যে ব্যাপার আছে!

'সে কেমন?' রামগোলাম চোখ বড় বড় করে জিজ্ঞেস করে।

লোলচর্ম, বঞ্চিত-লাঞ্ছিত বুড়ো মেথররা বলে, ওয়াদা ভঙ্গের কথা শুনে ১৯৪০ সালের ২৬ আগস্ট মেথর-ঝাড়ুদাররা আবার ধর্মঘট ডাকে। মুসলিম লীগের এ আর সিদ্দিকী তখন করপোরেশনের মেয়র আর সুভাষ বসু অন্যতম অল্ডারম্যান। করপোরেশন কর্তৃপক্ষ ধর্মঘটের শুরু থেকে দমনপীড়নের নীতি গ্রহণ করে। ২৭ আগস্ট বেগম সকিনাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধাঙড় বস্তিতে বস্তিতে পুলিশ ঢুকে ব্যাপকভাবে লাঠিচার্জ করে। ব্যাপক ধরপাকড়, নির্মম পুলিশি নির্যাতন আর নেতৃত্বহীনতার কারণে ধর্মঘটের মেরুদণ্ড ভেঙে যায়।

তারপর?

তারপর যে-কে সেই। আবার প্রতি সকালে গুয়ের টাঙ্গি মাথায় নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পথ ফুরানো, একঘরে ঠেলাঠেলি করে তিনপুরুষের জীবনযাপন, আবার ভদ্রলোকদের লাথি-চড়, শালা বানচোদ, শুয়োরের বাচ্চা। টাঙ্গি টাঙ্গি মদ গিলে এসব যাতনা ভুলে থাকার চেষ্টা। তারপর মৃত্যু; তারপর আবার জন্ম, আবার মৃত্যু।

এসব শুনে শুনে রামগোলাম পোক্ত হয়ে ওঠে। মেথর জীবনের অনেক কিছু জেনে যায় সে। তার ভেতর একধরনের অধিকার-চেতনা দানা বাঁধে, স্বজাতের মানুষের জন্য একটা দরদের জায়গা তার মধ্যে তৈরি হয়। মানুষের সৃষ্ট জাতপাতের প্রতি একটা প্রচণ্ড ঘৃণা তার ভেতর উথালপাথাল করতে থাকে।

তাই গত রাতে দাদু গুরুচরণ যখন তাকে মেথরদের চাকরি-বঞ্চনার কথা বলল, তখন সে উত্তেজিত হলো। দাদু যখন তাকে সঙ্গে যাওয়ার কথা বলল, সে এককথায় রাজি হয়ে গেল।

BanglaBook.org

তুফান মেইল এখন গু টানে না, রাস্তার পাশের আবর্জনা টানে। ঘরে ঘরে স্যানিটারি পায়খানা হয়ে যাওয়ার ফলে বাড়ি বাড়ি থেকে গু টানার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেছে। কর্তৃপক্ষ তুফান মেইলের চেহারা পাল্টে দিয়েছে। মোটা টিনের পাত লাগিয়ে তিন দিক বন্ধ করে দেয়া হয়েছে ট্রাকটির। বর্তমানে তুফান মেইল স্বাভাবিক ট্রাকের রূপ নিয়েছে। আগের মতোই গুরুচরণ তুফান মেইল চালায়। যৌবন বয়সে তুফান মেইল তার হাতে এসেছিল, নেড়ে-ঝেড়ে যুবক গুরুচরণ তুফান মেইলকে রংদার করে তুলেছিল। এখন গুরুচরণের মতোই ট্রাকটি অধিকতর বুড়া হয়ে গেছে—লক্কড়ঝক্কড়। চলতে শুরু করলেই গরগর, ঝনঝনাৎ করে বাজে। দক্ষ হাতে ধীরে ধীরে চালায় গুরুচরণ। কোনো কিছুতে জোর ধাক্কা লাগলে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ার দশা তুফান মেইলের। জেলখানার মুখে, কোতোয়ালি থানার পাশে, বার্মা রাজু রেস্টুরেন্টের সামনে, দারোগাহাটের মুখে, রেয়াজউদ্দিন বাজারের ওভারব্রিজের নিচে ইটের বড় বড় ডাস্টবিন তৈরি করে দিয়েছে করপোরেশন। নিকটবর্তী গলি-উপগলি থেকে, নর্দমা থেকে আবর্জনা ট্রলিতে করে এনে ওই সব ডাস্টবিনে ফেলা হয়। ওখান থেকেই ওগুলো তুফান মেইলে তোলা হয়। হালিশহরের ডাকাইত্যা বিল ভরাটের দায়িত্ব পেয়েছে করপোরেশন। ওখানেই তুফান মেইলকে নিয়ে যায় গুরুচরণ, আবর্জনামুক্ত হলে তুফান মেইলকে নিয়ে আসে শহরের ভেতরের আবর্জনায় ভরা ডাস্টবিনের কাছে। সব ডাস্টবিন থেকে আবর্জনা পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত গাড়ি চালিয়ে যেতে হয় গুরুচরণকে। আজ কাজ করতে করতে এগারোটা বেজে গেল। জানে, করপোরেশনের মাঠে তার জন্য অপেক্ষা করছে রামগোলাম আর কার্তিক। কিন্তু যাওয়ার উপায় নেই, আবর্জনা পরিষ্কার করা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কাজ থেকে ছুটি নেই। দায়িত্ব পালনে একটু নড়চড় হলে অনেক খেসারত দিতে হয় তাদের—জমাদারের অশ্রাব্য গালিগালাজ, ছোটসাহেব বড়সাহেব নির্বিশেষে সবার চোখ রাঙানি। সঙ্গীদের তাড়া দেয় গুরুচরণ—'জ্যলদি, জ্যলদি, ট্রাকমে জ্যলদি ময়লা উঠাও।' সর্দারের আদেশে সঙ্গীরা দ্রুত হাত চালায়।

কার্তিকেরও ভাগ্য খারাপ আজ। কাজ পড়েছে আগ্রাবাদে। চট্টগ্রাম বেতারের আর ডির পায়খানার টাঙ্গি জ্যাম হয়ে গেছে। টাঙ্গি পুরিয়ে গুয়ে-মুতে সয়লাব। আর ডি সরকারি চাকুরে। করপোরেশনকে চিঠি দিয়েছেন—টাঙ্গির সমস্যা মিটান। ওই টাঙ্গি পরিষ্কার করার দায়িত্ব পড়েছে কার্তিক, রামলাল আর বড়বাবুর হাতে-পায়ে ধরে চাকরি ফিরে পাওয়া মদো শ্যামলের ওপর। চাকরিজীবনের সবচেয়ে কঠিন কাজ গুয়ের টাঙ্গি সাফ করা। দীর্ঘদিনের জমানো

BanglaBook.org

গু যে কী জঘন্য দুর্গন্ধময়, মেথররা ছাড়া অন্য কেউ জানে না। টাঙ্গির ম্যানহোল খুললেই সেই দুর্গন্ধ ঝাঁপিয়ে পড়ে মেথরদের নাকে-চোখে-মুখে-জিহ্বায়, সর্বাঙ্গে। গলা দিয়ে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে আসতে চায়, নাকের কেশ জ্বলে ছাই হয়ে যেতে চায়, মাথা ঝিমঝিম করে, দুই চোখে আঁধার ঘনিয়ে আসে। বেদিশা হয়ে যায় তখন তারা। পালিয়ে বাঁচতে চায়। কিন্তু পালাতে পারে না। পালালে যে চাকরি যাবে। চাকরি গেলে যে ভিখারি হতে হবে। ঘৃণাবোধ থেকে বাঁচার জন্য, বিবমিষা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তাই তারা টাঙ্গি সাফাইয়ের কাজে হাত দেয়ার আগে মদ খায়, বাংলা মদ। মদ খেলে ভেতরটা বেশ চাঙা হয়ে ওঠে, মনের মধ্যে বেশ একটা উড়ুউড়ু ভাব জাগে। যেন বাতাসে ভাসছে। আশপাশের সবকিছুকে তুচ্ছ বলে মনে হয়; নিজেকে অনেক বড়, অনেক মহান বলে মনে হয়, গুয়ের দুর্গন্ধকে মনে হয় গোলাপের সুবাস। তুরীয়ানন্দে নিমগ্ন হয়ে পড়ে তখন তারা। গু-মুত সাফাই করাকে কঠিন কাজ বলে মনে হয় না তখন। টাঙ্গি সাফাইয়ের কাজে হাত লাগানোর আগে লুঙ্গির আড়াল থেকে মদের বোতলটি বের করে কার্তিকের দিকে এগিয়ে ধরে মদো শ্যামল। বলে, 'নে, নে কার্তিক, দু-চার ঢোক গিলে নে।'

কার্তিক বলে, 'আমি মদ খাব না আজ।'

'কেন খাবি না। তুই তো ধোয়া তুলসীপাতা না। এর আগে অনেকবার খেয়েছিস তো।' নিজের গলায় মদ ঢালতে ঢালতে শ্যামল বলে।

কার্তিক বলে, 'খেয়েছি। আজ খাব না।'

'কেন খাবি না। বউয়ের জন্মদিন নাকি? বউ গোস্‌সা করবে তাই?' বলেই হা হা করে হেসে ওঠে শ্যামল।

কার্তিক ঠান্ডা গলায় বলে, 'ঠিক তা-ই না। আজকে আমরা বড় সাহেবের সাথে দেখা করব। তার সাথে দরবার আছে আমাদের আজ। এসপার কি ওসপার।'

রামলাল শ্যামলের হাত থেকে এক ঝটকায় বোতলটি কেড়ে নেয়। শেষ ফোঁটাটি না-পড়া পর্যন্ত বোতলটি মুখের ওপর উপুড় করে রাখে। তারপর জড়ানো কণ্ঠে বলে, 'চল, কাজে হাত লাগাই।'

টাঙ্গি সাফ করতে করতে অনেক বেলা হয়ে গেল। কার্তিক যখন করপোরেশনের মাঠে এসে পৌঁছাল, তখন ঘড়ির ছোট ও বড় কাঁটা দুটি বারোটা ছুঁই ছুঁই। দেখল, রামগোলাম আর গুরুচরণ আগেই উপস্থিত হয়েছে সেখানে।

কার্তিক বলল, 'অনেক দেরি হয়ে গেছে জ্যাঠা। টাঙ্গি সাফাইয়ের কাজ ছিল। অনেক বড় টাঙ্গি, মালে ভর্তি। বালতি কেটে কেটে যত সাফ করি, ততই যেন

BanglaBook.org

বেড়ে যাচ্ছিল, আগ্রাবাদ থেকে অনেকটা দৌড়ঝাঁপ দিয়ে এসেছি আমি।'

গুরুচরণ বলে, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমিও তাড়াতাড়ি আসতে পারিনি। ডাস্টবিনে ডাস্টবিনে অনেক আবর্জনা আজকে। হালিশহরে টানাটানি। কাজ শেষ করে আসতে আসতে বারোটা বেজে গেল।'

'রামগোলামেরই কষ্ট হলো বেশি। মাথাফাটা রোদের মধ্যে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হলো তাকে।' দরদি কণ্ঠে বলল কার্তিক।

এ সময় ওরা দেখল মূল বিল্ডিংয়ের গেট দিয়ে ঝাউতলার মুখ্য যোগেশ বেরিয়ে আসছে। তার ডিউটি করপোরেশন অফিসে। বড়সাহেবের পেয়ারের লোক সে। আজ ঝাড়ু দেয়ার কাজ শেষ করার মুখে বড়সাহেব আবদুস ছালাম ডেকে পাঠালেন তাকে। দরজায় মুখটা গলিয়ে দেয়ার সাথে সাথেই চিৎকার করে উঠলেন তিনি, 'ওই বেডা, ভালো করে কামকাজ করস না? চোখে সুরমা লাগাইয়া ঘুইরা বেড়াস বেডা?'

'জি হুজুর, কাজ করি তো, কিছুই বুঝতে পারছি...।' আমতা আমতা করে বলেছিল যোগেশ।

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ছালাম সাহেব বললেন, 'বুঝতে পারছস না? এই তো? টয়লেট পরিষ্কার করছস আজ? বলবি—করছি তো স্যার। তাই না?'

যোগেশ ভয়ে ভয়ে ঢোক গিলে। ওপরে-নিচে মাথা নাড়ে।

'দেখ, হারামির পুত দেখ, ভিতরে গিয়া দেখ। যদি সাফ করস, তাইলে গু-মুত ওপরে ভেসে উঠল কেমনে?' চোখ লাল করে কথাগুলো বললেন আবদুস ছালাম। কুঁজো হয়ে সামনে ডান হাত প্রসারিত করে বড়বাবুর পাশ দিয়ে টয়লেটে ঢুকল যোগেশ। দেখল, ইংলিশ টয়লেটের গর্তটি টইটম্বুর। গু-মুতে গলাগলি সেখানে। ঘটনা কী? সে তো সকালে হারপিক দিয়ে ডলে-মেজে টয়লেটটি পরিষ্কার করে দিয়ে গেছে। তাহলে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে এ অবস্থা কেন? নিশ্চয়ই ইউসুফ মিয়ার কাজ এটি। বড়সাহেবের খাস পিয়ন সে। বড়সাহেবের আসার আগেই আসতে হয় তাকে। এসে টেবিল-চেয়ার ঝেড়ে-মুছে সাফ করে। দুইমণি ইউসুইফ্যাই এই কাজ করেছে। সকালে বাসায় টাঙ্গি সাফ করে আসতে পারেনি বোধ হয়। বড় সাহেবের টয়লেটেই আজ টাঙ্গি সাফ করেছে। কোনো একটা গড়বড় তো সে নিশ্চয়ই করেছে। যা-ই হোক, বড়বাবুর গাল শুনে পিত্তি জ্বলে গেছে তার। 'শালা, খানকির বাচ্চা' বলে বাম হাতটি আবাহু ডুবিয়ে দিল গু-মুতে ভরা টয়লেটে। নাক কুঁচকে, চোখ বন্ধ করে, মুখটা যত দূর সম্ভব ডানে ঘুরিয়ে শ্বাসবন্ধ করে কিছুক্ষণ হাতিয়ে গেল যোগেশ। তারপর 'পাইছি' বলে হাতটা উঠিয়ে আনল টয়লেট থেকে। হাতে টয়লেট

BanglaBook.org

পেপারের চাকা। জল লেগে টয়লেট পেপার ফুলে-ফেঁপে একাকার। টপাটপ পানি পড়ছে ওটা থেকে। ওটাই টয়লেটের পানি-ময়লা নিষ্কাশনের পথ বন্ধ করে দিয়েছিল। 'শালারপুত ইউসুইফ্যা, টয়লেট পেপার দিয়ে পোঁদ মুছতে গিয়ে গোটা প্যাকেটটা টয়লেটে ফেলছস। আর বড়সাহেবের কাছে দোষ দিছস আমার!' বিড়বিড় করতে করতে বেরিয়ে এল যোগেশ।

ছালাম সাহেবের সামনে কুঁজো হয়ে বলল, 'ঠিক হয়ে গেছে বড়সাহেব।'

'যা, আর কোনো দিন এ রকম করিস না। তেরিমেরি করলে চাকরির বারোটা বাজাইয়া দিমু।' উষ্ণ গলায় বললেন ছালাম সাহেব।

ছালাম সাহেবের কাছে ধাতানি খেয়ে বেরিয়ে এসেছিল যোগেশ। বেরিয়েই গুরুচরণদের সাথে দেখা। মনের বেদনা মুখে ভেসে উঠেছে যোগেশের।

গুরুচরণ বলল, 'যোগেশদা, এ রকম চেহারা কেন তোমার? মরা মানুষের মতো ফ্যাকাশে?'

'না, কিছু না দাদা।' নিচু স্বরে যোগেশ বলে।

'কিছু তো একটা হয়েছে! খোলসা করে বলো মেসো।' কার্তিক জিজ্ঞেস করল।

'বললাম তো কিছু হয়নি।'

কার্তিক বলল, 'কিন্তু চোখমুখ যে বলছে কিছু একটা হয়েছে। গাঁট্টা খেয়েছ বোধ হয় কারও কাছে।'

'না, বড়সাহেবের মন আজ ভালো নেই। একটু বকাঝকা করেছে এই আর কি।' বলল যোগেশ।

'তুমি তো উনার খাস দালাল। উনি তোমাকে বকলেন?' তীব্র কটাক্ষ কার্তিকের কণ্ঠে।

এতক্ষণ পর্যন্ত সবকিছু গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করছিল রামগোলাম। মুখে কিছু বলেনি। কার্তিকের কটাক্ষ তার ভালো লাগল না। হঠাৎ সে বলে উঠল, 'থাক না কাকা, ঠাট্টা-মশকরা আর না-ই বা করলে।'

'তুমি চেনো না আমার এই মেসোকে? বড়বাবুর এক নম্বর দালাল আমার মেসো। হরিজনদের যত সর্বনাশ হয়েছে, তার অধিকাংশের জন্য দায়ী এই যোগেশ মেসো।' কার্তিক চোখ রাঙিয়ে বলে।

অপমানটা গায়ে মাখল না যোগেশ। যেন কিছুই হয়নি এমনি গলায় জিজ্ঞেস করল, 'তা তোমরা কী জন্য জমায়েত হয়েছ এখানে?'

কার্তিক চোখ টিপার আগেই রামগোলাম গরগর করে বলে ফেলল, 'বড় সাহেব হরিজনদের ঠকাচ্ছেন। মেথরদের চাকরি দিয়ে দিচ্ছে সবাইকে।

BanglaBook.org

এসপার-ওসপার করতে এসেছি আমরা। তাঁর কাছেই যাব আমরা।'

যোগেশ চোখ বড় বড় করে বলল, 'ও, তাই নাকি? চলো আমিও যাই তোমাদের সঙ্গে।'

'না, তোমাকে যেতে হবে না আমাদের সঙ্গে।' হুংকার দিয়ে উঠল কার্তিক।

যোগেশ বলল, 'আমিও তো হরিজন। চাকরি অন্যদের দিয়ে দেয়ার ফলে তোমাদের মতো আমারও ক্ষতি হবে। আমার ছেলেমেয়েও তো ঠকবে। বড় সাহেবের কাছে তোমাদের যেমন প্রতিবাদ আছে, আমারও তেমনি প্রতিবাদ আছে। চল যাই, এক সাথে যাই।'

কার্তিক ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলল, 'বাঃ, বাঃ! কী সোন্দর ভাষণ। মীরজাফরের গলায় সিরাজদৌল্লার ডায়লগ!'

যোগেশ করুণ করুণ ভাব মুখে ফুটিয়ে তুলল। কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলল, 'তুমি যতই আমাকে তাচ্ছিল্য করো, এ কথা তো মানবে আমিও মেথর। ঝাউতলার মুখ্য আমি। ঝাউতলার মেথরপট্টির মানুষ ভালোবেসে আমাকে মুখ্য বানিয়েছে।'

'ভালোবেসে এবং ভরসা করে বানিয়েছিল। কিন্তু যোগেশদা, তুমি বিশ্বাস রাখতে পার নাই। করপোরেশন আর আমাদের ঝামেলার সময় তুমি অনেকবার করপোরেশনের পক্ষ নিয়েছ। তাতে আমাদের ক্ষতি হয়েছে।' কোমর থেকে গামছাটা খুলে ঘাড়-গলা মুছতে মুছতে কথাগুলো বলল গুরুচরণ।

যোগেশ হাতেনাতে ধরা পড়া চোরের মতো মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, 'আগে যা হয়েছে, হয়েছে। অতীত বাদ দাও সর্দার। এখন তো তোমাদের মতো আমারও ক্ষতি। বেইমানির প্রশ্ন আসে না।'

'যত কথাই তুমি বলো, আমাদের সঙ্গে তোমাকে নেব না।' গর্জে উঠল কার্তিক। যোগেশ ভ্যাবাচ্যাকা খেল কার্তিকের উগ্র মূর্তি দেখে। কিছু একটা আশ্বাস পাওয়ার লোভে রামগোলামের দিকে তাকাল। ভাবল, সর্দারের নাতি রামগোলাম। পেয়ারের বান্দা। কার্তিকও পছন্দ ও বিশ্বাস করে রামগোলামকে। নইলে এত বড় একটা ব্যাপারে রামগোলামকে সঙ্গে আনত না। শিক্ষিত ছেলে। রামগোলাম যদি তার পক্ষে কোনো মন্তব্য করে, তাহলে তা ফেলতে পারবে না সর্দার আর কার্তিক। রামগোলামের মুখ দেখে মনে হচ্ছে—সে পুরোটা না হলেও তার কথা অনেকটা বিশ্বাস করেছে। বড়সাহেব আর এদের কথাবার্তার মধ্যে থাকতে হলে রামগোলামকেই ভেজাতে হবে। অসহায় দৃষ্টিতে রামগোলামের দিকে তাকিয়ে যোগেশ বলল, 'তোমার কি অভিমত রামগোলাম? তোমারও কি একই অভিমত—আমাকে পাত্তা না দেয়া, মুখ্য হিসেবে আমাকে অপমান করা?'

BanglaBook.org

দোটানায় পড়ে গেল রামগোলাম। একদিকে কার্তিকের রুক্ষ-কঠিন মন্তব্য, দাদুর কার্তিককে সমর্থন আর অন্যদিকে মুখ্য যোগেশদার অসহায় করুণ মুখ। যোগেশদা সমাজের মুখ্য। সর্দারের পরেই হরিজনপল্লিতে মুখ্যদের গুরুত্ব। কিন্তু কার্তিক কাকার কথা শুনে মনে হলো—যোগেশদা সমাজে গুরুত্ব হারিয়েছে। নিশ্চয়ই খারাপ কিছু কর্মকাণ্ড তার আছে। কিন্তু যেভাবে যোগেশদা তাকে মধ্যস্থতা মানছে, এ মুহূর্তে তার কিছু একটা করা উচিত। রামগোলাম বলল, 'যোগেশদা, তুমি তো অনেক ক্লান্ত আজ। সেই সকাল থেকে কাজ করেছ। তুমি মুখ্য। তোমার দাম তো সমাজে কম না। এখন তুমি কলোনিতে ফিরে যাও। ভবিষ্যতে তোমাকে নিয়েই আমাদের সব কাজ চলবে।'

রামগোলামের কথা শুনে যোগেশের মুখ থেকে নাছোড়বান্দা ভাবটা চলে গেল। বলল, 'ঠিক আছে, তুমি যখন বলছ, আমি ফিরে যাচ্ছি কলোনিতে। মনে রেখো, আমি তোমাদেরই লোক।' বলেই মেইন গেটের দিকে হনহন করে হাঁটা দিল যোগেশ।

পেছন থেকে অনুচ্চ স্বরে কার্তিক বলল, 'ছালাম সাহেবের পা-চাটা কুত্তা।'

রামগোলাম বলল, 'এ রকম না বললে হয় না কার্তিক কাকা।'

'পরে টের পাবে যোগেশ কী চিজ।' কার্তিক বলল।

তিনজন বড়সাহেব আবদুস ছালামের অফিসের দিকে রওনা দিল; গুরুচরণ-কার্তিক পাশাপাশি, তাদের পেছনে রামগোলাম।

নয়

রাস্তাটি চেরাগি পাহাড় থেকে ডিসি হিলের উত্তর পাশ দিয়ে লাভ লেইনের দিকে এগিয়ে গেছে। এ রাস্তাটির মাঝপেট থেকে একটা ঢালু রাস্তা নিচের দিকে নেমে গেছে পশ্চিমে। ঢালু রাস্তার পেট চিড়ে উত্তর-দক্ষিণে একটা বড় নালা। নালার দুই পাশে থকথকে কাদা। নানা আবর্জনা-জঞ্জালে ভরা দুই পাড়। নালার পানি হলদেটে। অভিজ্ঞ মানুষ জানে, তরল গুয়ের প্রবাহ এটি। নাই নাই করেও যাদের এখনো খাটা পায়খানা আছে, তারা পাইপ দিয়ে নালা পর্যন্ত প্রসারিত

BanglaBook.org

করে দিয়েছে তাদের পায়খানাকে। বর্জ্য পদার্থ নালার জলে মিশে ও-রকম হলদে রং ধারণ করেছে। নালা থেকে কলজের বোঁটা ধরে টান দেয়া দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে অবিরাম। নালার পূর্ব পাশ ঘেঁষেই ঝাউতলা হরিজন কলোনি। চারতলার একটিমাত্র বিল্ডিং। চল্লিশটি পরিবার গাদাগাদি করে থাকে এখানে। বিল্ডিংয়ের সামনের উঠানটি এবড়োখেবড়ো। মাঝেমধ্যে গর্ত। দিনের বেলায় সেই উঠানে বাচ্চাকাচ্চাদের চ্যাঁ-ব্যাঁ। শূকরছানাগুলোও উঠানের এ-মাথা থেকে ওই-মাথা পর্যন্ত দৌড়াদৌড়ি করে। মানববাচ্চা এবং শূকরছানা সম্পর্কে এই পট্টির হরিজনরা নির্বিকার। মেয়েরা সংসার আর পুরুষরা মদ নিয়ে ব্যস্ত। ভদ্রলোকরা নাকে রুমাল চেপে দ্রুত পায়ে মেথরপট্টি আর নালা পার হয়। ভুলেও তারা ও দুটোর দিকে তাকায় না।

নিচতলার পাঁচ নম্বর ঘরে থাকে রূপালী দাশ। স্বামী ইন্দললাল দাশ। 'দাশ' পদবিই লেখে এখন মেথররা। ইন্দললালের বাপ-দাদার নামের শেষে লেখা থাকত মেথর। হরিলাল মেথর, চমনলাল মেথর। ব্রিটিশ আমলেই এই পদবি চালু হয়েছিল। পাকিস্তান আমল পেরিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম দিকেও এই পদবি বহাল ছিল। পরে হরিজনরা পদবি সচেতন হলো। 'দাশ' পদবিকেই বেছে নিল তারা। 'দাস' পদবিও প্রচলিত আছে হিন্দুসমাজে; নিম্নবর্গীয়রা ব্যবহার করে এটি। আর 'দাশ' পদবি ব্যবহার করে বনেদি হিন্দুরা। মেথররা নামের শেষে মেথর শব্দটি বাদ দিয়ে 'দাশ' পদবিকে গ্রহণ করল। রূপালী মেথর এখন রূপালী দাশ, ইন্দললাল মেথর ইন্দললাল দাশ।

রূপালী রূপলালের একমাত্র মেয়ে। রূপলাল ঝাউতলাপট্টির বাসিন্দা। চাকরিসূত্রে সে দুই কামরার আবাসস্থলটি বরাদ্দ পেয়েছে করপোরেশন থেকে। বউ মারা যাওয়ার পর আর বিয়ে করেনি রূপলাল। ছোট্ট মেয়েটি চোখের সামনেই বড় হয়ে গেল। মদতি ছিল রূপলাল। বউয়ের ওপর অনেক অত্যাচার করেছে। বউ মরার পর মেয়েটিকে আঁকড়ে ধরল রূপলাল। ঝাউতলা থেকে ইন্দললালকে ঘরজামাই করে আনল। তার হাতে রূপালীকে গছিয়ে দিয়ে রূপলাল চোখ বুজল একদিন।

রূপালী চনমনে স্বভাবের। উজ্জ্বল শ্যামলা। মাঝারি উচ্চতা। ধারালো নাক। টানা টানা চোখ সব সময় কথা বলে। লম্বা ঘন কালো চুল খোঁপা করে বাঁধে। সেজেগুজে থাকতে পছন্দ তার। সামাজিক চাপে হরিজনরা দিশেহারা। মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন। উন্মূল তারা। ভদ্র-শিক্ষিত সমাজের লোকদের যত দূর সম্ভব, এড়িয়ে চলে তারা। যা কিছু কথা নিজেদের মধ্যে। আনন্দ আর বেদনা নিজেদের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করেই তৃপ্ত তারা। কিন্তু রূপালীর স্বভাব অন্য রকম। সে

BanglaBook.org

প্রতিবাদী। তার বাবা হাজার চেষ্টা করেও তাকে বোঝাতে পারেনি যে মেথরদের প্রতিবাদ করতে নেই। উপহাস-অবহেলাই তাদের ললাটলিখন। কিল-লাথি তাদের প্রাপ্য। ঠাট্টা-মশকরা-ঘৃণা তাদের বাড়তি পাওনা। বাপ রূপলাল যতই বোঝাক, কাজ কিছুই হয়নি। কোথাও অবহেলা-অসংগতি দেখলেই ফুঁসে ওঠে রূপালী। রূপালী ধীরে ধীরে বালিকা থেকে তরুণী হয়ে উঠল। রূপলাল মদ ছেড়ে দিয়েছে অনেক আগে। চাকরি শেষে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে সে। মেয়েকে নিয়েই নিজের একটা জগৎ তৈরি করে নিয়েছে রূপলাল। মেয়ে রান্না করলে তরকারি কুটে দেয় সে, ভাত খাওয়ার পর বাসনকোসন মাজার জন্য পানি এগিয়ে দেয় মেয়ের দিকে। রূপলাল ভাবে—মেয়ে তার সেয়ানা হয়ে উঠেছে, বিয়ে দেয়া দরকার। কিছু জমানো টাকা তার হাতে আছে। ওই টাকায় বিয়ে সেরে যাবে। কিন্তু মেয়েকে কাছছাড়া করা যাবে না। বউ নাই ঘরে তার। রূপালী অন্য ঘরে চলে গেলে একেবারে একা হয়ে যাবে সে। না, সে আর একা হতে চায় না। বউ তো প্রতিশোধ নিয়েছে। মরে গিয়ে অত্যাচারের জবাব দিয়ে গেছে তাকে। আর না। আর ভুল করবে না সে। ঘরজামাই এনে মেয়েকে কাছেই রেখে দেবে। ছেলে খুঁজতে থাকে সে। কখনো মনে মনে; কখনো আবার এপট্টি-ওপট্টি ঘুরে ঘুরে। এঘরে-ওঘরে খোঁজ নেয় রূপলাল, বিয়ের যোগ্য চাকুরে ছেলে আছে কি না?

ঘরে একা একা সময় কাটে রূপালীর। পাড়া-বেড়ানো স্বভাব নয় তার। অন্যদের ঘরে গিয়ে গালগপ্পো করতে পছন্দ করে না সে। দোতলার হরিলালের বউ আসে মাঝেমধ্যে। করপোরেশনে চাকরি করে সে। বিয়ে হয়েছে চার বছর। বাচ্চা হয় না। হরিলালের মা বলে—বাঁজা বউ ঘরে এনেছি। এ কথা কানে তোলে না হরিলালের বউ কাজলি। কিন্তু একই কথা বলতে বলতে যেদিন শাশুড়িটা কাজলির জীবনটাকে অতিষ্ঠ করে তোলে, সেদিন কাজলি অনেকটা পালিয়ে আসে রূপালীর ঘরে। এসে নীরবে চোখের জল ফেলে। রূপালী বলে, 'হরিলালদাকে বলো না কেন শাশুড়ির অত্যাচারের কথা?'

কাজলি বলে, 'সমস্ত দিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে আসে। তার মুখ দেখলে বড় মায়া হয়। মনে কষ্ট দিতে চাই না আমি তাকে।'

'না বললে কি তুমি এই অত্যাচার থেকে মুক্তি পাবে? শাশুড়ি ছাড়বে না তোমাকে। শাশুড়ি তোমার জীবন কেচে দেবে।' রূপালী বলে।

'দেখি।' কাজলি কী যেন লুকাতে চাইছে। চোখ এড়ায় না রূপালীর। রূপালী চোখ কুঁচকে জিজ্ঞেস করে, 'কী যেন লুকাতে চাইছ কাজলি বৌদি! গলার নিচে কী কথা যেন ঢোক গিলে চালান করছ?'

BanglaBook.org

'না না, কিছু না।' ধরা পড়া চোরের মতো মুখ করে কাজলি বলে।

'কিছু একটা তো বটেই!' তারপর কাজলির হাত চেপে ধরে বলে, 'কী সেটা, বৌদি?'

একটা বড় দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাজলি। চুপচাপ খাটিয়ার কোনায় বসে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর শাড়ির আঁচল দিয়ে ঘষে ঘষে মুখ মোছে। ডানে-বাঁয়ে জোরে জোরে মাথা ঝাঁকায়। তারপর ধীরে ধীরে বলতে শুরু করে, 'প্রতিজ্ঞা করেছি, জীবনে কাউকে বলব না। কিন্তু ভেতরে ভেতরে বড় কষ্ট পাচ্ছি বোন। এ কষ্ট আমার। আমার কষ্ট আমাকে খাক, কিছু আসে-যায় না। কিন্তু সেই কষ্টে যখন শাশুড়ি খোঁচা মারে, মরে যেতে ইচ্ছে করে আমার।'

'কী ব্যাপার, বলো তো বৌদি? এমন কী ঘটনা, যা তুমি নিজের মধ্যে চেপে রেখেছ?' রূপালী কাজলির কাছ ঘেঁষে খাটিয়ায় বসতে বসতে জিজ্ঞেস করে।

'প্রথম দুই বছর যখন বাচ্চা হলো না, তোমার দাদা হাসতে হাসতে একদিন বলল—বিষয় কী? বাঁজা নাকি তুমি? বাচ্চা হচ্ছে না কেন তোমার? এত বড় খোঁচায় উত্তর দিইনি সেদিন। সাত দিন মতন চুপচাপ ছিলাম। তারপর একদিন রাতে বললাম, চলো ডাক্তারের কাছে যাই। প্রথমে সে রাজি হয়নি। পড়ে চাপাচাপিতে রাজি হলো। গেলাম দুজনে ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার আমাদের দুজনকে একটা ঘরে ঢুকিয়ে দিল। পরীক্ষা-টরীক্ষা, নানা রকম কাণ্ডকারখানা এই আর কী। সাত দিন পর রিপোর্ট দিল।' বলে থেমে গেল কাজলি।

রূপালী ঔৎসুক্যভরে জিজ্ঞেস করল, 'কী রিপোর্ট দিল ডাক্তার সাহাব?'

কাজলি বলল, 'তোমার দাদার বাচ্চা জন্ম দেবার ক্ষমতা নাই।' কাজলির কণ্ঠ যেন অনেক দূর থেকে ভেসে এল।

'তো, এই কথাটা শাশুড়িকে মুখের ওপর সাফ বলে দাও না কেন?'

'কী করে বলি বলো? শাশুড়ি কী পরিমাণ দুঃখ পাবে ভেবে দেখেছ? তা ছাড়া তোমার দাদার সম্মান? পট্টির মানুষরা তোমার দাদাকে নিয়ে ঠাট্টা-মশকরা শুরু করবে। তার জীবনটা অপমানে ভরে যাবে।' কাজলি বলে।

হাঁ করে তাকিয়ে থাকে রূপালী কাজলির মুখের দিকে। ভাবে—বলে কী কাজলি বৌদি? সারা জীবন কি এভাবে কষ্ট পেতে থাকবে নাকি! তারপর আবার ভাবে, তার কাছে বৌদি মনের ব্যথা বুঝিয়ে যদি একটু শান্তি পায়, পাক না। তারপর দরদ মেশানো কণ্ঠে বলে, 'তুমি অনেক ভালো বৌদি। স্বামীর সম্মান নিয়ে তুমি এ রকম করে ভাবো? ভাবতে বড় ভালো লাগছে। দাদা তো তোমাকে আদর-যত্ন করে। শাশুড়ি আর কত দিন বাঁচবে? তখন সংসার সুখে ভরে যাবে তোমার।'

BanglaBook.org

কাজলি মনে সুখ নিয়ে ঘরে ফেরে।

চারতলার মনুলালের শালা জনি আড়েঠাড়ে তাকায় রূপালীর দিকে। সুযোগ পেলে গা ঘেঁষে হাঁটে। ভুরভুর করে আতরের গন্ধ বেরোয় তার গা থেকে। বাহারি রুমাল গলায় বাঁধে। লুঙ্গিটা বাম হাতে গোছা করে তুলে ধরে হাঁটে। জনি ঢাকা থেকে বেড়াতে এসেছে বোনাইয়ের বাড়িতে। অনেক দিন কেটে গেল, তার পরও যায় না। দিনে এখানে ওখানে ঘোরে, রাতে মদের ঠেকে আড্ডা দেয়। গভীর রাতে মাতাল হয়ে পট্টিতে ফেরে। রূপালীদের ঘর ঘেঁষেই ওপরে ওঠার সিঁড়ি। সিঁড়ির দিকে জানালা। জানালা বন্ধ থাকে সর্বদা। ওই জানালার ফাঁকফোকর দিয়ে আওয়াজ ঢোকে অনায়াসে। প্রথম সিঁড়িতে পা দিয়েই জনি মাতালকণ্ঠে গেয়ে ওঠে :

আজি ধনী কেন, কেন অধোবদনে।
কথায় কথায় অভিমান প্রাণে বাঁচিনে॥
দিয়ে দোষ করেছ মান, বসনে ঢেকে বয়ান,
নিরাসনে বসে আছ আদরিণী প্রাণ,
মান ত্যজ ও সুন্দরী, আমি তোমার করে ধরি,
তোমা বিনে অন্য নারী, না হেরি নয়নে॥

ঘরের ভেতরে রূপলাল গর্জে ওঠে, 'খানকির পোলা। বেহেনচোদ শুয়োর কা লেড়কা।'

রূপালী বলে, 'চুপ থাকো বাবা। কুত্তাকে হাড্ডি চিবাতে দাও। মেজাজ গরম করো না। তোমার রূপালীর কোনো লোকসান করতে পারবে না ওই হারামি।'

জনির বাবা কোনো কন্ট্রাক্টরের নেকনজরে পড়ে দুই পয়সা কামিয়েছে। জাতে উঠেছে। পট্টি ছেড়ে জাত লুকিয়ে সাভারের দিকে বাড়ি করেছে। ওখানে জনি মাস্তানদের সঙ্গে জড়িয়েছে। পট্টির লোকরা বলে—কী একটা খুনটুনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে নাকি জনি। ওখান থেকে পালিয়ে এই ঝাউতলার মেথরপট্টিতে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু কোনো ভয়ের ছাপ জনির চেহারায় লক্ষ করা যায় না। গায়ে দিব্যি হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে। পট্টির কাউকে সে তোয়াক্কা করে না। তার বোনাই মনুলাল এই পট্টির দুজন মুখ্যের একজন। এই জনির নজর পড়েছে রূপালীর ওপর। রূপালীকে সে চিনে উঠতে পারেনি। এক দিন চোখাচোখি হতেই চোখ টিপেছে জনি। সে চোখে কাম। রূপালী সোজা তার দিকে তাকিয়ে বলে, 'দিল চনমন করে? ধড়ফড়ায় বুক?'

জনির মুখে ঝিরঝিরে হাসি। কাছে এগিয়ে গিয়ে রূপালী তর্জনী তোলে জনির দিকে। বলে, 'ওই নালা দেখেছ? গু মেশানো পানি সেখানে। মুখটা চাইপা

BanglaBook.org

ধরব ওই পানিতে।' রূপালীর চোখে আগুন। থতমত খেয়ে যায় জনি। সটকে পড়ে রূপালীর সামনে থেকে। কিন্তু জনি ভয় পেয়েছে বলে মনে হলো না। সে আরও বেপরোয়া হয়ে উঠল। সে গান পাল্টায় :

সহেনা সহেনা সখি, দুরন্ত বসন্ত জ্বালা।
চল সখি কুল ত্যাজি, অকূলে দিই প্রেমমালা।
বিলায়ে যৌবন ডালা, ঘুচাব মনের জ্বালা,
করিব আজ প্রেম খেলা, প্রেম তুফানে ভাসিয়ে ভেলা॥

জনির অত্যাচারে রূপলাল অসহায় বোধ করে। কী করবে, কোথায় যাবে ঠিক করতে পারে না। চাকরিতে তার মন টিকে না। মন পড়ে থাকে ঘরে। মনের ভেতর কু-ডাক শুনতে পায় রূপলাল। যেনতেনভাবে কাজ শেষ করে ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘরে ফেরে। মেয়ের মুখের দিকে তাকায়। রূপালীর মধ্যে অপমানের চিহ্ন খোঁজে। বাপের অসহায়তা আর উদ্বিগ্নতা টের পায় রূপালী।

বাপকে বলে, 'তুমি ভয় পাচ্ছ কেন বাপ? তোমার মেয়ের নাম রূপালী। কেটে ওই গু-মুতের নালায় ভাসিয়ে দেব।' রূপলাল আশ্বস্ত হতে পারে না। দিশেহারা রূপলাল। সর্দারজির কাছে যাবে? জমাদারকে বোঝাবে? পট্টির মানুষদের ডেকে একত্র করবে? তাতে দুর্নাম হবে রূপালীর। মেয়ের বিয়ে আটকে যাবে। তখন বড় বিপদে পড়ে যাবে রূপলাল। সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে এক দিন যোগেশের সঙ্গে দেখা করে রূপলাল। যোগেশ ঝাউতলা মেথরপট্টির মুখ্য। তাকে জনির অত্যাচারের কথা বোঝালে হয়তো একটা সুরাহা হবে। রূপলাল জানে, যোগেশের চাকরি করপোরেশনের মেইন অফিসে। সেখানেই এক দুপুরে রূপলাল উপস্থিত হয়। বলে, 'যোগেশদাদা, বড় বিপদে পড়ে তোমার কাছে এসেছি।' তারপর ধীরে ধীরে সব ঘটনা বলে যায় রূপলাল—জনির বিশ্রী গান গাওয়ার কথা, মেয়ে রূপালীর প্রতি অশ্লীল আচরণের কথা, সর্বোপরি জনি যে এই পট্টির কেউ নয়, সে কথাও বলতে ভোলে না রূপলাল। শেষে বলে, 'তুমি পট্টির মুখ্য যোগেশদা, এ-পাড়ার ভালোমন্দ দেখা তোমার কাজ।'

মনুলালের সঙ্গে যোগেশের খুব খাতির। দুজনেই মুখ্য। প্রতি সন্ধেয় মদের ভাটিতে এক টেবিলে বসে দুজনে। শ্বশুরের আশীর্বাদে মনুর হাতে ভালো টাকা। টাকার ঝনঝনানিতে মুগ্ধ যোগেশ। রূপলালের আরজিতে মুচকি হাসে যোগেশ। ধুতির গোছা নেড়েচেড়ে পেছনে গুঁজতে গুঁজতে বলে, 'দেখো রূপলাল, নিজের মেয়েকে একটু ঠিকঠাক করে রাখো। মা নাই ঘরে। কখন কী করে, তার কোনো ঠিকানা আছে? আর মনুলালের শালার কথা বলছ? দেখি মনুলালের সঙ্গে কথা বলে, কী করা যায়!'

BanglaBook.org

হতবাক হয়ে রূপলাল তাকিয়ে থাকে যোগেশের দিকে। কোথায় তাকে আশ্বস্ত করবে, তা না, উল্টো আকারে-ইঙ্গিতে মেয়ের দোষ গাইছে! বলে কিনা—মেয়েকে ঠিকঠাক করে রাখতে! তার মেয়ে বেঠিকভাবে চলে—এটাই কি বলতে চাইছে যোগেশ? মেয়ের ওপর পুরোপুরি বিশ্বাস রূপলালের। রূপালী প্রতিবাদী, ফটাফট মুখের ওপর কথা বলে ফেলে, এটা সত্যি। কিন্তু মেয়ে যে তার বেচাল চলে না—এ কথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে রূপলাল।

'তুমি কি আমার মেয়েকে দোষ দিচ্ছ দাদা?' একটু উঁচু গলায় জিজ্ঞেস করে রূপলাল।

যোগেশ বলে, 'সে রকম তো বলিনি আমি। শুধু বলেছি, মেয়েকে একটু দেখেশুনে রাখতে।'

'দেখেশুনে মানে? কী বলতে চাও তুমি যোগেশদা?' রূপলাল জিজ্ঞেস করে।

'আহা! তুমি ভুল বুঝছ কেন রূপলাল? আমি খারাপ কিছু ইঙ্গিত করছি না।' যোগেশ বলে।

যা বোঝার তা রূপলাল বুঝে ফেলে। ঝট করে বসা থেকে উঠে দাঁড়ায়। কোমরের গামছা খুলে হাওয়ায় একটা ঝটকা মারে। তারপর হনহন করে গেটের দিকে হাঁটা দেয় রূপলাল। পেছন থেকে যোগেশের উঁচু কণ্ঠ শুনতে পায়, 'তাড়াতাড়ি মেয়ের বিয়ে দাও রূপলাল। পট্টির মানুষদের একবেলা ভালো করে খাওয়াও...।' আরও কী কী যেন বলল যোগেশ, দূরে চলে আসার কারণে শেষের কথাগুলো ভালো করে শুনতে পেল না রূপলাল।

সে রাতেই রূপালীর ঘরে ঢুকল জনি। বার্ষিক মহোৎসবের প্রস্তুতিমূলক সভা বসেছিল বান্ডেলে। বান্ডেলপট্টির সামনে বড় উঠান। ওখানেই বার্ষিক মহোৎসব হয়। সর্দার গুরুচরণের ঘর ফিরিঙ্গিবাজার হলেও বান্ডেলেই সভা ডেকেছে সে। চার পল্লির সবাইকে আহ্বান জানিয়েছে সভায় উপস্থিত থাকতে। অন্যদের সঙ্গে সে সন্ধেয় রূপলালও উপস্থিত থেকেছে সভায়। সভা ভাঙতে ভাঙতে রাত গভীর হয়ে গিয়েছিল। ঝাউতলার পট্টি প্রায় পুরুষশূন্য। মেয়েরা শিশুদের নিয়ে দরজায় দরজায় খিল তুলেছে। রূপালী দরজা সামান্য ফাঁক করে বাপের পথের দিকে চেয়ে ছিল। অপেক্ষা করতে করতে একটু তন্দ্রা মতন এসেছিল। ওই সময় দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে পড়ল জনি।

মিনিট তিনেকের মধ্যে 'ও মা রে, বাবা রে, মরলাম রে' বলতে বলতে দ্রুত রূপালীর ঘর থেকে বেরিয়ে এল জনি। পরদিন সকালে সবাই দেখল—জনির ডান হাতের তালুতে ব্যান্ডেজ। বঁটির কোপে দুফালা হয়ে গেছে তালু। গলার বাহারি রুমাল ডান হাতের তালুতে জড়ানো। ওই সন্ধেয় সালিস বসল

BanglaBook.org

ঝাউতলার পট্টিতে। চারটা পট্টি থেকে মুখ্যরা এল, গণ্যমান্যরা এল। জবানবন্দি নেয়া হলো দুজনের। নিচতলার অন্যান্য ঘরের নারীরা জনির বেলেল্লাপনার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিল। দোষী সাব্যস্ত হলো জনি। সবাই সর্দারের দিকে তাকাল। গম্ভীর মুখে গুরুচরণ বলল, 'শাস্তি পেতে হবে জনিকে। মুখ্যের শালা হলেও রেহাই নেই। জঘন্য অপরাধ। মাথা মুড়িয়ে দাও। আগামী সকালে যাতে জনিকে এই পট্টিতে দেখা না যায়।'

কুমারী মেয়ের সতীত্বহানির চেষ্টা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। সর্দারের রায়ের বিরুদ্ধে কেউ প্রতিবাদ করতে সাহস পেল না। মনুলাল মাথা নিচু করে রইল। সে জানে—প্রতিবাদ করলে আরও বড় শাস্তি তার মাথার ওপর নেমে আসবে। একঘরে করা হবে তাকে। জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠবে তখন। তা ছাড়া প্রতিবাদ করবে কার জন্য? ওই হারামজাদা জনির জন্য? কুত্তার বাচ্চা হারামি, কী একটা লটঘট বাঁধিয়ে ঢাকা থেকে পালিয়ে এসেছে। এখানে পালিয়ে এসেও সোজা হয়নি। মুখ পোড়াল আমার! সমাজের সামনে মাথা হেঁট করালো! হঠাৎ মনুলাল চিৎকার করে উঠল, 'রূপলালের মেয়ে চনুটা কেটে নিল না কেন হারামজাদার?' তারপর কণ্ঠটাকে একটু নিচু করে বলল, 'সর্দারের বিচারের ওপর কথা নেই। মাথা চেঁছে দেয়া হোক হারামখোরের।'

সর্দার গুরুচরণের রায় কার্যকর হলো সেই সভাতেই। বিচারসভা ভাঙার মুখে রূপলালকে উদ্দেশ্য করে গুরুচরণ বলল, 'তাড়াতাড়ি মেয়ের বিয়ে দাও রূপলাল।'

হরিজন-সমাজ পুরুষশাসিত। সেই সমাজের ক্ষমতাধর ব্যক্তিটি হলো সর্দার। মুখ্যরা তার পরামর্শক। সহায়ক শক্তিও। নারীরা এই সমাজে সত্যিই অবলা। দুর্বল অর্থে যেমন, নির্বাক অর্থেও তেমনি। নারীদের বাসনার তেমন কোনো বাস্তবায়ন হয় না এ সমাজে। প্রয়োজন বোধ করলে পুরুষরা নারীদের পরামর্শ নেয়, তবে সেই পরামর্শের বাস্তবায়ন পুরুষদের ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে। বহু বহুকাল আগে থেকে হরিজন-নারীরা পুরুষদের ওপর নির্ভরশীল নয়। উপার্জনও করে তারা। কিন্তু উপার্জনে হাত বাড়ায় পুরুষরা। পুরুষরা মানে স্বামীরা। মদ-জুয়া আর দেনায় ডুবে থাকে পুরুষ মেথররা। ফলে স্ত্রীর আয়ে থাবা দেয় ওরা। কিন্তু নারীরা সংসারমুখী। সন্তানের সুখ-দুঃখ আর ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তায় তারা ভয়ার্ত থাকে। সাবধানে খরচ করে নিজের আয়। কিন্তু কাবুলিওয়ালার মতো পুরুষরা নারীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাড়ে অশান্তি। নির্যাতিত হয় বিবাহিত নারীরা। ঝগড়াঝাঁটি, মারামারি ইত্যাদিতে মুখর থাকে প্রায় প্রতিটি পরিবার। পরিবারে অশান্তি আর অভাব

BanglaBook.org

যা-ই থাকুক না কেন, কুমারী মেয়েদের ব্যাপারে মেথরসমাজ খুবই সতর্ক এবং সংবেদনশীল। প্রত্যেক কুমারী মেয়ে মেথরসমাজের এক একটি দামি মুক্তা। এই মুক্তার সবচেয়ে মূল্যবান অংশ তাদের শারীরিক পবিত্রতা। এই পবিত্রতা ক্ষুণ্ন হওয়াকে তারা জঘন্য অপরাধ মনে করে। কিন্তু সমাজে মাঝেমধ্যে এই অপরাধ যে সংঘটিত হয় না, তেমন নয়। এ ক্ষেত্রে মেয়ে ও ছেলে দুজনেই অবিবাহিত হলে বিয়ে করিয়ে দেয়ার রেওয়াজ আছে। কিন্তু সমাজে এ ব্যাপারে জোরাজুরির কোনো স্থান নেই। কোনো পুরুষ যদি জোর করে কোনো নারীর দিকে লালসার হাত বাড়ায় এবং নারী তা প্রত্যাখ্যান করে আর ব্যাপারটি সমাজে জানাজানি হয়ে যায়, তখন খরতর খড়্গ নেমে আসে পুরুষটির ঘাড়ে। রূপালীর ক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছে।

কিন্তু গুরুচরণের মনে হয়েছে—রূপালী মেয়েটির মা নেই, বাবা অধিকাংশ সময় ঘরের বাইরে থাকে। তাই রূপালীর যত শিগগির সম্ভব বিয়ে হয়ে যাওয়া দরকার। স্বামীই তার ভবিষ্য-নিরাপত্তা বিধান করবে। গুরুচরণের কথায় রূপলাল পরদিন থেকেই মরিয়া হয়ে উঠল। শেষমেশ সে খুঁজে পেল বাল্লুর শ্যালিকার ছেলেকে। ইন্দললাল। জন্ম দেয়ার পরপরই ইন্দলের মা মারা যায়। বাপ ছিল পাঁড়মাতাল। মত্ত অবস্থায় টাট্টিখানার টাঙ্গি সাফ করতে নেমে বিষাক্ত গ্যাসে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। তখন ইন্দলের বয়স চার বছর। বাল্লুর স্ত্রী, সন্তানহীন কোকিলা ইন্দলকে নিয়ে আসে নিজের কাছে। সেই থেকে আজ অবধি বাল্লু-কোকিলার সঙ্গে থাকে ইন্দল। ইন্দললাল এখন বিয়েযোগ্য। রূপলাল প্রস্তাব নিয়ে গেলে বাল্লু এককথায় রাজি হয়ে যায়। কিন্তু রূপলাল যখন ঘরজামাইয়ের প্রস্তাব দেয়, কোকিলা বেঁকে বসে। পুত্রহীনা এই নারীটি ইন্দলকে পাওয়ার পর থেকে এই বাসনা নিজের মধ্যে লালন করে এসেছে যে একদিন ইন্দলের বউ ঘরে আসবে। সেই বউকে নিয়ে অঞ্জলিদিদির মতন সংসার সাজাবে। নাতি-পোতারা তার চারদিকে কিলবিল করবে। ইন্দল, তার বউ, তাদের সন্তান-সন্ততি দিয়ে সে পুত্র-হারানোর হাহাকার ভুলে থাকবে। আজ রূপলাল এসেছে সেই বাসনায় হিমশীতল জল ঢেলে দিতে? তা হবে না, তা হতে দেবে না কোকিলা।

কোকিলা বলে, 'তোমার প্রস্তাব আমি মানতে পারলাম না রূপলালদা। তোমার মেয়ে সুন্দরী—এ কথা মানি। কিন্তু ছেলে আমার তোমার ঘরে চলে যাবে, তা হবে না।'

'দেখো দিদি, আমার ঘরে বউ নেই, রূপালী ছাড়া অন্য কোনো সন্তান নেই। মেয়ে আমার তোমার ঘরে চলে এলে আমার কী অবস্থা হবে ভেবে দেখেছ? রান্না

BanglaBook.org

করার কেউ থাকবে না, কথা বলার কেউ থাকবে না। আমার কষ্টটা একটু বুঝবার চেষ্টা করো দিদি।' অনুনয়ের সুরে কথাগুলো বলে রূপলাল।

কোকিলা কিছুক্ষণ চুপ মেরে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে বলে, 'তুমি তোমার দিকটা বললে, আমাদের দুজনের দিকটা ভেবে দেখেছ দাদা? ছেলেটি গাড়িচাপা পড়ে মারা গেল। পরে আমাদের কোনো সন্তান হলো না। পাগল হয়ে গিয়েছিলাম আমি। এই লোকটি আমাকে বুকের বাঁধনে জড়িয়ে রেখেছিল সেদিন।'

পাশে বসা বাল্লু বলে উঠল, 'থাক না কোকিলা, ফেলে আসা কষ্টের কথা আজ আর না-ই বা বললে!'

'আমাকে আজকে একটু বলতে দাও। বোনের ছেলেটাকে পেয়ে আমি স্বপ্ন দেখা শুরু করলাম। সর্দারজির বউ অঞ্জলিদি সে সময় আমাকে কত সান্ত্বনা দিয়েছে! ইন্দল বড় হলো। আমি আর ও নিজের ছেলের মতন ইন্দলকে বুকে টেনে নিলাম।' বলল কোকিলা।

রূপলাল চুপসে যায়। কী করবে এখন সে? ঘরে তরুণী যৌবনবতী কন্যা। অরক্ষিত। মেয়ে বাল্লুদের ঘরে চলে গেলে একাকিত্ব তাকে গ্রাস করবে। একদিকে মেয়ের নিরাপত্তা, অন্যদিকে নিজের একাকিত্ব ও অসহায়তা। কোনটাকে বেছে নেবে ঠিক করতে পারে না রূপলাল। তা ছাড়া মেয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে গেলে আর সে মারা গেলে ঘরটি করপোরেশন নিয়ে নেবে। টাকা খেয়ে জমাদার ও তার তাঁবেদাররা অন্যজনকে বরাদ্দ দিয়ে দেবে ঘরটি। মেথর যে সে-ঘরের বরাদ্দ পাবে, তা নয়। কোনো জলদাস বা হাঁড়ি বা নীচু জাতের হিন্দু ঘুষ দিয়ে এই ঘরের মালিক হবে। ওরা মেথরদের চাকরি কেড়ে নিচ্ছে, কেড়ে নেবে ঘর। তা হবে না, তা হতে দেবে না রূপলাল। রূপলাল এবার বাল্লুকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'দেখো বাল্লুদা, সরকার আমাদের জন্য মাত্র দুইটা ঘর বরাদ্দ দিয়েছে—রান্নাঘর আর একটা থাকার ঘর। দেখে আসছি, ছেলের বিয়ে দিয়ে মা-বাবা রান্নাঘরে ঢোকে। ইন্দলকে বিয়ে করালে তোমাদেরও একই দশা হবে। আমি একা মানুষ। মেয়ে আর জামাই শোবার ঘরে থাকবে। আমি এখানে-ওখানে রাত কাটিয়ে দিতে পারব। আমার মরার পর ওই ঘরের মালিক হবে রূপালী অর্থাৎ ইন্দল। তা ছাড়া ঝাউতলা থেকে বান্ডেল বেশি দূরে নয়। যখন ইচ্ছা তখন ওরা তোমাদের দেখভাল করতে আসতে পারবে। তাদের ইচ্ছার ওপর কোনো বাধা দেব না আমি। শুধু আমার চোখের সামনে ওরা নড়াচড়া করবে। এই দেখে দেখে আমি মরতে চাই।' বলতে বলতে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল রূপলাল।

বাল্লু করুণ চোখে একবার রূপলালের দিকে, আরেকবার কোকিলার দিকে তাকাতে লাগল। কী বলবে বুঝে উঠতে পারছিল না সে। কোকিলা তাকে দোটানা

BanglaBook.org

থেকে বাঁচাল। বলল, 'আমাকে দু-চার দিন সময় দাও দাদা। ভেবে দেখি। কথা বলি ইন্দলের সঙ্গে। অঞ্জলিদিদির সঙ্গেও কথা বলতে হবে আমাকে।' তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বলল, 'দু-চার দিন সময় দাও আমাকে।'

সেদিন রূপলাল আর কথা বাড়ায়নি। বাল্লু-কোকিলাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বিদায় নিয়েছিল রূপলাল। তবে কোকিলার মতামতের জন্য দু-চার দিন একেবারে নিষ্ক্রিয় বসে থাকেনি রূপলাল। দেখা করেছে সর্দারজির সঙ্গে, কথা বলেছে সর্দারস্ত্রী অঞ্জলির সঙ্গে। মনের বাসনা বুঝিয়েছে তাদের। বলেছে, 'মেয়েটি চলে গেলে বড় একা হয়ে যাব আমি! একা-জীবন ভীষণ কষ্টের! তুমি এই কষ্টের হাত থেকে আমাকে বাঁচাও সর্দার।' আর অঞ্জলিকে বলছে, 'ছেলেটিকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে। রূপালীর উপযুক্ত সে। ইন্দলের হাতে রূপালীকে তুলে দিতে পারলে তৃপ্তিতে চোখ বুঝতে পারব আমি। অঞ্জলিদিদি, তুমি যদি কোকিলাদিকে রাজি করাও, তাহলে অনেক উপকার হয় আমার।'

কোকিলা অঞ্জলির কাছে কথাটি পাড়ল এক দিন। সেই যে দুজনে একসঙ্গে কাজ করার অনুমতি পেয়েছিল একদিন, সেই অনুমতি এখনো অব্যাহত আছে। জমাদার বদলেছে, কিন্তু অনুমতি বদলায়নি। দুজনে এখনো রাস্তা সাফ করে। কখনো স্ট্র্যান্ড রোডে, কখনো ঘাট ফরহাদবেগে, কখনো টেরিবাজারের আফিমের গলিতে, আবার কখনো কোতোয়ালির সামনে। সেদিন দুজনে কাজ করছিল লালদীঘির পূর্বপাড়ে। জেলখানার গেইটসংলগ্ন রাস্তা সাফাইয়ের দায়িত্ব পড়েছিল দুজনের ওপর। ভোর-সকালে কাজে হাত লাগিয়েছিল। ডান্ডাওয়ালা ঝাড়ু দিয়ে রাস্তার বালু সাফ করতে করতে হয়রান হয়ে গিয়েছিল তারা। জেলখানার গেইটে বড় আমগাছ। গাছতলায় বসে পড়েছিল দুজনে, পাশাপাশি। আকাশ মেঘলা মেঘলা। জ্যৈষ্ঠের ঝাঁজ কমে এসেছে অনেকটা। আষাঢ় আসি আসি করছে। দমকা শীতল বাতাস বইছে মাঝেমধ্যে। দুজনের ঘর্মাক্ত শরীরে এই হাওয়া স্বস্তি জাগাচ্ছে।

কোকিলাই শুরু করল প্রথমে, 'দিদি, ইন্দলের বিয়ের প্রস্তাব এসেছে শুনেছ?'

'তোমার তো সৌভাগ্য। হরিজন-সমাজে বরপক্ষই প্রস্তাব নিয়ে আসে, তোমার কাছে এসেছে মেয়েপক্ষ। তো, বিয়ে করাতে রাজি হচ্ছো না কেন?' জিজ্ঞেস করে অঞ্জলি।

কোকিলা গোল গোল চোখ করে তাকায় অঞ্জলির দিকে, 'তুমি জানলে কী করে?'

অঞ্জলি হাসতে হাসতে বলে, 'সর্দারের বউ না আমি? সর্দার জানে না, এ রকম ঘটনা আছে এই পট্টিতে? সর্দার জানলে তো আমিও জানব, কী বলো?'

BanglaBook.org

তারপর দুজনের মধ্যে অনেক কথা হলো। অনেক যুক্তিতর্ক, অনেক ভয়, অনেক শঙ্কা, অনেক তৃপ্তি, অনেক আনন্দ, অনেক বেদনার কথা বলাবলি হলো দুজনের মধ্যে। শেষে অঞ্জলি বলল, 'রূপলালকে ফিরাইও না কোকিলাদি। শুনেছি, মেয়েটি ভালো। ছেলে তোমার উপযুক্ত। ছেলের জন্যই একটা ঘর পাচ্ছ ঝাউতলাতে। ওখান থেকে যাতায়াত করবে ওরা। ছেলে বিয়ে করিয়ে বউ পাবে, ঘর পাবে। দেখছ না, আমরা, শিউচরণরা আর রামগোলাম কী ঠাসাঠাসি করে জীবন কাটাচ্ছি? তা-ও বুদ্ধি করে বারান্দায় নাতির জন্য সর্দার ব্যবস্থা করেছিল বলে?'

কোকিলা বলে, 'শুনেছি দিদি, তোমাদের রামগোলাম বড় পাস দিয়েছে। সে নাকি সর্দারের মতো আমাদের কথা ভাবে? বড় আনন্দ লাগছে দিদি, সর্দারের ঘরে আরেক সর্দারের জন্ম হচ্ছে।'

অঞ্জলি বলে, 'ঈশ্বরকে বলো কোকিলাদি, আমাদের রাম যেন মেথরসমাজকে না ভোলে।'

তারপর রূপালীর সঙ্গে ইন্দলের বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের কিছুদিনের মাথায় মারা গেল রূপলাল। বাপের ঘরেই দাম্পত্যজীবন শুরু করল রূপালী।

মেথরপট্টির ছোট ছোট ঘরে ইন্দল-রূপালীর মতো অনেকের দাম্পত্যজীবন শুরু হয়, অনেকের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। কেউ সুখে জীবনযাপন করে, কেউ ঝগড়া-ফ্যাসাদে মগ্ন থাকে। কেউ মদে সুখ খোঁজে, কেউ মন্দিরে দুঃখ জমা রাখে। কেউ ব্যক্তিস্বার্থ বড় করে দেখে, কেউ সামষ্টিক স্বার্থে আনন্দ পায়। কেউ নিজের কথা ভাবতে ভাবতে দিশেহারা হয়। কেউ দিশেহারা-সমাজের মঙ্গলের জন্য নির্ভয়ে এগিয়ে চলে ভয়াল বিপদের দিকে।

BanglaBook.org

দশ

আগু-পিছু হাঁটতে হাঁটতে সেই দুপুরে গুরুচরণ, কার্তিক আর রামগোলাম বড় সাহেবের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। ভেতরে ঢুকতে চাইল তারা। বাধা দিল ইউসুফ, ছালাম সাহেবের খাস পিয়ন। বলল, 'দেখা করা যাবে না এখন, সাহেব

ব্যস্ত। ফাইলে সাইন করতে করতে হয়রান। আজ হবে না। অন্যদিন এসো।'

কার্তিক বলল, 'অন্যদিন হলে চলবে না। আজই দেখা করতে হবে।'

ইউসুফ বলল, 'বললাম তো, দেখা হবে না।' স্বগত কণ্ঠে বলল, 'বেটা লাট সাহেবের বাচ্চা। আজই দেখা করতে হবে!'

এবার গুরুচরণ বলল, 'ইউসুফভাই, বড় সাহেবের সঙ্গে আমাদের দেখা করা জরুরি। মরা-বাঁচার প্রশ্ন। বাধা দিয়ো না।'

এবার ভদ্রবেশের ভেতর থেকে ইউসুফের আসল চেহারা বেরিয়ে এল। বলল, 'বাধা দিলে করবা কী?'

কার্তিক এবার উত্তপ্ত কণ্ঠে বলল, 'করব কী মানে, জোর করে ঢুকব।'

'অই মেথরের বাচ্চা, ঢুক তো দেখি, তোর কইলজায় গুর্দা কেমন দেখি।' একটু থেমে ইউসুফ আবার বলল, 'আর অই বেটা মেথরের সর্দার, আমারে ডাকে ভাই! আমি মেথরের ভাই হলাম কেমনে রে বেটা?'

রামগোলাম ধীরে পায়ে ইউসুফের সামনে এগিয়ে এল। একেবারে ঠান্ডা গলায় বলল, 'ইউসুফ সাহেব, আপনি বললেন, বড় সাহেব কাজে ব্যস্ত। আমি উঁকি দিয়ে দেখলাম, তিনি চেয়ারে হেলান দিয়ে ঘুমাচ্ছেন। ঘুমানোকে ব্যস্ততা বলে নাকি?'

'তুই কে রে?' রামগোলামের দিকে লালচোখ মেলে জিজ্ঞেস করে ইউসুফ। রামগোলাম শীতল কণ্ঠে বলে, 'আমার পরিচয় পরে, আগে বলেন ভেতরে যেতে দেবেন কি না?'

ইউসুফ রামগোলামের ভঙ্গি দেখে ভড়কে যায়। তার পরও কণ্ঠে জোর রেখে বলে, 'যদি না দিই, কী করবে?'

এই সময় কার্তিক হুংকার দিয়ে ওঠে। বলে, 'কী করে বাধা দাও দেখি?' বলে দরজার দিকে ছুটে আসে কার্তিক।

কার্তিকের হুংকারে ছালাম সাহেবের তন্দ্রা ছুটে যায়। ধড়ফড় করে চেয়ারে সোজা হয়ে বসেন তিনি। উঁচু গলায় জিজ্ঞেস করেন, 'কী হইছেরে ইউসুফ? কারা কথা বলে?'

বাঁ হাতের ইশারায় গুরুচরণদের দাঁড়িয়ে থাকতে বলে দ্রুত পায়ে ভেতরে যায় ইউসুফ। বলে, 'মেথররা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায় স্যার।'

'মেথররা মানে?' আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে জিজ্ঞেস করেন আবদুস ছালাম।

'এই স্যার, মেথরের সর্দার গুরুচরণ না মুরুচরণ? ওর সঙ্গে আবার চ্যালাও আছে দুইজন।' ইউসুফের মনে রাগ তখনো গর্জাচ্ছে।

BanglaBook.org

'অ আচ্ছা, তুই একটা কাজ কর ইউসুফ। জমাদার হারাধনকে ডেকে আন। আর ওদের ভেতরে আসতে দে।' ছালাম সাহেব গম্ভীর কণ্ঠে বললেন।

গুরুচরণরা ভেতরে আসে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঢোকেন হারাধন জমাদার। ধুতির ওপর তিন পকেটের ফতুয়া। সাদা ফতুয়ার দুই পাশে দুটো জেব। বুকের বাঁ পাশে একটা। ওই বুকপকেটে বাহারি ঘড়ি। বুকপকেটের তলায় ঘড়িপকেট। চিকন চেইনে ঘড়িটি বাঁধা। চেইনের এক মাথা বোতামের সঙ্গে আটকানো, ঘড়িসমেত অন্য মাথা ঘড়িপকেটে। কিছুক্ষণ পর পর পকেট থেকে ঘড়ি বের করেন হারাধনবাবু। ওটাই তাঁর মুদ্রাদোষ। পানের কষে দাঁতের গোড়ায় গোড়ায় জং ধরেছে। জিহ্বায় পুরু আস্তর। জর্দার ভুরভুরে গন্ধ মুখে। কিছুক্ষণ পর পর নাক ঝাড়েন। এত কিছুর পরও ছালাম সাহেব হারাধনবাবুকে কাছে রাখেন। হারাধন বড় ধুরন্ধর। মেথরদের ঘায়েল করার জন্য হারাধনের মতো একটা মাথা থাকলে যথেষ্ট।

কাছে এলে ছালাম সাহেব প্রথমে চোখ তোলেন রামগোলামের দিকে। চোখে জিজ্ঞাসা—এ কে? গুরুচরণের পোড়খাওয়া চোখ। বড় সাহেবের চোখের ভাষা বুঝতে দেরি হয় না। তাড়াতাড়ি বলে, 'আমার নাতি স্যার, রামগোলাম। গত বছর ম্যাট্রিক পাস করেছে স্যার।'

'অ...।' বলে চুপ মেরে যান ছালাম সাহেব। বাঁ পাশে, একটু পেছনে হারাধনবাবু দাঁড়ানো।

'তো, কী জন্য এসেছ তোমরা বড় সাহেবের কাছে?' ধূর্ত চোখ গুরুচরণের ওপর রেখে জিজ্ঞেস করেন হারাধন বাবু।

গুরুচরণ ভূমিকা ছাড়া বড় সাহেবকে উদ্দেশ্য করে বলে, 'হুজুর, আমাদের চাকরি নাকি এখন থেকে সবাই করতে পারবে? নোটিশ জারি করেছেন আপনি?'

'হ্যাঁ, করেছি নোটিশ জারি।' নিস্পৃহ কণ্ঠে ছালাম সাহেব বলেন।

গুরুচরণ অনুনয়ের সুরে বলে, 'আমরা মাঠে মারা যাব হুজুর। মেথর আমরা, অন্য কোনোখানে চাকরি করার সুযোগ নেই আমাদের। হিন্দু-মুসলমান সবার জন্য খুলে দিলে এই চাকরিতে ঝাঁপিয়ে পড়বে সবাই। না খেয়ে মারা পড়ব আমরা। আমাদের ওপর...।'

গুরুচরণকে কথা শেষ করতে দেন না হারাধনবাবু। বলেন, 'স্বাধীন দেশ এটি। সব চাকরিতে জাতপাত-নির্বিশেষে সবার সমান অধিকার। শুধু মেথরের জন্য নির্ধারিত কোনো চাকরি নেই এখন এ দেশে।'

'ছিল। একসময় ছিল। ব্রিটিশ আমলে ছিল, পাকিস্তান আমলে ছিল।

BanglaBook.org

এমনকি বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার প্রথম দিকেও ছিল। এ কাজ শুধু মেথরদের—এই রকম ওয়াদা করে আমাদের পূর্বপুরুষদের আনা হয়েছিল এ দেশে। যুগ যুগ ধরে আমাদের বাপদাদারা কাঁধে-মাথায় করে গু-মুত টেনেছে। আজকে স্যানিটারি পায়খানা হয়েছে। তাই বলে কি আমাদের চাকরি কেড়ে নেবেন এখন?' রামগোলাম ধীরে ধীরে বলে গেল।

সদ্য তরুণটির কথা শুনে ছালাম সাহেব তার দিকে বিস্মিত চোখে তাকিয়ে থাকলেন। বলে কী ছোকরা? একেবারে ব্রিটিশ আমলের ইতিহাস আওড়ে যাচ্ছে!

হারাধনবাবুও বুঝলেন—রামগোলাম বুদ্ধি রাখে। চোখ রাঙিয়ে নয়, বুদ্ধি দিয়ে খেলতে হবে এর সঙ্গে। বললেন, 'দেখো, দেশের জনসংখ্যা বেড়েছে; ছোট-বড় চাকরির ওপর চাপ আসছে। আবর্জনা সাফাইয়ের কাজ এখন কেউ ছোট কাজ বলে মনে করছে না। তাছাড়া, ওদেরও তো বাঁচতে হবে? ওই চাকরিতে তোমাদের দাবি থাকবে বেশি। অন্য জাতের দু-চারজন তোমাদের এ চাকরি নিলে ক্ষতি কী?'

রামগোলাম বলে, 'আপনি হিন্দু মানুষ। আপনাদের পূজা করেন ব্রাহ্মণ, তাই না?'

'হ্যাঁ।' হারাধনবাবু বললেন।

'ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কেউ তো পূজা করাতে পারে না, তাই না? কেন অন্য কেউ পূজা করাতে পারে না? এটা রেওয়াজ, শাস্ত্রীয় বিধান। পূজায় ব্রাহ্মণদের অধিকার। এই অধিকার যুগ যুগ ধরে অক্ষুণ্ন আছে হিন্দুসমাজে। মেথররা গু-মুত সাফ করবে, আবর্জনা পরিষ্কার করবে—এটাও শাস্ত্রীয় এবং রাষ্ট্রীয় বিধান। ব্রাহ্মণদের পূজা করানোর অধিকার যদি কেড়ে নেয়া না যায়, তাহলে মেথরদের চাকরি কেড়ে নেয়ার ব্যবস্থায় সায় দিচ্ছেন কেন আপনি?' রামগোলাম বলল। হারাধনবাবু চোখ ছানাবড়া করে রামগোলামের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

ওই সময় নতুন একটা কণ্ঠস্বরে চমকে তাকাল সবাই। দেখল—গুরুচরণের পেছনে যোগেশ দাঁড়িয়ে আছে। বলছে, 'কী যে বলো না রামগোলাম! কোথায় ব্রাহ্মণ আর কোথায় আমরা! জমাদারবাবুর সঙ্গে কুতর্ক করো না। চাকরি তো আমাদের যাচ্ছে না! দু-চারজন না-হয় চাকরিতে ঢুকল।'

কার্তিক আহত বাঘের মতো গরগর করে উঠল, 'বেইমান, মীরজাফর এসে গেছে!'

কার্তিকের গালাগাল গায়ে মাখল না যোগেশ। বিনীত ভঙ্গিতে ছালাম সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি কি ভুল বলেছি হুজুর?'

'না, তুমি ভুল বলোনি। তোমার লোকদের বোঝাও তুমি। সরকারের চাপ

BanglaBook.org

আছে আমার ওপর। অন্য জাতের লোকদেরকেও এই চাকরি দিতে হবে আমাকে।' বললেন আবদুস ছালাম।

গুরুচরণ বলল, 'তাহলে আমরা কোথায় যাব?'

'বড় সাহেব কি তোমাদের চাকরি কেড়ে নিচ্ছেন?' হারাধনবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

'আমাদের চাকরি কেড়ে নিচ্ছেন না! শুধু আমাদের ছেলেমেয়েদের পেটে লাথি মারছেন আপনারা। তাদের চাকরি কেড়ে নেয়ার ব্যবস্থা করছেন।' বলল কার্তিক।

রামগোলাম বলল, 'এই গু-মুত আর আবর্জনা টানার কাজ ছাড়া আমাদের অন্য কোনো কাজ নেই। লেখাপড়া জানলেও অন্য কোনো কাজ দেন না আমাদের। ওদের জন্য সব চাকরির দরজা খোলা। আমাদের জন্য একটা ছাড়া সব দরজা বন্ধ। যেটা খোলা, সেটাতে ভেতর থেকে খিল তুলতে চাইছেন আপনারা।'

ছালাম সাহেব বললেন, 'এটা করপোরেশনের সিদ্ধান্ত। সবার জন্য এ চাকরি খুলে দেয়া হয়েছে। শুধু তোমরাই এ চাকরির দাবিদার হবে কেন?'

গুরুচরণ দৃঢ়কণ্ঠে বলল, 'এ চাকরি শুধু আমাদের। আমাদের দাবি না মানলে আন্দোলনে নামব আমরা।'

চোখ-মুখ কুঁচকে গর্জন করে উঠলেন ছালাম সাহেব, 'আন্দোলন করবে? স্ট্রাইক করবে তোমরা?'

গুরুচরণ ঠান্ডা গলায় বলল, 'হ্যাঁ, কাজ বন্ধ করে দেব আমরা। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন করে যাব।'

'আহা সর্দারজি, বড়সাহেব আর জমাদারবাবুর সামনে এসব কী বলছ তুমি? মাথা ঠিক রেখে কথা বলো।' যোগেশ বলে।

কার্তিক বলে, 'সর্দারজির মাথা ঠিক আছে। তোমার মাথা ঠিক করো বিভীষণ। তুমি হলে রাবণবংশের বিভীষণ, বেইমান। তোমাকে আমরা দেখে নেব।'

কার্তিকের ঔদ্ধত্য দেখে ছালাম সাহেবের মাথা গরম হয়ে উঠল। বললেন, 'কী, কী বলছ তুমি মেথরের বাচ্চা। দেখে নেবে? কাকে দেখে নেবে তুমি?'

'হুজুর, আমরা তো মেথরের বাচ্চাই। অস্বীকার তো করি না। ব্রাহ্মণ-কায়স্থ বলেও দাবি করি না। আপনারা কালাকানুন চালু করে প্রমাণ করতে চাইছেন, অন্য জাতের মানুষরাও মেথরের বাচ্চা। কারণ, মেথররাই শুধু গু-মুত টানার কাজ করে।' রামগোলাম বলে।

BanglaBook.org

হতভম্ব হয়ে যান ছালাম সাহেব। তার মুখ দিয়ে কথা সরে না। তিনি কী বলবেন, ঠিক করতে পারেন না। ওই সময় ছালাম সাহেবের কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে কিছু কথা বলেন হারাধনবাবু।

হারাধনবাবুর কথা চোখ বন্ধ করে শুনলেন ছালাম সাহেব। কথা শেষ হলে হারাধনবাবু সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। কিন্তু ছালাম সাহেব চোখ খুললেন না। কিছুক্ষণ পর চোখ খুললেন তিনি। দেখা গেল—তার চোখ-মুখ থেকে একটু আগের রাগের চিহ্ন একেবারেই তিরোহিত হয়ে গেছে। শান্ত চোখে কিছুক্ষণ রামগোলামের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর গুরুচরণের দিকে তাকিয়ে আবার রামগোলামের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। বললেন, 'কী যেন নাম বলেছিল তোমার? রামগোলাম, মনে পড়েছে রামগোলাম। তোমার নামের মধ্যে বিচক্ষণতা লুকিয়ে আছে। হিন্দু আর মুসলমান কালচার মিশে আছে তোমার নামে। নামের মতোই বিচক্ষণ তুমি। বয়সের তুলনায় তুমি অনেক বুদ্ধিমান। তোমার যুক্তি বেশ চমৎকার। কী বলেন হারাধনবাবু, রামগোলামের যুক্তির সামনে আপনি তো একেবারে চুপসে গেলেন।'

হারাধনবাবু টাকমাথা চুলকে বললেন, 'অসুরকুলে প্রহ্লাদ স্যার। ওকে একটা ভালো চাকরি দিয়ে দেন করপোরেশনে। এ রকম চালাক-চতুর ছেলে দরকার স্যার আপনার।'

যোগেশ আকাশ থেকে পড়ল। বলে কী বেটা! চুলটা শুধু শুধু পেকেছে দেখছি হারাধনবাবুর। শুনেছি বুদ্ধিমানের টাকমাথা হয়। এই কায়স্থ বেটার দেখি গোবরে ভরা মাথা। কাঁচা গোবরের ঝাঁজে মাথার মাঝখানের চুল পড়ে গেছে। সেই মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে শালারপুত কী পরামর্শ দিচ্ছে বড় সাহেবকে! এমনিতেই করপোরেশনের বিরুদ্ধে আন্দোলন পেকে উঠেছে হরিজনপল্লিগুলোতে। সর্দারই তাদের পথ দেখাচ্ছে, উসকে দিচ্ছে। আর হারাধইন্যা প্রস্তাব দিচ্ছে ওই লিডারের নাতিকে চাকরি দিতে? নিজেকে আর সামলে রাখতে পারল না যোগেশ। বলে ফেলল, 'কী যে বলেন জমাদারবাবু! রামগোলামের বয়স আর কত? কোমল শরীর তার। আবর্জনা টানার মতো কষ্টের কাজ সে করতে পারবে না।'

'তুমি থামো যোগেশ। আমাদের কথায় নাক গলিও না। কার শরীর কোমল আর কার শরীর কঠিন—সেটা বিবেচনা করবেন আমাদের বড় সাহেব। মাঝখানে তুমি কথা বলো না।' যোগেশকে উদ্দেশ্য করে হারাধনবাবু ধমকে উঠলেন।

'না, বলছিলাম কী আন্দোলন করার পাঁয়তারা করছে এরা। আর তাদেরকেই

BanglaBook.org

এত বড় উপহার!' যোগেশ হারাধনবাবুর ধমকে ভড়কে গেল না।

পেছন থেকে গর্জন করে উঠল কার্তিক, 'হারামখোর যোগেইশ্যা, এতদিন চুপে চুপে তুই হরিজন-সমাজের ক্ষতি করছস, আজ প্রকাশ্যে বিরোধিতা! দেখে নেব আমি তোকে।'

যোগেশ কাঁচুমাচু মুখ করে হারাধনবাবুর দিকে তাকায়। তার চোখে ত্রাসের চেয়ে ষড়যন্ত্রের ছায়া যেন। তারপর একটু গলা খাঁকারি দিয়ে বলে, 'তুমি আমাকে প্রকাশ্যে হুমকি দিচ্ছ কার্তিক। হারাধনস্যার আর বড়বাবু সাক্ষী রইলেন। আমি তো ভুল কথা বলিনি। লেখাপড়া জানা ছেলে, সে কেন এসে অশিক্ষিত মেথরদের সঙ্গে গু-মুত টানবে?'

'আর আন্দোলন করার ষড়যন্ত্র করছি ভেতরে ভেতরে—এ কথা তুমি লাগাচ্ছ বড় সাহেবকে। আমরা যদি ষড়যন্ত্র পাকাতাম, তাহলে এখানে আসতাম না। আমরা যা করব, তা প্রকাশ্যে জানিয়ে দিলাম আজ। এখানে তো লুকোচুরির কিছু নেই।' এতক্ষণ চুপ থাকা গুরুচরণ যোগেশকে উদ্দেশ্য করে বলল।

হারাধনবাবু বুকপকেট থেকে ঘড়িটা বের করলেন। মনোযোগ দিয়ে ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। বললেন, 'বড় সাহেব যে রামগোলামকে গু-মুত টানার চাকরি দেবেন—তা তুমি বুঝলে কী করে যোগেশ? এই অফিসেও তো চাকরি দিতে পারেন?' এ কথা শুনে গুরুচরণের চোখ ঝিলিক দিয়ে উঠল। তৃপ্তির আভা তার সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল। সেটা ধুরন্ধর হারাধনবাবুর চোখ এড়াল না। নিস্পৃহ কণ্ঠে হারাধনবাবু বলে যেতে লাগলেন, 'কার্তিকের মাথা একটু গরম। ও তোমাকে এমনি এমনি ভয় দেখাচ্ছে। ও তোমাকে তো আর খুন করবে না? আর হ্যাঁ, গুরুচরণ এত আন্দোলন-ফান্দোলনের কথা বলছ কেন? বড় সাহেবের কাছে এসেছ, তোমাদের দাবির কথা বলেছ। তিনি কী করেন দেখো।' তারপর একটা ফাঁকা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। নিবিড় কণ্ঠে বললেন, 'তোমাদের কত আন্দোলন হলো, থামল। তোমরা না জানতে পারো, রামগোলাম হয়তো জানবে। আন্দোলন দিয়ে দাবি আদায় করতে পারবে না তোমরা। ওসব হুমকি-ধমকি না দিয়ে বড় সাহেব কী বলেন শোনো।' বলেই তিনি আবদুস ছালামের দিকে বাঁ চোখ ছোট করে তাকালেন।

আবদুস ছালাম বললেন, 'তোমাদের দাবি একেবারে ফেলনা নয়। একটু সময় দাও আমাকে। দেখি কী করা যায়! আর হারাধনবাবু, অফিসে একটু খোঁজখবর নিয়ে দেখেন তো, রামগোলামকে কোথায় ফিট করা যায়?'

রামগোলাম বলে উঠল, 'আমরা তো আপনার কাছে চাকরির তদবির নিয়ে

BanglaBook.org

আসিনি। এসেছি দাবি নিয়ে। আমি তো দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত করপোরেশনে কোনো চাকরি নেব না।'

'এটা তুমি অভিমানের কথা বলছ। তোমার দাদা জানে—বর্তমানে করপোরেশনের অফিসে চাকরি পাওয়া কত কঠিন। কী বলো গুরুচরণ?' আবদুস ছালাম বললেন।

'থাক স্যার, থাক। এটা গুরুচরণ ঠিক করবে—রামগোলাম চাকরি নেবে কি নেবে না। আর রামগোলামকে কোথায় ফিট করবেন জিজ্ঞেস করছিলেন। বয়স হয়ে গেছে আমার। লেখাজোখা করতে হয়। আমারই জুনিয়র করে দেন রামগোলামকে, জুনিয়র জমাদারবাবু।' বলেই উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন হারাধনবাবু।

'বললাম তো, আমি এই অফিসে চাকরি করব না।' দৃঢ় কণ্ঠ রামগোলামের।

কার্তিক বলে উঠল, 'আহা, তুমি থাম তো রামগোলাম। এ বিষয়ে পরে কথা বলব আমরা।'

আবদুস ছালাম বললেন, 'ঠিক আছে, ওই কথা রইল, তোমরা আমাকে কিছুদিন সময় দিচ্ছ। দেখি, ওপরে যোগাযোগ করে তোমাদের জন্য কিছু করা যায় কি না?' একটু থেমে আবার বললেন, 'তোমরা যাও এখন।'

গুরুচরণ, কার্তিক আর রামগোলাম বেরিয়ে গেল বড় সাহেবের রুম থেকে। হারাধনবাবু যোগেশকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'খেলাটা ভালোই খেলেছ মীরজাফর সাহেব। বড় সাহেব নিশ্চয়ই তোমার পাওনা বুঝিয়ে দেবেন। এখন তুমি যাও। বড় সাহেবের সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।'

যোগেশের মুখে ক্রূর হাসি। তার চোখে প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা। হারাধনবাবুর আদেশের পরও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুই হাত কচলাতে লাগল। তার দৃষ্টি ছালাম সাহেবের দিকে। ছালাম সাহেব বেল বাজিয়ে ইউসুফকে ডাকলেন। বললেন, 'ক্যাশে গিয়ে বলো যোগেশকে পাঁচশটি টাকা দিতে।'

কৃতার্থ যোগেশ ইউসুফের পেছন পেছন বেরিয়ে গেল। যোগেশ মনে মনে বলতে লাগল—হা ঈশ্বর, আজ কার মুখ দেখে যে সকালটা শুরু করেছিলাম! সামান্য বেইমানিতে এত প্রাপ্তি! ভাটিখানায় আজ জমবে খাসা! প্রতিদিন মনুলালের মদ গিলে যাচ্ছিলাম। শালা জনির কারণে গত ক'মাস ধরে মন বেশ খারাপ মনুলালের। সেই খারাপ মন আজ ভালো করে দেব আমি। আজ সন্ধ্যার সব খরচ আমিই বহন করব মনুলাল।

যোগেশ বেরিয়ে গেলে ছালাম সাহেব বললেন, 'ব্যাপারটা খুব বেশি হয়ে গেল না হারাধনবাবু?'

BanglaBook.org

'কিসের কথা বলছেন স্যার?'

'ওই যে রামগোলামের চাকরি, তা-ও আবার এক লাফে জুনিয়র জমাদার!'

'স্যার আপনি বুদ্ধিমান মানুষ, আপনাকে আমি কী বোঝাব স্যার। তার পরও বলি—আমার কেন জানি মনে হচ্ছে গুরুচরণের পর মেথররা এই রামগোলামকে সর্দার করবে। গুরুচরণের চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান বলে মনে হলো তাকে। সে শিক্ষিত। মেথরদের ঐক্যের সঙ্গে তার শিক্ষা যুক্ত হলে অনেক বড় শক্তিতে পরিণত হবে এরা। চাকরি দেয়া মানে কিনে নেয়া। আর আমার সঙ্গে চাকরি মানে তো বোঝেন? দিন-রাত ব্রেইন ওয়াশ করব আমি। যদি পরিবর্তন না-ও হয়, তার গতিবিধি আমার নজরে থাকবে। তা ছাড়া এক-দুই মাস চাকরি করলে টাকার প্রতি লোভ ধরে যাবে রামগোলামের। আন্দোলন থেকে সরে আসবে সে। গুরুচরণের শরীর ঝটকে গেছে। চাকরির বয়স শেষ হয়ে আসছে তার।' দম নিয়ে নিয়ে কথাগুলো বলে গেলেন হারাধনবাবু।

'যদি রামগোলাম চাকরি না নেয়?' ছালাম সাহেবের সন্দিগ্ধ কণ্ঠ।

হারাধনবাবু বিশ্বাসী কণ্ঠে বললেন, 'চাকরি ঠিকই নেবে রামগোলাম। গুরুচরণের চাকরি চলে গেলে অভাব ঢুকবে ঘরে। গুরুচরণই রাজি করাবে রামগোলামকে। তা ছাড়া আবর্জনা টানার চাকরি নয়, একেবারে জমাদারের চাকরি। রক্ত-মাংসের শরীর তো, লোভ সামলাবে কেমনে?'

'আপনি তো জানেন, ঘোষণা থেকে একচুলও নড়ব না আমরা। সময় ফুরিয়ে গেলে অধৈর্য হয়ে যদি ওরা স্ট্রাইকে নামে? গু-মুত-আবর্জনা টানা এক দিন বন্ধ তো চট্টগ্রাম শহর অচল। ওপর থেকে আমার কাছে কৈফিয়ত চাইবে। বলবে—আমি টেকনিক্যাল নই। চাকরি নিয়ে টানাটানি হবে আমার।' আবদুস ছালাম বললেন।

'পরের ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দেন স্যার। আপনি শুধু রামগোলামকে চাকরিটা দেন।' বুকপকেট থেকে ঘড়ি বের করলেন তিনি। ফতুয়ায় ঘড়ির ডায়াল ঘষতে ঘষতে বললেন, 'কোন কালে মেথরদের আন্দোলন সাকসেসফুল হয়েছে বলেন স্যার? ওরা হলো কুত্তার জাত, এক টুকরা মাংস সামনে ছুঁড়ে দিলেন তো ওটা নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু করে দেবে। দু-চারজন মুখ্য আর দু-চারজন যুবককে কয়েক দিন মদে চুবিয়ে রাখবেন। ওরাই স্ট্রাইক ভেঙে কাজে যোগ দেবে।'

'দেখা যাক।' বললেন বড় সাহেব।

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকেন স্যার, আমি আছি।' দেঁতো হাসি হেসে হারাধনবাবু বললেন।

BanglaBook.org

এগারো

'মা-চোদ, খানকি কা লেড়কা, কুত্তা কা বাচ্চা যোগেইশ্যা! বেইমান শালা। সমাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র! মেথরদের পেটে লাথি!'

গুরুচরণ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আহা কার্তিক! বাবাঠাকুর সামনে, ওনার সামনে তুমি এ রকম মুখ খারাপ করছ কেন?'

কার্তিক লজ্জা লজ্জা ভাব নিয়ে বাবাঠাকুরের দিকে তাকাল, গোল হয়ে বসা চারপট্টির মুখ্যদের দিকে তাকাল, সমবেত উৎসুক হরিজনদের দিকে তাকাল। তারপর মাথা নিচু করে নিম্ন স্বরে বলল, 'দুপুর থেকেই মাথায় আগুন জ্বলছে আমার। দাবি নিয়ে গেলাম আমরা। কোথায় আমাদের সুরে সুর মেলাবে, তা না, উল্টো আমাদের ধমক! বলল—আমরা নাকি আন্দোলনের পাঁয়তারা করছি। কান ভারী করল বড় সাহেবের!'

সমবেত মানুষরা দুপুরের সব কথা শুনতে চায়। করপোরেশন অফিস থেকে ফিরে চারপট্টিতে খবর পাঠিয়েছিল গুরুচরণ। তারই তলবে চারপট্টির সচেতন হরিজনরা জমায়েত হয়েছে মন্দির চত্বরে। চত্বরে টিউবলাইট উজ্জ্বল আলো ছড়াচ্ছে। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। ঘরে ঘরে নারীরা রান্নায় ব্যস্ত। পট্টির স্বাভাবিক হুল্লোড় আজ বন্ধ। সবার মনে শঙ্কা, আজ দুপুরে কী হলো করপোরেশনে, কী বললেন বড়বাবু? দক্ষিণমুখী হয়ে বসেছেন বাবাঠাকুর। তার ডান পাশে গুরুচরণ। তার পাশে পাশে মুখ্যরা। অন্যান্য পট্টির মুখ্যরা এলেও ঝাউতলার মনুলাল আর যোগেশ আসেনি। ভাটিখানায় মদে মগ্ন তারা আজ। মুখ্যদের পাশে অন্যরা বসেছে। একটু দূরে রামগোলাম। আজ দুপুরের পর তার চেহারা থেকে তারুণ্যসুলভ কোমলতা অনেকটা তিরোহিত হয়ে গেছে। সেখানে জায়গা করে নিয়েছে একধরনের কাঠিন্য। এখন সে কিছুটা আত্মমগ্ন।

গুরুচরণ কার্তিককে থামিয়ে দিয়ে দুপুরের সব কথা আদ্যন্ত বলে গেল। শেষে বলল, 'লোভ দেখাল—রামগোলামকে চাকরি দেয়ার। আমার মতে, রামগোলামের এ চাকরি নেয়া উচিত নয়।'

BanglaBook.org

কার্তিক বলল, 'আমি তোমার কথা মানতে পারলাম না সর্দারজি। আমার মতে, রামগোলামের করপোরেশনে চাকরি নেয়া উচিত।'

'আগামী মাসের পরের মাসের মাঝামাঝিতে আমার চাকরি খতম হবে। ওরা জানে আমার এই দুর্বলতার কথা। টোপ দিয়েছে। রামগোলামকে চাকরি দিয়ে আমাকে কিনতে চায়। কোনো কারণে দাবি আদায় না হলে তোমরা সবাই আমাকে দায়ী করবে। বলবে—সর্দার নাতির চাকরির বিনিময়ে নিজেকে বেচে দিয়েছি। না না, এটা ঠিক হবে না। করপোরেশনে রামগোলামের চাকরি নেয়া ঠিক হবে না।' গুরুচরণ বলল।

বান্ডেলের চেদিলাল বলল, 'ছালাম সাহেব কিছুদিন সময় চেয়েছেন তোমাদের কাছে। কিছুদিন মানে কত দিন? দু-চার সপ্তাহ? দু-চার মাস, নাকি বছর? কিছুদিন বলতে কয়েক বছরও বোঝাতে পারেন ছালাম সাহেব। আমার মনে হয়, এই কিছুদিনের মধ্যে কিছু একটা করবেন তিনি। রামগোলামকে করপোরেশনে চাকরি দেয়ার মানে বুঝলাম না। প্রতিপক্ষকে মানুষ ঘায়েল করে, লালনপালন করে না।'

কার্তিক বলল, 'অনন্তকাল সময় দেব নাকি আমরা করপোরেশনকে? এর মধ্যে অন্য জাতের মানুষকে চাকরি দিলে খবর করে দেব না আমরা? রামগোলামকে চাকরি দেয়ার পেছনে কোনো চাল আছে কি না—অতশত বোঝার দরকার কী আমাদের? সর্দারের চাকরি যাবে সামনে। করপোরেশনে আমাদের হয়ে কথা বলার লোক তো আর থাকল না। সব শালা তো দালাল, যোগেইশ্যাকে দেখে এ কথাই বলতে ইচ্ছে করছে আমার। যাক সে কথা! রামগোলাম যদি করপোরেশনে চাকরি নেয়, আমাদের লাভ। সর্দারজির পর আমাদের দাবির কথা থেমে যাবে না, রামগোলাম আমাদের দাবি আদায় করবে।'

গুরুচরণ ইতস্তত করে বলল, 'তার পরও আমার মনে হয় না রামগোলামের চাকরি নেয়া উচিত।'

'আমারও একই কথা সর্দারজি।' চেদিলাল বলল।

কোন ফাঁকে যে মদো শ্যামল পেছনে এসে বসেছে, টের পায়নি কেউ। হঠাৎ জড়ানো গলা শুনে পেছনে ফিরল সবাই। শ্যামল বলছে, 'রামগোলাম চাকরি না নিলে বাবাধনকে চাকরি দেবে সেলাম সাব। হারাধন জমাদারের পাশে বাবাধন জুনিয়র। হারাধন আর বাবাধন মিলে তখন বাম্বু দেবে মেথরদের পোন্দে। একদিকে সেলাম সাব, অন্যদিকে হারাধন-বাবাধন, অন্যদিকে পোন্দে বাম্বু। বাম্বু নিয়া মেথররা ঘুরবে আর সেলাম-হারাধন-বাবাধনরা হাত তালি দেবে।'

BanglaBook.org

গুরুচরণ বলল, 'তোমার মুখ-খারাপ অভ্যাসটা গেল না শ্যামল। বাবাঠাকুর সামনে বসা। কী যে বল না তুমি?'

'আমি ঠিকই বলছি, রামগোলাম চাকরি না নিলে কোনো হিন্দু বা মুসলমানকে ঢুকিয়ে দেবে সে চাকরিতে। তখন আমাদের অবস্থা আরও কাহিল হয়ে উঠবে। রামগোলাম করপোরেশনে চাকরি নিক—এটা আমি চাই।' কথাগুলো বলার সময় মাতলামির কোনো চিহ্ন পাওয়া গেল না শ্যামলের গলায়। সমবেত মানুষের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হলো। কেউ চাকরি নেয়ার পক্ষে, কেউ বিপক্ষে কথা বলতে লাগল। বাবাঠাকুর চুপচাপ বসে আছেন। চোখ তার দূরের অন্ধকারে নিবদ্ধ। ধীরে ধীরে ডান হাতটি ওপরে তুললেন তিনি। গুঞ্জন থেমে গেল। ভরাট কণ্ঠে তিনি বললেন, 'আমার বিবেচনায় কার্তিক যথার্থ বলেছে। গুরুচরণের চাকরি শেষ হলে করপোরেশনে তার গুরুত্ব থাকবে না। সত্যি বলতে কি, গুরুচরণের মতো সাহসী হরিজন বর্তমানে করপোরেশনে নেই। তোমাদের পক্ষে কথা বলার লোক ফুরিয়ে যাবে। গুরুচরণদের যুগ গেছে, এখন ধাপ্পাবাজির যুগ। ধাপ্পাবাজদের জবাব দেয়ার জন্য বুদ্ধির দরকার। কার্তিক-গুরুচরণের কথা শুনে মনে হচ্ছে, রামগোলামের সেই বুদ্ধি আছে।' বলে বাবাঠাকুর রামগোলামের দিকে তাকালেন। রামগোলাম মুগ্ধ দৃষ্টিতে তখন বাবাঠাকুরের দিকে তাকিয়ে আছে। বাবাঠাকুর ইশারায় তাকে কাছে ডাকলেন। বাঁ পাশে বসিয়ে কাঁধে হাত রাখলেন। আবার বলতে শুরু করলেন তিনি, 'গুরুচরণের শরীর ঝটকে গেছে। বার্ধক্য তার শরীরকে জীর্ণ করে ফেলেছে। সামনে তোমাদের খারাপ দিন আসছে। হরিজন-সমাজের ভার বইবার জন্য একজন নেতা দরকার। আমার বিশ্বাস, রামগোলাম সেই ভার বইতে পারবে, ভেতরে থেকে যুদ্ধ করা সহজ হবে। চাকরি নিলে রামগোলাম কাছ থেকে করপোরেশনের হালচাল বুঝতে পারবে। তার চাকরিটা নেয়া উচিত বলে আমি মনে করি।' তারপর সমবেত হরিজনদের উদ্দেশে বললেন, 'কী বলো তোমরা?'

চেদিলালই সবার আগে বলে উঠল, 'ঠিক বলেছেন বাবাঠাকুর। রামগোলাম চাকরি নিলে আমাদের ভীষণ উপকার হবে।'

সমবেত সবাই চেদিলালকে সমর্থন করল। কার্তিকের মুখে জয়ের হাসি। গুরুচরণের মুখ দেখে তার মনোভাব বোঝা যাচ্ছে না। হাজারো বলিরেখার অন্তরালে ভেতরের আনন্দ লুকিয়ে রেখেছে সে। কবে কোনকালে জীবন শুরু করেছিল সে! লেখাপড়া তেমন করেনি। ভাগ্যিস, বাপের কথা শুনে ড্রাইভারিটা শিখে নিয়েছিল। সে সুবাদেই না তুফান মেইলে চাকরি পাওয়া! এক-দুই বছর করে কতটি বছর চলে গেল জীবন থেকে। সমাজের মানুষরা সর্দার বানাল

BanglaBook.org

তাকে। বলল—তোমার মতো সৎ ও সাহসী মানুষ নেই চার পট্টিতে। কী করেছে সে সর্দার হয়ে? হরিজনদের বিপদে-আপদে বুক পেতে দিয়েছে—এই যা। প্রত্যেক সমাজে কিছু ন্যায়-অন্যায় ঘটে। হরিজন-সমাজেও কখনো-সখনো অন্যায় করেছে কেউ কেউ। সর্দার হিসেবে সালিস করতে বসে অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়নি সে। প্রয়োজনে রাগ দেখিয়েছে। বিচারের সময় তার কাছে মুখ্য আর সাধারণ হরিজন সমান বিচার পেয়েছে। আর করপোরেশনে কোনো হরিজনের প্রতি অবিচার হলে প্রতিবাদ করেছে। সেই অবিচারের প্রতিকার যে সব সময় হয়েছে—এমন নয়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুফল পেয়েছে বঞ্চিত হরিজনরা। প্রতিবাদের জন্য মারধরও খেতে হয়েছে তাকে। হরিজনদের ভালোবাসা অপমান আর শারীরিক নির্যাতনের ক্ষতিটা পুষিয়ে দিয়েছে। আজ বাবাঠাকুর জানিয়ে দিলেন—গুরুচরণের দিন শেষ। এখন নতুন যুগের সূচনা। এ যুগের জন্য চাই নতুন নেতা। বাবাঠাকুর রামগোলামের কথা বলছেন, আকারে-ইঙ্গিতে। তার স্থানে রামগোলাম যে তাঁর পছন্দ, তা বোঝা যাচ্ছে। কী আনন্দ আজ তার! অশিক্ষিত গুরুচরণের জায়গায় শিক্ষিত রামগোলাম। সে মরে যাবে একদিন; কিন্তু বংশধর রামগোলাম, তার নাতি রামগোলাম মেথরপট্টির সর্দার হয়ে উঠবে। হরিজনদের সুখ-দুঃখের ভাগীদার হবে সে। শিউচরণের জন্য চাপা দুঃখ ছিল তার মনে। ম্যাদামারা শিউচরণ। কিন্তু ঈশ্বর রামগোলামকে পাঠিয়েছেন তার ঘরে। আজ তৃপ্তিতে চোখ বুজতে পারবে সে। হঠাৎ বাবাঠাকুরের গম্ভীর কণ্ঠে বাস্তবে ফিরে এল গুরুচরণ। বাবাঠাকুর বলছেন, 'আরেকটা কথা, চার পট্টির সবাই আছ এখানে। সর্দার নির্বাচন করো তোমরা। গুরুচরণের পরে কে সর্দার হবে, তা ঠিক করো তাড়াতাড়ি।' গুরুচরণের চোখে চোখ রেখে কথাগুলো বললেন বাবাঠাকুর। 'আর হ্যাঁ, রামগোলাম করপোরেশনের চাকরিটা নেবে।' রাত হয়ে গেছে অনেক, এবার আসো তোমরা।' গুরুচরণকে অপেক্ষা করার ইশারা করে সমবেত হরিজনদের বললেন বাবাঠাকুর।

একে একে সবাই চলে গেলে বাবাঠাকুর চোখ ফেরালেন গুরুচরণের দিকে। বললেন, 'আমার ওপর রাগ করলে গুরুচরণ?'

'কেন, কেন বাবাঠাকুর?'

'ওই যে, তোমার দিন শেষ হয়ে যাওয়ার কথা বললাম। বললাম—আরেকজন সর্দার নির্বাচন করতে।'

'এটা তো ঠিক যে আমার শরীরে ঘুণ ধরেছে। ভেতরটা ঝুরঝুরে হয়ে গেছে আমার। রাতে রাতে জ্বর ওঠে। কাউকে বলিনি সে জ্বরের কথা। এটা তো ঠিক—একদিন যেতে হবে আমাকে। মেথরদের দুর্দিন সামনে। আমার অভিজ্ঞতা

BanglaBook.org

বলছে, সবকিছু হারাতে যাচ্ছি আমরা। ছালাম সাহেবরা সবকিছু কেড়ে নেবে আমাদের। সময় নিয়েছে শুধু শুধু। আমি জানি, একদিন খড়্গটা নেমে আসবে হরিজনদের ঘাড়ে।' গুরুচরণ বলল।

বাবাঠাকুর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে হতাশ কণ্ঠে বললেন, 'আমারও তাই মনে হয়। অসম যুদ্ধ এটি। করপোরেশন আমাদের ভালোর দিকে চাইবে না। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, করপোরেশন আদেশটি ফিরিয়ে নেবে না। তোমাদের রিজিকে ভাগ বসাবে অন্যরা। করপোরেশন তাদের সহায় হবে। তুমি বুড়ো হয়ে পড়েছ। সামনের যুদ্ধ ভয়ংকর। তুমি পারবে না সেই যুদ্ধে নেতৃত্ব দিতে। তাই বলেছি, নতুন সর্দার নির্বাচন করতে। তুমি ভুল বুঝো না আমাকে। তোমাকে আমি ভালোবাসি।'

'আমি জানি সেটা, বাবাঠাকুর।'

যেন গুরুচরণের কথা কানে ঢোকেনি বাবাঠাকুরের। অবিচলিত কণ্ঠে বললেন, 'আমার দিনও শেষ হয়ে আসছে। রামগোলামকে হরিজনপল্লির সর্দার হিসেবে দেখে যেতে চাই আমি।'

গুরুচরণ চমকে তাকাল বাবাঠাকুরের দিকে। স্মিত হেসে বাবাঠাকুর বললেন, 'ঠিক তাই। তোমার পরে রামগোলাম সর্দার হোক, এটা চাই আমি।' গুরুচরণের মুখ দিয়ে কথা সরে না। এ কী বলছেন বাবাঠাকুর? তার মনের কথা বাবাঠাকুর ধরতে পারলেন কী করে? 'ঘরে যাও গুরুচরণ' বলে উঠতে যাবেন, ওই সময় অন্ধকার ঠেলে কে যেন এগিয়ে এল বাবাঠাকুরের সামনে। কাছে এলে চেনা গেল—বান্ডেলের চমনলাল।

'কী ব্যাপার চমনলাল? এত রাতে তুমি এখানে?' একটু থেমে বাবাঠাকুর আবার জিজ্ঞেস করেন, 'কোনো বিপদ বুঝি? কার কাছে এসেছ? গুরুচরণের কাছে?'

'দুজনের কাছেই এসেছি ঠাকুর। বড় বিপদ আমার, ছেলে চলে যেতে চায় আমাদের ছেড়ে। কী কুক্ষণেই যে রামলালের মেয়েকে ছেলের বউ করে এনেছিলাম?'

'ঘটনা কী চমনলাল? খুলে বলো। রাত অনেক হয়েছে। বাবাঠাকুর ঘুমাতে যাবেন। সংক্ষেপে বলো।' গুরুচরণ বলল।

বান্ডেলপট্টির তিন নম্বর বিল্ডিংয়ের দোতলার ন'য় নম্বর ঘরের বাসিন্দা চমনলাল। চার ছেলে ও দুই মেয়ে তার। পিতামহ, পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে এগারোজনের সংসার। খাবার যা-ই হোক, বাসস্থানের সংকট প্রকট চমনলালের পরিবারে। ইতিমধ্যে দুই ছেলে বিয়েযোগ্য হয়ে উঠেছে। বড়

BanglaBook.org

মেয়েটিও বিয়ের বয়সের কাছাকাছি। চমনলাল চাইল—মেয়েটিকে বিয়ে দিতে। কিন্তু স্ত্রী চাইল—আগে বড় ছেলের বউ আসুক ঘরে। অনেক ঝুট-ঝামেলার পর শেষ পর্যন্ত স্ত্রীর কথাই মানতে বাধ্য হলো চমনলাল। মাদারবাড়ির রামপ্রসাদের মেজ মেয়েকে ছেলের বউ করে আনল চমনলাল। এইট পর্যন্ত পড়েছে শক্তিলাল। বউ পেয়ে মাথা খারাপ হয়ে গেল ছেলের। সারাক্ষণ বউ বউ। রামপ্রসাদ ডাকসাইটে। করপোরেশনে হাত আছে তার। বিয়ের পর কন্যা রাধিকার চাকরির ব্যবস্থা করে ফেলল রামপ্রসাদ। রাধিকা ঠোঁটকাটা স্বভাবের। নিজের ছাড়া অন্য কারও স্বার্থের বা সুখের কথা ভাবতে সে নারাজ। রামপ্রসাদের ছোট সংসার। ওখান থেকে চমনলালের রাবণের সংসারে এসে হাঁসফাঁস শুরু করল রাধিকা। ঘরের এখানে-ওখানে মানুষ থিকথিক করে। অস্বস্তি লাগে রাধিকার। তার মেজাজ খিঁচড়ে যেতে থাকে। প্রথমে ননদিনীদের সঙ্গে খাটাসখুটুস শুরু হয়। মধ্যস্থতা করতে এসে শাশুড়িও খোঁচা খায় রাধিকার। মায়ের অপমানে দেবররা খেপে যায়। পারিবারিক পরিস্থিতি অসহনীয় হয়ে ওঠে। এর মধ্যে শক্তিলাল ফ্রি-পোর্টে চাকরি পায়। ঝাড়ুদারেরই চাকরি। কিন্তু মেথর বলে ঘৃণা নেই সেখানে। কোরিয়ান প্রতিষ্ঠান। বেতনও করপোরেশন থেকে বাড়া। স্বামীর বেতনের খবর রাধিকার অজানা থাকে না। পারিবারিক অসহিষ্ণুতার সঙ্গে স্বামীর উচ্চ-বেতনের দেমাক যুক্ত হয়ে রাধিকার মেজাজ তুঙ্গে ওঠে। এক রাতে স্বামীকে বলে—'এখানে আর নয়। আমি আয় করছি, তোমারও বেতন কম নয়। চলো, আমরা অন্য কোথাও বাসা ভাড়া নিই।' মা-বাবা-ভাইবোনের কথা তোলে শক্তিলাল। দায়িত্ববোধের কথা বলে। রাধিকার যুক্তি—আহা! আমি তো তোমার মা-বাবাকে অবহেলা করতে বলছি না। প্রয়োজনে অবশ্যই তাদের সাহায্য করবে। আমি তোমার কাছে একটু স্বস্তির জায়গা চাইছি। পারবে না তুমি আমাকে স্বস্তির আনন্দটুকু দিতে? নিজের ভাষায় এ রকম করে বোঝাতে চাইল রাধিকা স্বামীকে। শক্তিলাল রাধিকার মধ্যে জীবনীশক্তি খুঁজে পায়। স্ত্রীর কথায় সম্মতি জানায় শক্তি। এক সন্ধ্যায় চলে যাওয়ার ইচ্ছেটা তুলে ধরে মা-বাবার সামনে। ভাইবোনরা হতবাক হয়। মা কান্নায় ভেঙে পড়ে। বাবা তাকে বোঝায়—ওই কাজটি কোরো না বাপজান। তুমি চলে গেলে সমাজে আমার মাথা হেঁট হয়ে যাবে। বলবে, চমনলালের বড় ছেলে মা-বাপকে ভাত না দিয়ে বউ নিয়ে কেটে পড়েছে। তা ছাড়া কোথায় যাবে তুমি? নিশ্চয় কোনো পট্টিতে বাসা নেবে না তুমি? পট্টিতে বাসা পাবে কোথায়? নিজেদের থাকার জায়গা নেই, ভাড়া দেবে কোত্থেকে? বউয়ের প্ররোচনায় ভদ্রসমাজে বাসা নিতে চাইছ তুমি? পরিচয় গোপন করে থাকবে? কিন্তু একদিন না একদিন তোমার পরিচয় তো জানাজানি হয়ে যাবে। ভদ্রলোকরা আর যা-ই সহ্য করুক, মেথরদের

BanglaBook.org

সহ্য করে না কখনো। পরিচয় জানতে পারলে অনেক খেসারত দিতে হবে তোমাদের। ওই ভুল কোরো না বাবা, আমাদের ছেড়ে যেয়ো না। শক্তিলাল উদাসীন চোখে আকাশের তারা গোনে। চমনলাল দৌড়ে যায় রাধিকার কাছে। বলে—বউ তুমি শক্তিকে থামাও। ওকে এত বড় ভুল করতে দিয়ো না। যে স্বপ্ন নিয়ে তোমরা আমাদের ছেড়ে যেতে চাইছ, সে স্বপ্ন কখনো পূরণ হওয়ার নয়। বাঙালিরা তোমাদের আসল পরিচয় এক দিন জানতে পারবে। তখন তোমাদের লাঞ্ছনার অন্ত থাকবে না। দলনের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কোনো পথ খুঁজে পাবে না তখন। দোহাই বউ তোমার, আমাদের ছেড়ে অন্য কোথাও যেয়ো না তোমরা। রাধিকা শ্বশুরের দিক থেকে মুখ ফেরায়। চমনলাল আবার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, বলে—থাকার ঘরটিই ছেড়ে দিচ্ছি আজ থেকে তোমাদের। আমরা তো রান্নাঘরে ঢুকেছি অনেক আগে। ছেলেমেয়েদের ঘরের বাইরে এধারে-ওধারে থাকতে বলব। ওরা আর কখনো তোমার দিকে চোখ তুলে তাকাবে না। তোমার শাশুড়ি ভুলেও আর কোনোদিন তোমার মনে কষ্ট দেবে না। রাধিকা নিস্পৃহ ভঙ্গিতে নখে নেলপালিশ লাগায়। চমনলাল বোঝে—ছেলে আর ছেলের বউ সিদ্ধান্তে অটল। তারা চলে যাবেই। এর আগে তার কানে এসেছে—বহদ্দারহাট, না ষোলশহরের দিকে ঘর ভাড়া নিয়ে ফেলেছে শক্তিলাল। শুধু যাওয়াটা বাকি। নিরুপায় হয়ে এই গভীর রাতে মন্দির চত্বরে এসেছে চমনলাল। বাবাঠাকুর আর সর্দারজি যদি তার ছেলেকে ফেরাতে পারে! সব শুনে বাবাঠাকুর শুধু বলেন, 'যে যেতে চায়, তাকে যেতে দাও।'

যেতেই দিল চমনলাল। দুদিন পর এক সকালে বান্ডেলপট্টির মানুষরা দেখল—টুকটাক কিছু জিনিসপত্র নিয়ে শক্তি-রাধিকা রওনা দিয়েছে চেনা গন্তব্যে, অচেনা সমাজে।

বারো

শুক্রবার, সাপ্তাহিক ছুটির দিন। শুক্রবারের সকালটা চার হরিজনপল্লিতে শুরু হয় একটু দেরিতে। অন্যান্য দিন ভোর-সকালে দৌড়াতে হয় করপোরেশন অফিসের

BanglaBook.org

দিকে। নগর তখন ঘুমে কাদা। নাগরিকরা ঘুম থেকে ওঠার আগে নগরকে বাসযোগ্য করে তুলতে হয় হরিজনদের। গোটা দিন এবং রাতের বর্জ্য রাস্তার ধারে ধারে, ডাস্টবিনে অথবা ডাস্টবিনের দূরে-কাছের জায়গায়। করপোরেশন-নির্মিত ডাস্টবিন ছাড়াও এলাকাবাসীর মর্জিমাফিক ছুঁড়ে ফেলা ময়লার স্তূপ অলিতে-গলিতে। ওগুলো পরিষ্কার করার দায়িত্ব হরিজনদের। তাই সুবেহ্ সাদেকে বিছানা ছাড়ে তারা।

শুক্রবারের সকালটা তারা নিজের মতো করে উপভোগ করে। বিলাসী হয়ে ওঠে তারা শুক্রবারের সকালে। বড় মগ নিয়ে চা-দোকানে যায়। দোকানদারের ছুঁড়ে দেয়া পরোটা আর ছোঁয়া-বাঁচিয়ে ওপর থেকে ঢেলে দেয়া মগভর্তি চা নিয়ে ঘরে ফেরে। চা-পরোটা ভাগবাটোয়ারা হয় পরিবারের সদস্যদের মধ্যে। উঠানের কোনায় শূকর জবাই হয়। দাম চুকিয়ে এক কেজি, দুই কেজি মাংস ঘরে তোলে প্রতিটি পরিবার। সকালটা তেজি হয়ে উঠলে মদ নিয়ে বসে পুরুষরা—এককভাবে, সামষ্টিকভাবে। পট্টিতে পট্টিতে হল্লা বাড়ে। গলগল করে ধোঁয়া বেরুতে থাকে রান্নাঘরগুলো থেকে। বাচ্চা-কাচ্চারা লুটোপুটি খেতে থাকে উঠানে, বারান্দায়। ঝগড়া হতে থাকে দুই নারীতে। তৃতীয়া এসে ঝগড়া মেটাতে থাকে। নারীরা বাজারে যায়—একটু ভালো খেতে হবে, খাওয়াতে হবে স্বজনদের।

কিন্তু আজকের শুক্রবারটা অন্য রকম—অন্তত ফিরিঙ্গিবাজার মেথরপট্টিতে। মন্দিরজুড়ে সাজ সাজ রব। আজ সর্দার নির্বাচন হবে এখানে। সর্দার গুরুচরণ ঘোষণা করেছে—সর্দারি ছেড়ে দেবে আজ। স্বেচ্ছায়। কিন্তু হরিজনপল্লি সর্দারশূন্য থাকে না কখনো। তাই যেদিন গুরুচরণ সর্দারি ছাড়বে, সেদিনই নির্বাচন করতে হবে আরেকজন সর্দার। সর্দাররা সহজে ক্ষমতা ছাড়তে চায় না। বয়সের ভারে চাকরি ছাড়ে, কিন্তু সর্দারি ছাড়ে না। পট্টির নিয়ম—স্বেচ্ছাচারী না হলে কোনো সর্দার আজীবন সর্দার থাকতে পারবে। জরায় আক্রান্ত হয়ে কোনো সর্দার কর্ম-অক্ষম হয়ে পড়লে চার পট্টির মুখ্যরা নতুন সর্দার নির্বাচনের উদ্যোগ নেয়। নির্বাচন মানে আক্ষরিক অর্থে নির্বাচন নয়। পট্টির মানুষরা মৌখিক সমর্থনের মাধ্যমে তাদের পরবর্তী সর্দার ঠিক করে। গুরুচরণ বার্ধক্যে বা জরায় ন্যুব্জ হয়ে পড়েনি। চলচ্ছক্তি হারায়নি সে। মস্তিষ্ক এখনো সচল তার। কিন্তু নিজের ভেতরে সে যখন চোখ রাখে, তখন কমজোর মনে হয় নিজেকে। আগের গুরুচরণকে খুঁজে পায় না সেখানে। সাহস যেন অনেক কম সেখানে। একসময় দুর্বার সাহস খেলা করত বুকে। আসুরিক শক্তি ছিল শরীরে। ইদানীং এ সবকিছুর অভাব—শরীরে ও মনে। তাই সে ঠিক করেছে, আর নয়, তার

BanglaBook.org

জায়গায় নতুন কেউ আসা দরকার। মেথরপট্টির হাল ধরা দরকার নতুন কাউকে। সামর্থ্যবান কারও হাতে সর্দারি তুলে দিতে চায় সে। সর্দারি ছেড়ে দেয়ার এটাই কি মূল কারণ? অন্য কোনো বাসনা কি গুরুচরণের মনে কাজ করছে না? হ্যাঁ করছে। সত্যি তার মনের ভেতর অন্য একটি বাসনা ওলটপালট খায়। যদি তার পরিবর্তে রামগোলামকে সর্দার করা যায়! রামগোলাম বুদ্ধিমান, লেখাপড়াও জানা তার। সর্দারের নাতি সে। তবে তাকে সর্দার নির্বাচন করতে আপত্তি কোথায়? আপত্তি এক জায়গায়—বয়সে নবীন রামগোলাম। মেথরসমাজে সর্দার হওয়ার জন্য প্রবীণতাও একটা শর্ত। বুদ্ধিমান, শিক্ষিত রামগোলামের ক্ষেত্রে প্রবীণতার শর্ত কী শিথিল করা যায় না? গত কয়েক রাত এ রকম এলোমেলো ভেবেছে গুরুচরণ।

বাবাঠাকুরকে ঘিরে চার পট্টির মানুষরা বসেছে। সর্দার, মুখ্য, গণ্যমান্যরা। তরুণ আর সাধারণ মানের বয়স্করা একটু দূরে; কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বসে। তাদের ছাড়িয়ে ওদিকে উৎসুক নারীরা। সবার দৃষ্টি সভার মাঝখানে নিবদ্ধ।

গুরুচরণ গলায় গামছা জড়িয়ে উপুড় হয়ে সভায় প্রণাম করল। করজোরে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি আজ স্বেচ্ছায় সর্দারি ছেড়ে দিলাম। আপনারা আমার জায়গায় নতুন সর্দার নির্বাচন করেন।'

গুরুচরণের স্বেচ্ছায় সর্দারি ত্যাগ করার ব্যাপারটি মেথরপট্টির সবার কমবেশি জানা। পক্ষে-বিপক্ষে অনেক কথা হয়েছে হরিজনদের মধ্যে। সবার কথা একটি জিজ্ঞাসায় এসে ঠেকেছে, কে হবে পরবর্তী সর্দার? গুরুচরণের এ ঘোষণায় সবার মধ্যে ওই কথাটি আবার গুঞ্জরিত হতে থাকল—গুরুচরণের পর কে হাল ধরবে মেথরসমাজের? তার মতো বুকের পাটা কার আছে? কে নিজের শরীরের রক্ত দিয়ে হরিজন-সমাজের জন্য লড়বে? অসহায় অসুস্থ মেথরদের নিয়ে গভীর রাতে কে ছুটবে হাসপাতালের দিকে?

'সর্দার গুরুচরণের জায়গায় মনুলালকে সর্দার করার প্রস্তাব করছি আমি।' সমবেত মুখ্যদের মধ্য থেকে যোগেশ বলল।

কার্তিক তৎক্ষণাৎ বলে উঠল, 'আমি এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি। শুধু বিরোধিতা নয়, নিন্দাও জানাচ্ছি এ রকম প্রস্তাব দেয়ার জন্য।'

যোগেশ বলল, 'বিরোধিতার কী আছে? মনুলাল কম কিসে? টাকাপয়সার অভাব আছে নাকি তার?'

'তার মধ্যে নীতির অভাব আছে। খুনি-লম্পটকে ঘরে আশ্রয় দেয়। মদ-ভাং নিয়ে হরদম পড়ে থাকে ভাটিখানায়। আর টাকাপয়সার কথা বলা হচ্ছে! সমবেত মানুষের মধ্যে কে বলবে—মনুলাল কাউকে টাকাপয়সা দিয়ে বিপদে

BanglaBook.org

সাহায্য করেছে? বরং তার ঘরে আশ্রিত কুলাঙ্গার রূপালীকে বলাৎকার করতে চেয়েছে।' কার্তিক বলল।

মনুলালের ডান হাত উরুর ওপর ছড়ানো। সে হাত মুষ্টিবদ্ধ। ধীরে ধীরে খুলে যায় মুষ্টি। ডান উরুতে জোরে একটা থাপ্পড় মেরে প্রায় চিৎকার করে মনুলাল বলে, 'অনেক বেড়ে গেছস কার্তিক, তুই। দাম চুকাতে হবে তোকে অনেক।'

কার্তিক বলে, 'কী দাম দিতে হবে তোমাকে? মাথা কাটবে আমার? তুমি আর যোগেশকে কে না চেনে? তোমরা হরিজন-সমাজের শত্রু।'

চেদিলাল কার্তিককে থামিয়ে বলে, 'আমরা কি এই মন্দিরে ঝগড়া করার জন্য জমায়েত হয়েছি? আজ আমাদের সর্দারের শেষদিন। কোথায় তাকে সেলাম জানাব, তা না। একে অপরের দুর্নাম ছড়াতে ব্যস্ত আমরা। আমি উভয় পক্ষকে অনুরোধ করছি, আর কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি নয়। আমরা আমাদের নেতা নির্বাচনে মনোযোগ দিলে ভালো হবে।'

বাবাঠাকুর এতক্ষণে কথা বললেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ চেদিলাল। যোগেশের প্রস্তাবের বিপরীতে কারও কোনো প্রস্তাব আছে কি না?'

'হ্যাঁ আছে।' বান্ডেলের অশীতিপর বৃদ্ধ গণেশ কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন। বয়সের ভারে ন্যুব্জ হয়ে গেছেন তিনি। সর্দার নির্বাচনের কথা শুনে লাঠিতে ভর দিয়ে উপস্থিত হয়েছেন মন্দিরের চত্বরে। সবাই প্রায় একযোগে তাকালেন তাঁর দিকে। বাবাঠাকুর বললেন, 'কী প্রস্তাব গণেশদা?'

'আমার প্রস্তাব হলো, রামগোলাম হোক আমাদের পরবর্তী সর্দার। সে শিক্ষিত। বুদ্ধি রাখে সে। কিছুদিন ধরে তাকে আমি চিনছি। পট্টিতে পট্টিতে ঘুরে হরিজনদের অতীত সম্পর্কে অনেক কথা জানতে চায়। আমার কাছে গেছে অনেকবার। আমার মনে হয়েছে, রামগোলাম সর্দার হওয়ার যোগ্যতা রাখে। বয়স কম তার, অভিজ্ঞতা বেশি। রামগোলামই হোক আমাদের পরবর্তী সর্দার।' শ্বাস টেনে টেনে শ্লথকণ্ঠে কথাগুলো বলে গেলেন গণেশ।

বাবাঠাকুরের চোখেমুখে প্রশান্তির হাসি ছড়িয়ে পড়ল। বললেন, 'গণেশের প্রস্তাবকে কারা সমর্থন করো?'

সমবেত জনগোষ্ঠী সমস্বরে বলল, 'রামগোলামই আমাদের সর্দার হোক।'

মনুলাল ও যোগেশ সভা ত্যাগ করল। কার্তিকরা প্রায় কোলে করে রামগোলামকে নিয়ে এল বাবাঠাকুরের সামনে। বাবাঠাকুর মা কালীর চরণ থেকে সিঁদুর নিয়ে রামগোলামের কপালে লাগিয়ে দিলেন। রামগোলামের মাথায় হাত রেখে বাবাঠাকুর বললেন, 'এত অল্প বয়সে কেউ হরিজনপল্লির সর্দার হতে

BanglaBook.org

পারেনি। তুমি পেরেছ। কারণ, হরিজনরা বিশ্বাস করছে, গুরুচরণের দায়দায়িত্ব পালন করার ক্ষমতা তোমার আছে। গুরুচরণ তেমন লেখাপড়া জানত না। ফলে করপোরেশনের কর্তাদের সঙ্গে যুক্তিতে আর বুদ্ধিতে সে পেরে উঠত না। নানা মারপ্যাঁচে জড়িয়ে তাকে দাবিয়ে রাখত তারা। তাকে দাবিয়ে রাখা মানে পট্টির সবাইকে দাবিয়ে রাখা। তা ছাড়া আমাদের মধ্য থেকে সুযোগসন্ধানী কিছু মানুষ তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে বারবার। তাদের বিশ্বাসঘাতকতা আর গুরুচরণের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে ওই সব হর্তাকর্তা আমাদের দাবিদাওয়া অগ্রাহ্য করেছে বা মাঝপথে থামিয়ে দিয়েছে। সে দাবিগুলো ছিল ছোট ছোট। এই গর্ভবতী মায়েদের পুরো দুই মাস ছুটি দেয়া, শুক্রবারের বেতন দেয়া, জমাদারদের জাত তুলে গালি দেয়া বন্ধ করা ইত্যাদি। কিন্তু এবারের দাবি অনেক বড় ও জটিল। হরিজন ছাড়া অন্য জাতের মানুষকে এই চাকরিতে বহাল করার নোটিশ জারি করেছে করপোরেশন।'

কার্তিক বলল, 'শুধু নোটিশ জারি নয়, নোটিশ মোতাবেক আমাদের চাকরি নিয়ে টানাটানির ব্যবস্থাও পাকা করে ফেলেছে করপোরেশন।'

বাবাঠাকুর কার্তিকের কথায় কান না দিয়ে বলে যেতে লাগলেন, 'তোমার ওপর অনেক ভরসা হরিজনদের। গুরুচরণের শুরু করা কাজকে তুমি সফল করে তুলবে—এ আশা করে তারা। তুমি হরিজনদের ভুলো না, তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা কোরো না। আর হ্যাঁ, তোমার দাদা শত্রুহীন ছিল। অন্তত এই সমাজের কোনো মানুষ তার বিরোধিতা করত না। কিন্তু তুমি শত্রুশূন্য নও। তুমি নিজের চোখেই দেখলে তোমার বিরুদ্ধে কথা বলল কারা। তোমাকে সজাগ থাকতে হবে।' রামগোলাম কোনো কথা বলল না, নীরবে শুনে গেল বাবাঠাকুরের কথা।

গুরুচরণ বলল, 'বাবাঠাকুর, রামগোলামকে আপনি আশীর্বাদ করেন, সে যেন হরিজনদের আশা পূরণ করতে পারে।'

গুরুচরণের আজ ত্যাগের দিন, আবার প্রাপ্তিরও দিন। সর্দারি ত্যাগ করেছে সে আজ, কিন্তু রামগোলামকে সর্দার নির্বাচন করেছে হরিজন-সমাজ। ত্যাগ এবং প্রাপ্তি গুরুচরণে এসে সমাহিত হয়ে গেছে। ত্যাগের বেদনা আর প্রাপ্তির আনন্দ মিলেমিশে গুরুচরণের মুখমণ্ডল এক অস্বাভাবিক দীপ্তি ছড়াচ্ছে।

গুরুচরণের চাকরি শেষ হওয়ার দিন দশেক আগে রামগোলামের চাকরি হয়ে গেল করপোরেশনে। জুনিয়র জমাদারের চাকরি। হরিজনরা বলল—রামগোলাম এখন থেকে আমাদের ছোটো জমাদার। হারাধনবাবুই ডেকে বলেছিলেন কথাটা, 'কী গুরুচরণ, বড় সাহেব কথা একটা বলেছিলেন তোমাকে,

BanglaBook.org

এ বিষয়ে কিছু তো বললে না।'

গুরুচরণের মনে থই থই আনন্দ। নাতি সর্দার নির্বাচিত হওয়ায় তার আনন্দের সীমা নেই। আনন্দে নিমগ্ন থাকার কারণে বড় সাহেবের প্রস্তাবের কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিল গুরুচরণ। তাই জমাদার হারাধনবাবুর কথার মর্মার্থ প্রথমে বুঝতে পারেনি গুরুচরণ। বলেছিল, 'কী কথা জমাদারবাবু? কোন ব্যাপারে কথা বলছেন?'

হারাধনবাবু বললেন, 'এর মধ্যে ভুলে গেলে? শুনেছি, নাতি তোমার সর্দার নির্বাচিত হয়েছে; মনে আনন্দ তোমার। ভাতঘরের কথাও মনে রাখা দরকার তোমার।' মনে মনে বললেন, 'শালার পো মেথরের বাচ্চা, খুশির ঠেলায় স্মৃতি তোর লোপ পেয়েছে। ভাতের হাঁড়িতে যখন আগুন জ্বলবে না, তখন বাপ বাপ করে দৌড়ে আসবি, পায়ে পায়ে ঘুরবি গু-মুত টানার চাকরির জন্য।' মুখে বললেন, 'রামগোলামের চাকরির কথা বলছি। শোনো গুরুচরণ, সুইপারের চাকরির জন্য কত মানুষ যে ধরনা দিচ্ছে, নিজ চোখেই তো দেখছ। বড় সাহেব তোমাকে ভালোবাসেন, তাই সেধে তোমার নাতিকে চাকরিটা দিতে চাইছেন। তাও আবার যেই-সেই চাকরি নয়, একেবারে আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট, জুনিয়র জমাদারের চাকরি! আর তুমি জিজ্ঞেস করছ, কী কথা জমাদার বাবু?

লজ্জিত গলায় গুরুচরণ বলল, 'ভুল হয়ে গেছে হুজুর। আপনি ঠিকই ধরেছেন, খুশিতে মশগুল ছিলাম, বড়বাবুর দয়ার কথা ভুলে গিয়েছিলাম।' একটু থেমে বিনীত কণ্ঠে জিজ্ঞস করল, 'কখন নিয়ে আসব হুজুর রামগোলামকে?'

'কালকে নিয়ে আসো, কালকেই নিয়ে আসো।' একদলা কফ থু করে মাটিতে ফেলে হারাধনবাবু বললেন, 'আমি বড় সাহেবকে বলে রাখব।'

গুরুচরণ দুই হাত বুকের কাছে জড়ো করে আনন্দিত কণ্ঠে বলল, 'আপনার বহুত মেহেরবানি হুজুর।'

হারাধনবাবু মনে মনে বললেন, 'আগে খাঁচায় ঢুক ইন্দুরের বাচ্চা, তারপর দেখ কী করি। ভেতরে শুঁটকি মাছ গেঁথে ইন্দুরের কল বসাতে দেখস নাই? কলে ঢুইক্যা মাছে টান দিলেই ঝপাস কইরা দরজা বন্ধ। তারপর ইন্দুরটার কী হাল হয় দেখস নাই? না দেখলে দেখাইয়া দিমু নে।' তারপর মুখে কপট হাসি ছড়িয়ে বললেন, 'তো, এই কথা, কালকে নিয়ে আসো রামগোলামকে।'

'জি আচ্ছা, হুজুর।' গুরুচরণ কোঁতা হয়ে বলে।

পরের দিন রামগোলামকে নিয়ে আবদুস ছালাম সাহেবের রুমে হাজির হলো গুরুচরণ। সঙ্গে কার্তিক আর চেদিলাল। আগে থেকেই সেখানে হাজির ছিলেন হারাধন জমাদার। বড় সাহেবের রুমে ঢুকতে তাদের আজ বাধা দিল

BanglaBook.org

না ইউসুফ। রামগোলামকে দেখেই বড় সাহেব বলে উঠলেন, 'আরে আসো আসো! গুরুচরণ, রামগোলামকে নেতা বানিয়েছ শুনলাম। আমার পক্ষ থেকেও তো রামগোলামকে একটা তোফা দেয়া দরকার।' হারাধনবাবুর দিকে তাকিয়ে চোখ একটু ছোট করে, গলায় অপ্রয়োজনীয় উল্লাসের সঞ্চার করে আবদুস ছালাম আবার বললেন, 'হারাধনবাবু, রামগোলামের যোগদানের ব্যবস্থা করেছেন তো?'

'স্যার, সবকিছু রেডি আছে। আপনি হেড ক্লার্ককে বলে দিলে হবে।' হারাধনবাবু বললেন।

আবদুস ছালাম খুশি খুশি ভাব করে রামগোলামকে বললেন, 'তো, রামগোলাম, আজ থেকে তুমি আমাদের কর্মচারী হয়ে গেলে। কর্মচারীদের কিছু দায়িত্ব আছে। হারাধনবাবুর কাছে ধীরে ধীরে সব জানতে পারবে। গুরুচরণ, রামগোলামকে হেড ক্লার্কের কাছে নিয়ে যাও। উনি সব ব্যবস্থা করবেন।'

সে দিনই রামগোলাম জুনিয়র জমাদার পদে যোগদান করল।

তেরো

যেদিন গুরুচরণ মারা গেল, সেদিন খুব করে কাঁদল রামগোলাম। অব্যক্ত এক আবেগ তার ভেতরে গুমরে গুমরে মরছিল। সে আবেগের নাম হয়তো বেদনা অথবা শ্রদ্ধা অথবা নির্ভরশীলতা। বোঝার বয়স হওয়ার পর থেকে রামগোলাম যাকে সবচেয়ে কাছে পেয়েছিল, সে গুরুচরণ। মা-বাবাকে দেখে দেখে, পাড়া-পড়শির কাছে শুনে শুনে দাদু সম্পর্কে একটা ভীতির ব্যাপার তার মধ্যে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু যেদিন দাদুর সঙ্গে তার নামের ব্যাপারে কথা হলো, সেদিনই দাদু সম্পর্কে তার ভয়টা কেটে গেল। সেদিন সে দেখেছিল, কালাপাহাড়ের মতো বিশাল দাদুও হা হা করে হাসে, পরম স্নেহে কাছে টেনে নেয়। দাদুর সঙ্গে কথা বলে সেদিনই তার মনে হয়েছে, দাদু তার ঝুনা নারকেলের মতো। ঝুনা নারকেলের বাইরে শক্ত আবরণ, তার নিচে কঠিন মালা। তারপর শাঁস, জল। যারা নারকেলের শাঁস আর জল পেতে চায়, তাদের ওই সব কঠিন স্তর পেরিয়ে

BanglaBook.org

আসতে হয়। কঠোর-গম্ভীর দাদুর ভেতরও ঝুনা নারকেলের মতো স্নেহের ফল্গুধারা। অন্যরা না চিনুক, রামগোলাম সেই বালক বয়সে দাদুর আপাত কঠিন আবরণের অন্তরালে লুকিয়ে থাকা কোমল মানুষটিকে চিনতে পেরেছিল। সেই থেকে রামগোলাম নিজের মধ্যে গুরুচরণের জন্য একটা শ্রদ্ধার জায়গা তৈরি করে নিয়েছিল। রামগোলামের এই বিশ্বাস যে, পৃথিবীর সেরা মানুষদের একজন তার দাদু। মা-বাবা-ঠাকুমার কাছ থেকে সে ধীরে ধীরে দাদুর কাছে সরে এসেছিল। তার কাছে দাদু গুরুচরণ এক পরম নির্ভরতার জায়গা হয়ে গিয়েছিল। শ্রদ্ধান্বিত নির্ভরতার এই স্থানটি যেদিন ঈশ্বর কেড়ে নিল, সেদিন হুড়মুড় করে ভেঙে পড়েছিল রামগোলাম। পাড়া-পড়শিরা কোনোক্রমেই থামাতে পারছিল না তাকে। অশ্রু তার দুই চোখকে ঘিরে ধরছিল বারবার। থরথর করে কাঁপছিল তার দেহ। তার বিচূর্ণ হতে থাকার ব্যাপারটি দেখে ঠাকুমা অঞ্জলি নিজের আবেগকে দাবিয়ে রেখে এগিয়ে এসেছিল। ডান হাতটি রামগোলামের মাথায় রেখে বলেছিল, 'নিজেকে দমন করো রাম। সবাই যায়, যাবে। জগতের নিয়ম মেনে তোমার দাদুও চলে গেল। তাকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করো।' বলেই হু হু করে কেঁদে উঠল অঞ্জলি। তার কান্না দেখে চাঁপারানী এগিয়ে এল। নিবিড়ভাবে বুকে টেনে নিল শাশুড়িকে।

ফিরিঙ্গিবাজার মেথরপট্টিতে তখন অনেক মানুষ। চার পট্টির আবালবৃদ্ধবনিতা আছড়ে পড়েছে ফিরিঙ্গিবাজার পট্টিতে। সবার চোখে জল, মুখে হাহাকার, বুকে অপার বেদনা। এই হাহাকার, আহাজারির মধ্যেও কিছু মানুষ গুরুচরণের মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করছে। পাতি বাঁশ দিয়ে মাচা তৈরি করা হয়েছে। বিছানার পাটিসহ শবটি সেই মাচার ওপর রাখা হয়েছে মন্দিরের চত্বরে। গুরুচরণের পায়ের কাছে মাথা ঠেকিয়ে হরিজনরা প্রণাম করছে। শিয়রের কাছে ধূপকাঠি-মোমবাতি জ্বালানো হয়েছে। বাবাঠাকুর স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন গুরুচরণের মাথার কাছে। তাঁর দুই চোখ শুকনো।

একটা সময়ে হরিজনরা তাদের প্রিয় মানুষটির নিথর দেহ নিয়ে ভলুয়ার দীঘির শ্মশানে উপস্থিত হলো। স্নানাদি সম্পন্ন হওয়ার পর দেহটি পোড়ানোর জায়গায় নিয়ে গেলে বাদ সাধল রামদাস। রামদাস এই শ্মশানের ডোম। মরা পোড়ানোর দায়দায়িত্ব তাকে দিয়েছে শ্মশান-কমিটি। শহরের উঁচু বর্ণের গণ্যমান্য হিন্দুরা এই কমিটির সভাপতি, সেক্রেটারি, সদস্য। ওদের অঙ্গুলিহেলনে রামদাস ওঠে-বসে, হাসে-কাঁদে। ওরাই তাকে বলে দিয়েছে—মেথর, জেলে, হাঁড়ি—এসব নীচু জাতের মৃতদেহ পোড়াবে ওই ওদিকে, খালের পাড়ে। আর এই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বাঁধানো চুলাটি উঁচু বর্ণের

BanglaBook.org

জন্য। উঁচু বর্ণ মানে—ব্রাহ্মণ, সেন, দাশগুপ্ত, চৌধুরী, দে, মজুমদার ইত্যাদি। খবরদার, এর ব্যতিক্রম করলে চাকরি খাব তোমার।

রামদাস ডোম তাদের আদেশ শিরোধার্য করেছে। অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে সমাজের ওই সব হর্তাকর্তার আদেশ-নির্দেশ। তাই রামদাস বলল, 'তোরা মেথর আছিস। তোদের জায়গা এটা নয়। এইটা বাবুদের জন্য। তোরা পোড়াবি ওই খানে। আর হ্যাঁ, মরা পোড়ানোর জন্য ট্যাক্স দিতে হোবে, আড়াই শ টাকা।'

বলে কী বেটা রামদাস? এই এত বয়স হলো—কত মরা পোড়াতে এলাম এই শ্মশানে! এইখানেই তো পুড়েছি আমার বাপকে। বউটাকেও তো পুড়িয়ে গেলাম সেদিন। ছয় মাসও তো হয়নি। ট্যাক্সমেক্স তো কিছুই দিতে হয়নি। রামদাস ডোম বলে কী? এই চুলাতে মেথর পোড়ানো যাবে না! আবার আড়াই শ টাকা দাবি! মাথা গরম হয়ে উঠল চেদিলালের। রামদাসকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'অই হারামখোর, ক্যায়া কাহা? তুই তো বেটা ডোম আছিস, নীচু জাতের নীচু জাত! তুই আবার বলিস এই চুলা বাবুদের জন্য?'

'হ্যাঁ দাদা, ওরা বলে দিয়েছে, শুধু উঁচু জাতের মানুষকে পোড়ানো হোবে এই চুলায়। তোমরা ওই-ই খানে কাদা-ময়লার জায়গাটিতে।' কিছুটা মাতাল কণ্ঠ রামদাসের।

কার্তিক এগিয়ে এল। গলা চড়িয়ে বলল, 'এখানেই পোড়াব আমাদের সর্দারের মৃতদেহ। তুই কী করতে পারিস কর দেখি! আর কোন মাদারি আমাদের কাছ থেকে টাকা নিবে, আসতে বল।'

কার্তিকের রণমূর্তি দেখে একটু ভড়কে গেল রামদাস। কিন্তু পিছু হটল না। বলল, 'তোমরা জোর করে পোড়াবে নাকি?'

শিউচরণ স্নান করে নতুন ধুতি পরেছে, গলায় নতুন গামছা। বামুন তার কপালে, কণ্ঠায়, কানের লতিতে তিলকের ফোঁটা দিয়েছে। বাপের গা ঘেঁষে বসে আছে সে। রামগোলাম দাদুর পায়ের কাছে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। কার্তিকদের উচ্চ কণ্ঠ শুনে সেদিকে এগিয়ে গেল রামগোলাম। কার্তিকের মুখে শুনল সবকিছু। বিষণ্ন-বিপর্যস্ত চেহারা তার। জাতপাত আর মর্যাদার কথা শুনে তার মধ্যে হঠাৎ এক প্রবল প্রতাপী ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হলো। দাদুর মৃত্যুবেদনা তার মধ্য থেকে তিরোহিত হয়ে গেল, সেখানে চাগিয়ে উঠল তীব্র এক ক্রোধ। ক্রোধান্ধ রামগোলাম চিৎকার করে বলল, 'আমরা তোমার বাবুদের চুলায় আমার দাদুকে পোড়াব।'

'আমি পোড়াতে দেব না।' পাশ থেকে একটা বাঁশের লাঠি হাতে নিয়ে

BanglaBook.org

তেড়ে এল রামদাস।

'তোমরা সবাই বাঁধো ওকে ওই গাছে। কষে বাঁধো।' আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ল রামগোলাম। অনেকক্ষণ কাঁদল সে। তারপর মাথাটা সোজা করল। দেখল, তার চারপাশে শ্মশানে আগত হরিজনরা দাঁড়িয়ে আছে। সবাই চুপচাপ। রামদাসও জবুথবু ভঙ্গিতে রামগোলামের দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখে বিস্ময় আর ভয়ের মেশামেশি। মদের ঘোর কেটে গেছে তার। রামগোলাম বলল, 'এই বাবুদের অত্যাচার থেকে, ঘৃণা থেকে মুক্তি নেই আমাদের। হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান-বৌদ্ধ সবাই আমাদের এড়িয়ে চলে। পথ চলতে চলতে ছোট ছোট সন্তানকে আমাদের দেখিয়ে বোঝায়—ওই যে দেখছ রাস্তা ঝাড়ু দিচ্ছে যারা, ময়লা-আবর্জনা টুকরিতে করে ট্রাকে তুলছে যারা, তারা কিন্তু মানুষ না—মেথর। মেথরদের ছুঁলে পাপ। গরু-ছাগল-কুত্তাকে ছোঁয়া যায়, মেথরদের ছোঁয়া যায় না। খবরদার, তোমরা এদের থেকে দূরে থাকবে। সেই থেকে আমাদের ঘৃণা করা শুরু। সেই ঘৃণা থেকে আমাদের মুক্তির কোনো দরজাই খোলা নেই।'

কার্তিক বলল, 'থাক, সর্দার থাক। ওগুলো আজ ভাবতে নেই।'

'আমি তো ভাবতে চাইনি। ভাবতে বাধ্য করছে ওই বাবুরা। ভাবতে বাধ্য করছে ওই রামদাস ডোম। রামদাস নিজেই জানে না, সে কে? তাকে যে উঁচু জাতের মানুষরা গুয়ের পোকার চেয়েও বেশি ঘৃণা করে, তা সে জানে না। মদে বেহেড হয়ে থাকে সে। ও যে নিজের মানুষের মাথায় লাঠি মারছে, সেটা সে বোঝে না। বুঝলে কি বাধা দিত? তোমরা ভেবে দেখো, জীবনে যাদের হাতে আমরা লাঞ্ছিত হই, মরণেও তাদের হাত থেকে আমাদের মুক্তি নেই। শ্মশানেও জাতিভেদ। ওদের বড় মুনিঋষিরা বলে গেছে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র নাকি সমান হয়ে যায়, যখন ওরা শ্মশানে আসে। মৃতের নাকি কোনো জাত নেই। কিন্তু তোমরা দেখো, এখানেও তারা জাতপাতের গ্যাঁড়াকল পেতে রেখেছে। মানি না বাবুদের চালাকি, ঘৃণা করি আমরা তোমাদের করা জাতভাগকে!' বলতে বলতে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়ে রামগোলাম।

রামদাস বলে, 'আমার ভুল হয়ে গেছে দাদা। আমি বাবুদের চালাকি বুঝিনি।'

রামগোলাম বলল, 'শুনো রামদাস, বাবুদের চুলায় দাদুকে পোড়াব। তোমাকে গাছে বেঁধে রাখব আমরা। না হলে তোমার চাকরি যাবে। বউ-পোলা উপুস থাকবে। চাঁদা আমরা তোমাকে দেব না। বাবুরা জিজ্ঞেস করলে বলবে, হরিজনরা তোমাদের আদেশ মানেনি।'

BanglaBook.org

বাবুদের চুলায় মেথর-সর্দার গুরুচরণকে পুড়িয়ে ঘরে ফিরল হরিজনরা।

শাশুড়িকে সঙ্গে নিয়ে শুয়েছে আজ চাঁপারানী। শিউচরণ শুয়েছে রান্নাঘরে। অঞ্জলি বেঘোরে ঘুমাচ্ছে। অথচ আজ তার ঘুম আসার কথা না। কবে সেই বারো-তেরো বছর বয়সে গুরুচরণের ঘরে এসেছিল অঞ্জলি! বিয়ে, স্বামী—এসব বিষয়ে তেমন কোনো ধারণা ছিল না অঞ্জলির। বৌদিদের কাছে শুনে শুনে যা কিছু জানা। বিয়ের সময় ভীমাকৃতির গুরুচরণকে দেখে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। বিয়ের দিন বিকেলে মেজবৌদি কানে কানে বলেছিল—'দেখিস, সর্দারকে বিছানায় খালি গায়ে দেখে ভয় পাস না যেন। এর পরে মধু আছে।' বৌদির অসভ্যতা সেই বিকেলে ভালো করে বুঝে উঠতে পারেনি অঞ্জলি। বুঝল, আঁধার ঘরে গুরুচরণ তাকে যখন বুকে টেনে নিল, আদরে-সোহাগে ভরিয়ে দিল তার দেহ আর মন। সেই থেকে কত ঝড়-ঝঞ্ঝা গেল, কত সুদিন-কুদিন গেল, কত শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা কাটল—একটি দিনের জন্যও কাছছাড়া হয়নি সর্দার। অথচ আজ অঞ্জলিকে একা রেখে কোন অজানা দেশে যে পাড়ি জমাল! ভাবতে ভাবতে একটা সময়ে অঘোর ঘুমের দেশে চলে গেছে অঞ্জলি।

ঘুম আসছে না শুধু চাঁপারানীর চোখে। গুরুচরণ তার শ্বশুর ছিল না, বাবা ছিল। অসীম মমতায় ঘিরে রেখেছিল তাকে। সর্দার মেয়েদের বিয়ে দিয়ে চাঁপারানীকে ছেলের বউ করে এনেছিল ঘরে। বাৎসল্যের সবটুকু চাঁপারানীকে দিয়ে দিয়েছিল গুরুচরণ। আসতে-যেতে মা মা। রামগোলাম জন্মানোর পর কোনো দিন বউমা বলে ডাকেনি তাকে; ডেকেছে রামগোলামের মা বলে। অঞ্জলি এ নিয়ে কত হাসিঠাট্টা করেছে সর্দারজির সঙ্গে। বলেছে, 'কই, কোনো দিন তো আমাকে শিউচরণের মা বলে ডাকলে না; কেবল অঞ্জলি, অঞ্জলি। আর বউয়ের ক্ষেত্রে অ রামগোলামের মা, কোথায় গেলে!' কপট অভিমান অঞ্জলির কণ্ঠে। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে সব কথা শুনছিল চাঁপারানী। অঞ্জলির অভিযোগে হো হো করে হেসে উঠেছিল শ্বশুরজি। উত্তরে বলেছিল, 'ও এই কথা! তোমাকে নাম ধরে ডাকি, ডাকতে ভালো লাগে বলে। আর বউকে রামগোলামের মা বলে ডাকি অন্য একটা কারণে।'

'কী কারণ?'

'রাম আমাদের হনুমানজির দেওতা। রামের জন্য জান বাজি রেখে লঙ্কায় গিয়েছিল হনুমানজি, লেজের আগুনে লঙ্কা পুড়িয়েছিল। এমনকি ছদ্মবেশে মন্দোদরির কাছে গিয়ে রাবণের জান-কবচের মৃত্যুশেল নিয়ে এসেছিল। এই

BanglaBook.org

রাম দেওতার আশীর্বাদে হনুমানজি অমর হলো এই পৃথিবীতে। আমাদের ধর্মমতে, যে দশজন অবতার আছেন, তাদের মধ্যে একজন হলেন রাম। তাঁর নাম নিলে অনেক পুণ্য হয়। নাতির নাম ধরলে তো দেওতার নামও ধরা হয়, তাই ওই নামে ডাকি বউমাকে।' রামগোলাম বলে।

এবার মুখে বাঁকা হাসি ফুটে ওঠে অঞ্জলির। বলে, 'শুধু কি এটাই কারণ?'

গুরুচরণ আমতা আমতা করে বলে, 'না না, আরও একটা কারণ আছে।'

'শুনতে চাইছি সেই কারণটা কী?'

গুরুচরণ বলে, 'রামগোলামকে যে আমি খুব ভালোবাসি। সে জন্মানোর পর আমার বুকটা ভরে গিয়েছিল। শিউচরণের মধ্যে কিছু খামতি আছে। শিউচরণের ম্যাড়ম্যাড়া ভাব আমার ভালো লাগে না। রাম জন্মানোর পর থেকে আমার কেন জানি মনে হয়েছিল, সে ভবিষ্যতে কিছু একটা হবে। যাক সে কথা। আদরের মানুষটির নাম মুখে মুখে রাখতে কে না ভালোবাসে, বলো। রামের নাম ধরার জন্যই তো বউমাকে রামগোলামের মা বলে ডাকি।'

সেদিন দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে হু হু করে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করেছিল চাঁপারানীর। অনেক কষ্টে নিজেকে দমন করে ওখান থেকে সরে গিয়েছিল সে।

আরেক দুপুরের কথা মনে পড়ে চাঁপারানীর। শ্রাবণ মাস ছিল। সকালে অঝোর ধারায় বৃষ্টি ঝরছিল। ওই বৃষ্টি মাথায় নিয়ে কাজে বেরিয়ে গিয়েছিল শ্বশুরজি। চার-চারটা ফজলি আম নিয়ে ফিরেছিল সেই দুপুরে। বৃষ্টি অনেকটা ধরে এসেছে তখন। একটু আগুপিছু সময়ে শিউচরণ আর অঞ্জলিও ফিরেছিল। ওদেরই সামনে সবচেয়ে বড় আমটি কেটে চিৎকার করে বলেছিল, 'রামগোলামের মা, কোথায় গেলে?'

চাঁপারানী কাছে এলে পাশের খাটিয়া দেখিয়ে বলেছিল, 'বসো, এইখানে বসো।' জড়সড় চাঁপারানী কী করবে, বুঝে উঠতে পারছিল না। তার ইতস্তত ভাব দেখে গুরুচরণ আবার বলেছিল, 'বসতে বললাম না তোমাকে! বসো, আমার পাশে বসো।'

চাঁপারানী সসংকোচে পাশে বসলে থালাভর্তি আম এগিয়ে দিয়েছিল তার দিকে। বলেছিল, 'খাও, খাও মা। গরিব আমরা। সব সময় ভালো ফলটল আনতে পারি না। আজ ডিউটি পড়েছিল রেয়াজুদ্দিন বাজারের মুখে। ওখানের দোকানে আম দেখে তোমার কথা মনে পড়ল মা।'

চাঁপারানী কী করবে ভেবে উঠতে পারছিল না। লোহার মতো কঠিন একটা মানুষের এ কী আচরণ! বিশ্বাসই করতে পারছিল না সে।

শিউচরণ স্নান করতে গেছে। অঞ্জলিকেও ডেকে পাশে বসিয়েছিল

BanglaBook.org

গুরুচরণ। বলেছিল, 'তুমিও খাও অঞ্জলি। আম দেখে রামগোলামের মায়ের কথা মনে পড়ল, তিন সের আম এনেছি। খাও, তুমিও খাও।'

আজ এই নিষ্প্রাণ রাত্রিতে বারবার ওই আম খাওয়ানোর দৃশ্যটি ঘুরেফিরে ভেসে উঠছে চাঁপারানীর খোলা চোখে। চিৎ হয়ে শুয়েছিল সে। দুই চোখের কোনা বেয়ে কখন জল গড়িয়ে বালিশ ভিজে গেছে, টের পায়নি চাঁপারানী। 'ও মারে!' বলে পাশ ফিরে শুয়েছিল অঞ্জলি। শাশুড়ির আওয়াজে বাস্তবে ফিরে এসেছিল চাঁপারানী।

গুরুচরণের দেহ ভস্ম হতে হতে বিকেল গড়িয়ে গিয়েছিল সাঁঝের দিকে। যে যার ঘরে ফিরে গিয়েছিল। মেয়েরা এসেছিল জামাই-সন্তানদের নিয়ে, কেঁদেছিল হাহাকার করে। তারাও ফিরে গিয়েছিল সাঁঝবেলাতে। বাপের বাড়িতে থাকার জায়গা নেই। তা ছাড়া বাচ্চাদের তো রান্না করে খাওয়াতে হবে!

রামগোলামদের পরিবারে নিরন্নের কাল। পরিবারের কেউ মারা গেলে সে বেলা ভাত রাঁধার নিয়ম নেই হরিজন-সমাজে। চুলায় আগুন দিতে নেই। ঘরে যদি রান্না করা কোনো ভাত-তরকারি থাকে, তা-ও ফেলে দিতে হয়। অশৌচের কাল তখন। বড়রা উপোস দেয় সে বেলা, ছোটদের এঘরে-ওঘরে নিয়ে যায় হরিজন-নারীরা। ছোটদের খাওয়ায় নিষেধ নেই। বড়দের ক্ষুধা মালুম হয় না। স্বজন হারানোর বেদনা তাদের কুরে কুরে খায় তখন।

দুপুরে খায়নি আর এত রাত পর্যন্তও যে পেটে দানাপানি পড়েনি মালুম হয় না রামগোলামের। ছাদে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে সে। বাবা-মা আর দাদি ঘরে ঢুকে পড়ার পর ছাদে উঠে এসেছিল রামগোলাম। বারান্দার ছোট্ট ঘরটিতে একদম ভালো লাগছিল না তার। খাটিয়ায় শুয়ে যেদিকে তাকাচ্ছিল, শুধু দাদুর কথা মনে পড়ছিল। ঘরটা দাদু প্রথম যেদিন বানাল, সেদিনের স্মৃতি বারবার মনে ভেসে উঠছিল তার। দাদুর কথাগুলো কানে এসে বাজছিল। কার জন্য ঘরটা তৈরি করেছ—জিজ্ঞেস করায় গুরুচরণ বলেছিল, 'নারে পাগলা, দাদির জন্য না। তোমার জন্যই এই ঘর বানিয়েছি। আজ থেকে এই ঘরে তুমি থাকবে। পড়বে, শোবে।'

আজ দাদুর বানানো ঘরে রামগোলাম শুয়ে আছে, দাদু নেই। মেথরপট্টিতে কোনো মানুষের একা থাকার জন্য আলাদা ঘর আছে—এটা ভাবনারও অতীত। সেই অসম্ভবকে সম্ভব করেছিল দাদু। নাতিকে একটা ঘরের মালিক করে দিয়েছিল গুরুচরণ। কী অসম্ভব আনন্দ যে লেগেছিল সেদিন! প্রথম রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে রামগোলাম শুধু এপাশ-ওপাশ করেছিল। আনন্দের

BanglaBook.org

আতিশয্যে ঘুম আসেনি গভীর রাত পর্যন্ত। মাঝেমধ্যে দাদু ঘরে ঢুকে মুখে তৃপ্তির হাসি ছড়িয়ে রামগোলামকে জিজ্ঞেস করত, 'কেমন লাগছে রাম? একা একা ভয় করছে না তো?'

রামগোলাম শুধু মিষ্টি মিষ্টি হাসত, মুখে কিছু বলত না।

একটা সময়ে ঘরটা রামগোলামের অসহ্য হয়ে উঠল। ঘরের চারদিক থেকে দাদুর স্মৃতি বারবার তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। স্মৃতির তাড়নায় অতিষ্ঠ হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল সে; এক ধাপ, দুই ধাপ করে ছাদে উঠে এল রামগোলাম। ছাদের পূর্ব ধারে বড় বড় পানির ট্যাঙ্ক। পশ্চিম পাশটা খোলা। দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করছিল না তার। পরিষ্কার মতন জায়গা দেখে শুয়ে পড়েছিল সে।

হেমন্তকাল হবে-টবে বোধ হয়। ওই তো সেদিন মনসাপূজা হয়ে গেল। শ্রাবণ মাসের শেষ দিনেই তো মনসাপূজা হয়। শ্রাবণের পরেই তো ভাদ্র। আষাঢ়-শ্রাবণ বর্ষাকাল, বর্ষার পর তো হেমন্ত। হেমন্তের আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ, কালো নয়—সাদা। কাশফুলের মতো। কর্ণফুলীর দক্ষিণপাড়ে সারি সারি কাশফুল, ডানে-বাঁয়ে, সামনে-পেছনে মাথা দোলায়। সেদিন স্কুল থেকে একটা কবিতা মুখস্থ করে ফিরেছিল রামগোলাম। তাদের ক্লাসে বাংলা পড়াতেন কুতুবুদ্দীন স্যার। সেদিন রবীন্দ্রনাথের 'আমাদের ছোট নদী' কবিতাটি পড়ালেন। পড়ানো শুরু করার আগে বললেন, 'নদী তো তোমরা চিন। ওই যে আমাদের পাশের নদী কর্ণফুলী। কী সোন্দর হানি তার। আঁকি-বাঁকি চইলছে বঙ্গসাগরের দিকে। অহন বাদলা দিন। কর্ণফুলী টইটম্বুর জলে। এইডারে কয় ভরা যৌবন। কিন্তু বর্ষাকাল চলি গেলে হানি থাকে না নদীতে। আমগো বড় কবি রবীন্দ্রনাথ জল নাই এমন একটা নদীরে লই এই কবিতাখানা লিখেছেন। কী অসম্ভব সোন্দর বিবরণ দেখ নদীটির।' তারপর তিনি পড়তে শুরু করলেন—

আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে,
বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে।
পার হয়ে যায় গরু পার হয় গাড়ি,
দুই ধার উঁচু তার ঢালু তার পাড়ি।
চিক চিক করে বালি কোথা নাই কাদা,
দুই ধারে কাশবন ফুলে ফুলে সাদা।

'কাশফুল দেইখ্ছনি তোমরা? কেমনে দেইখবা? শউরগা পোলাপাইন। শুধু পেলাস্টিকের ফুল দেইখ্ছ। শিমুল ফুল, মান্দারগাছের ফুল কোনো দিন দেখো নাই তোমরা।' বলতে বলতে আনমনা হয়ে গেলেন কুতুবুদ্দীন। আপনমনে

BanglaBook.org

বলতে লাগলেন, 'আহা রে, আঙ্গ বাড়ির ঘাটার আগায় কী সুন্দর একখানা মান্দারগাছ আছিল! শীতকালের আগে আগে করি হেই গাছে বোঝাই বোঝাই ফুল ধইত্তো। টুনটুনি পাখি, ভাউত্যা মনা মান্দারগাছের এই ঢালত্তোন ওই ঢালে যাইত। আঙ্গ বাড়ির পাশে আছিল হিন্দুপাড়া। হেরা সকালে মান্দারফুল লই যাইত। গোবররে গোল্লা করি করি ঘাটার আগায় থুইত। হেই গোবরের গোল্লার উপরে মান্দার ফুল গাঁথি গাঁথি দিত। হেরা বইল্‌তো—দেবতা নাকি খুশি অয় এই রকম করি ফুল দিলে।'

পেছনের বেঞ্চে বসা ছালামত দুষ্ট প্রকৃতির। সে আওয়াজ দেয়, 'স্যায়ার, আমাদের ছোট নদী।' কুতুবুদ্দীন বাস্তবে ফিরে আসেন। জিজ্ঞেস করেন, 'কী হড়াচ্ছিলাম যেন তোঙ্গোরে?'

'কাশফুল, কাশফুল স্যায়ার।' ছালামতের কণ্ঠে ফাজলামির আভাস। কুতুবুদ্দীন স্যারের সেদিকে খেয়াল নেই। বললেন, 'অ হ্যাঁ, মনে পইড়ছে। কাশফুল দেইখ্‌ছনি তোমরা? কী মনোরম কাশফুল ফুইটতো আঙ্গ বাড়ির ধারের খালের দুই তীরে! তোমরা যারা কাশফুল দেখো নাই, তাদের লাগি কইতাছি—কর্ণফুলীর দক্ষিণ পাড়ে লাখো লাখো সাদা কাশফুল ফুডি রইছে। সুযোগ থাইক্‌লে দেইখ্যা আইস্যো।' এরপর আরও কী কী যেন বলেছিলেন কুতুব স্যার। কিছুই কানে ঢোকেনি রামগোলামের। চোখে শুধু ভাসছিল কাশফুল। কাশফুলের পূর্ণ চেহারা নিজের মধ্যে তৈরি করতে পারছিল না রামগোলাম। কারণ, সে কোনোদিন কাশফুল দেখেনি। কুতুব স্যারের বর্ণনা শুনে তার মধ্যে কাশফুলের একটা অবয়ব তৈরি হচ্ছিল আর ভেঙে যাচ্ছিল। স্কুল ছুটির পর ঘরে ফিরেছিল রামগোলাম। সিঁড়িতেই পেয়ে গিয়েছিল দাদুকে। রামগোলাম জিজ্ঞেস করেছিল, 'কাশফুল দেখতে কেমন দাদু? নদীর ওই পাড়ে কিন্তু কাশফুল আছে, কুতুব স্যার বলেছেন। আজকেই নিয়ে চলো আমাকে, আমি কাশফুল দেখব।'

সে সন্ধেয় বান্ডেলপট্টিতে একটা জরুরি সালিস ছিল। কিন্তু নাতির আগ্রহের কাছে সেই সালিশ গুরুত্ব হারাল। গুরুচরণ একটা সাম্পান ভাড়া করে রামগোলামকে সাদা সাদা সারি সারি কাশফুল দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল সেই বিকেলে।

আজ এই গভীর রাতে ছাদে শুয়ে আকাশে কাশফুলের মতো সাদা মেঘ দেখে বালকবেলার সেই স্মৃতি মনে ভেসে উঠল রামগোলামের। খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘ দক্ষিণ থেকে উত্তরে ভেসে যাচ্ছিল। স্বচ্ছ নীলচে আকাশ। চাঁদ ডুবে গেছে অনেক আগে। কিন্তু তার আভা ছড়িয়ে আছে গোটা আকাশজুড়ে। তারারা

BanglaBook.org

জ্বলজ্বল করছে আকাশের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত। দাদু বলত—মানুষ মরে গেলে আকাশের তারা হয়ে যায়। সেই তারায় তারায় মানুষের মুখ ভাসে। যাদের চোখ আছে, ওই তারাগুলোর মধ্যে তাদের প্রিয়জনদের মুখ খুঁজে পায়।

রামগোলাম আকাশের অজস্র তারার দিকে তাকাতে তাকাতে ভাবে—তুমিও তো আজকে ওই তারাগুলোর মধ্যে জায়গা করে নিয়েছ দাদু! কোন তারাটি তুমি দাদু? কত খুঁজছি তোমাকে! একা করে রেখে গেলে আমাকে। এত তাড়াতাড়ি মরলে কেন তুমি? হরিজনদের দায়ভার তুমি আমার কাঁধে তুলে দিলে। বয়স কম আমার। তারপরও তুমি বললে—রাম, তুমি পারবে। আমি আছি না! তোমাকে বাতলে দেব সব।

কই বাতলে দিলে? আমার কাঁধে বোঝা চাপিয়ে ফুড়ুৎ করে উড়ে গেলে তুমি। হরিজনদের স্বার্থে কুড়াল মারছে এখন করপোরেশন। বড় সাহেব বলেছিলেন—হরিজনদের চাকরির ব্যাপারটি দেখবেন। কিন্তু আজ চার মাস পেরিয়ে যেতে চলল। বড় সাহেব কোনো ব্যবস্থা তো নিলেন না। মাঝখানে আমাকে চাকরি দিলেন, জুনিয়র জমাদার করলেন। আমি চাকরি করছি, বেতন পাচ্ছি। হারাধনবাবুকে কয়েকবার বলার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তার ওই এক কথা—পরে হবে, পরে হবে। বড়বাবু এখন নানা ঝামেলায় আছেন। তোমাদের কথা বলেছি আমি তাঁকে। উনি বলছেন—দেখি, কী করা যায়! আর রামগোলাম এত তড়পাচ্ছে কেন? ভদ্রলোকের চাকরি দিয়েছি আমি তাকে। নিজের চড়কায় তেল দিতে বলেন। গুরুচরণ মারা গেছে।

স্পষ্ট ভয় দেখাচ্ছেন আবদুস ছালাম সাহেব। দাবি-দাওয়া নিয়ে হইচই বাঁধালে চাকরি যাবে রামগোলামের। চাকরি গেলে কী হবে তার? কিছুই হবে না। বাপ চাকরি করে, দাদি আর মা চাকরি করে। তাদের টাকাতেই সংসার চলে। তার বেতনের টাকা খরচ হয় না। প্রথম মাসের বেতনটা এনে দাদুর হাতেই দিয়েছিল রামগোলাম। পাশে বসা ছিল অঞ্জলি। গুরুচরণ হাতে টাকাগুলো নিয়ে রামগোলামকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল, 'তোমার ঠাকুমার হাতেই তোমার বেতনটা তুলে দিলাম আমি। সামনে থেকে তার হাতেই দিয়ো।'

অঞ্জলি প্রতিবাদ করেছিল, 'মা-বাপকে দিক। সন্তানের বেতনের টাকা মা-বাবা হাতে পেলে খুব খুশি হয়।'

শিউচরণ আর চাঁপারানী হত্যে দিয়ে পড়েছিল অঞ্জলির সামনে, 'তা হবে না মা, রামের বেতন তুমিই নেবে।' সেই থেকে বেতনের টাকা দাদির হাতেই দিয়ে আসছে রামগোলাম। আবদুস ছালাম চাকরি খাওয়ার যতই ভয় দেখান না কেন, কিচ্ছু আসবে-যাবে না রামগোলামের। যাক চাকরি, পরোয়া নেই।

BanglaBook.org

তখন বেশি বেশি করে হরিজনদের অধিকার নিয়ে কথা বলা যাবে, আন্দোলন করা যাবে। হরিজনরা তার দিকে তাকিয়ে আছে। আর সে তাকিয়ে আছে বড় সাহেব আবদুস ছালামের দিকে। কবে বড় সাহেব বলবেন—তোদের কাকুতি-মিনতি আমার মনকে গলিয়ে ফেলেছে রে রামগোলাম। যা, আমি আমার আদেশ তুলে নিলাম। ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করার চাকরি শুধু তোদের হয়েই রইল। ওদের চাকরির অভাব নেই, অফিস-আদালত, স্কুল, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান— সবখানেই তো ওদের মানে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টানের চাকরির সুযোগ আছে। বিদ্যার জোরে বা বুদ্ধির জোরে অথবা মামা-শ্বশুরের জোরে ওরা ওই সব প্রতিষ্ঠানে চাকরি বাগিয়ে নিতে পারবে। আর তোরা নিজেদের যতই হিন্দু বলে দাবি করিস না কেন, আমি তো জানি উঁচু বর্ণের হিন্দুরা তোদের কত ঘৃণা করে! তোদের তো বিদ্যা নেই তেমন, বুদ্ধি থাকলেও তা মেথরপট্টির চার দেয়ালে মাথা কুটে মরে। আর মদো জাতি তোরা। মদ তোদের বুদ্ধিকে গিলে বসে আছে। তোরা আর যাবি কোথায়? গু-মুত-আবর্জনা টানার জন্য তোদের জন্ম। মেথর হয়ে জন্মেছিস বলে তোদের সামনের সব দরজা বন্ধ। তোদের সামনে শুধু একটি দরজা খোলা, করপোরেশনের গু-মুতের চাকরি। যা যা, আজ থেকে অনন্তকাল ধরে করপোরেশনের এই চাকরি বংশানুক্রমে তোরাই করে যাবি।

কিন্তু রামগোলাম জানে, আবদুস ছালাম এ কথা কখনো বলবেন না। এ ধরনের কথা বলার লোক তিনি নন। তাঁর মধ্যে মমতা বলে কিছুই নেই; আছে শুধু প্রচণ্ড ঘৃণা। রামগোলাম অনুভব করে, এই ঘৃণা আর ক্ষমতা দিয়ে বড় সাহেব হরিজনদের দুমড়ে-মুচড়ে দেবেন।

তন্দ্রামতন এসে গিয়েছিল রামগোলামের। গুরুচরণ যেন তার কানের কাছে ফিসফিসিয়ে বলল—ভয় পেয়ো না রামগোলাম। হরিজনদের জিয়নকাঠি তোমার হাতে। তুমি যদি থেমে যাও, ওরা যাবে কোথায়? চাকরি পাবে না তারা। ভিক্ষুক হবে তারা। শহরের অলিতে-গলিতে, বাজারে-মার্কেটে ভিক্ষা করে বেড়াবে। বলবে—দুদিন খেতে পাইনি বাবু, একটা টাকা দেও গো, রুটি কিনে খাব। আর জোয়ান মেয়েরা কী করবে জানো? দেহ বেচবে। সাহেবপাড়ার বেশ্যা হবে। টাইগারপাসের আধো-আলোর ফুটপাতে দাঁড়িয়ে বলবে—বেশি না, দশ টাকা দিলে চলবে।

ধড়ফড়িয়ে উঠে বসল রামগোলাম। সটান দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে দুই হাত তুলে চিৎকার করে বলল—তা হবে না, তা হতে দেব না। জান দেব, মেথরদের পেটে লাথি মারতে দেব না।

BanglaBook.org

চৌদ্দ

'আমাকে দুইটা নানরুটি দাও সওদাগর।' কাউন্টার থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে বলল রূপালী।

নারীকণ্ঠ শুনে ড্রয়ার থেকে সামনে চোখ তুলে তাকাল রশিদ সওদাগর। কপাল কুঁচকানো বিরক্তিময় চেহারাটির ওপর কামের একটা শিহরণ বয়ে গেল তার। একটা মোটা অঙ্কের টাকার হিসাব মিলছিল না। তার ভাই ক্যাশে বসে ছিল। বারবার গোনার পরও রেখে যাওয়া বান্ডেলে হাজার দেড়েক টাকার গরমিল। 'কালাইম্যা হারামজাদাই টাকাটা মাইরা দিছে'—বলতে বলতে সামনে তাকিয়েছিল রশিদ সওদাগর। সামনে দাঁড়ানো রূপালীকে দেখে তার কলজের বোঁটায় একটু টান পড়ল, নাক দিয়ে গরম হাওয়া বইতে লাগল। এ হাওয়া শ্রমের নয়, কামের। আজ সাত দিন হলো হাজেরা আন্ডাগোন্ডা নিয়ে বাপের বাড়িতে গেছে। দুই দিন পর বাপের বাড়ি থেকে ফেরার কথা থাকলেও সাত দিনেও ফেরেনি হাজেরা। প্রতি রাতে বউ না চাটলে রশিদের আবার ঘুম আসে না। রূপালীকে দেখে রশিদের মন ফুর্তিতে ভরে উঠল। শরীরে চনমনে একটা শিহরণ অনুভব করল রশিদ।

বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে চিবুক ডলতে ডলতে বলল, 'শুধু দুইখান নান? আর কিছু না? একটু ভাজিভুজি!'

রূপালী বলল, 'ভাজি তো চাইনি আমি। নান চাইছি—নান দাও দুইটা।' রশিদ রূপালীর নাভির কাছে গভীর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বলল, 'শুধু দুইখান রুটি দিয়া পেট ভইরবে?'

ঝাউতলার মেথরপট্টি থেকে সামান্য দূরে রাস্তার পাশে 'রশিদ রেস্টুরেন্ট।'

সকালে ধুন্ধুমার বিক্রি এ রেস্টুরেন্টে। পরোটা, স্যুপ, পায়া, ভাজি, মুগডাল, ডিম, মামলেট গোগ্রাসে গিলে কাস্টমাররা। টেবিলবয়রা দিয়ে কূল পায় না। দশটায় আসে শিঙাড়া-চমুচা। চারটার দিকে ভিড় একটু হালকা হয়। ছোট ভাই কালামকে কাউন্টারে বসিয়ে ঘরের দিকে রওনা দেয় রশিদ। সন্ধে লাগা লাগা

BanglaBook.org

সময়ে রশিদ ফিরে আসে রেস্টুরেন্টে। সন্ধের দিকে দোকানে হালকা ভিড়। লোকাল ছেলেরা টেবিলজুড়ে আড্ডা দেয় তখন। আজ কাউন্টারের পাশের টেবিলে আড্ডা দিচ্ছিল খলিল, বাচ্চু, কানা জামাল আর সোহেল। সবারই বয়স বাইশ থেকে চব্বিশ। রশিদ সওদাগরের চোখের ভাষা তাদের দৃষ্টি এড়ায় না। কানা জামাল কাজির দেউড়ি বাজারে কসাইয়ের দোকানের হেলপার; খলিল-বাচ্চু বটতলি রেলস্টেশনে কুলির কাজ করে, সুযোগ বুঝে প্যাসেঞ্জারের ব্যাগবুগ নিয়ে সটকে পড়ে। সোহেল ফারজানা মাগির দালাল। ফারজানা নিউমার্কেটের দক্ষিণ পাশে সন্ধের দিকে সেজেগুজে পূর্ব-পশ্চিমে পায়চারি করে। সোহেল কাস্টমার জোগাড় করে আর হুড তোলা রিকশা বা ট্যাক্সিতে ফারজানাকে তুলে দেয়।

'হেই সওদাগর, এত কথা বলছ কেন? দুইটা নানরুটি চাইছি, তাই দাও।' শান্তকণ্ঠে বলে রূপালী।

রশিদ মোটা, থলথলে। হরদম চেয়ারে বসে থাকতে থাকতে ভুঁড়ি বেড়ে গেছে তার। দূর থেকে মনে হয়, বাচ্চা কোলে নিয়ে বসে আছে রশিদ। চেয়ারে বসলে গায়ের জামা নাভির ওপরে উঠে আসে। ডান হাতের তর্জনী কাপের আকারের নাভিতে ঢুকিয়ে চুলকাতে চুলকাতে বলল, 'রাগ করতাছ ক্যান সোনা? ভাজির টাকা লাগব না, সোনা।'

অবাক হয়ে রশিদের দিকে ভালো করে তাকায় এবার রূপালী। তার চোখের ভাষা বুঝতে দেরি হয় না রূপালীর। 'সোনা ডাকছ কাকে তুমি? ভিক্ষা দিতে চাইছ তুমি আমাকে?'

'সোনা, সো-না।' পাশের টেবিল থেকে আওয়াজ ওঠে।

হরিজন-নারীরা সেজেগুজে থাকতে বেশ পছন্দ করে। খুব দামি কাপড়চোপড় কেনার সামর্থ্য তাদের নেই। তিব্বত স্নো, সস্তা দামের লিপস্টিক, নেলপলিশ—এগুলো মেখেমুখে নিজেদের সাজিয়ে তোলে এরা। সামান্য সাজপোশাকে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে তারা। রূপালীও নিজেকে সজ্জিত করে রাখতে ভালোবাসে। কিন্তু আজ রূপালীর কাপড়চোপড় আলুথালু। শাড়ির পাড় ঠেলে সস্তা ব্লাউজের বাধা না মেনে ডান দিকের স্তনটা বেরিয়ে আছে। নাভির আশপাশটা দেখা যাচ্ছে। এলো করে চুল বাঁধা। এ সবকিছু মিলে রশিদের চোখে কামজাগানিয়া হয়ে উঠেছে রূপালী। নিজের দিকে খেয়াল নেই রূপালীর। সে বড় ক্ষুধার্ত এখন।

আজ কাজে খুব খাটুনি গেছে রূপালীর। বড় সাহেবের বাংলোতে কাজ পড়েছিল আজ। সে আর চাঁপা বৌদিকে ডেকে হারাধনবাবু বলেছিলেন, 'আজ

BanglaBook.org

তোমাদের ডিউটি বড় সাহেবের বাংলোতে। বাংলোর চারদিকে খুব নোংরা হয়ে আছে নাকি। ওগুলো পরিষ্কার করবে তোমরা।' সত্যি খুব নোংরা হয়ে ছিল ঘরদোর, আশপাশ, রান্নাঘরের পেছনটা। দেয়াল ঘেঁষে ঘেঁষে আবর্জনার স্তূপ। কাজের বেটিরা বাইরের ডাস্টবিনে ময়লা-আবর্জনা ফেলেনি, দেয়ালের ভেতরের এখানে-ওখানে ফেলেছে। নানা তরিতরকারির ডাঁটা, চামড়া, মুরগির নাড়িভুঁড়ি, পালক, কাচভাঙা, প্লাস্টিকের টুকরা-টাকরা, কলার খোসা, কাঁঠালের ভুতি, ডাবের ফালা—এসব বড় সাহেবের বাংলোকে কিম্ভূতকিমাকার করে রেখেছে। সেই সকালে দুজনে হাত লাগিয়েছিল ওসবে। দুপুর ছাড়িয়ে বেলা পশ্চিমে গড়িয়েছে, তারপরও কাজ শেষ করতে পারেনি রূপালীরা। বড় সাহেবের বউ দূরে দাঁড়িয়ে তাগাদার পর তাগাদা দিয়েছে—'তাড়াতাড়ি করো, জলদি হাত চালাও। কাজ শেষ করে বাড়ি যাবে, তার আগে নয়।' দুপুর হলে উঠানে খেলায়রত বাচ্চাটিকে ডেকে নিয়েছে, 'রাব্বি, এসো। খাওয়ার সময় হয়েছে। এখন আর খেলতে নেই।' দুজন নারী সেই সকাল থেকে যে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করছে, সেদিকে মেমসাহেবের খেয়াল নেই। উঠানে বেওয়ারিশ কুকুর থাকলেও তো মানুষ তু-তু করে একদলা খাবার ছুঁড়ে দেয়! রূপালী-চাঁপারানী কুকুরের চেয়েও অধম। নইলে কেন মেমসাহেব পচাবাসি খাবারও তাদের দিকে ঠেলে দিল না। শুধু—জলদি করো, জলদি করো।

ক্ষুধার্ত শরীর নিয়ে রূপালী বাড়ি ফিরেছিল সেই শেষ বিকেলে। ইন্দললাল তখনো ফেরেনি। রাঁধতে ইচ্ছে করছিল না রূপালীর। কিন্তু ক্ষুধার সামনেও তো বাঁধ দিতে হবে! চোখেমুখে ঝপাঝপ জল ছিটিয়েছিল রূপালী। হাত-পা-গলা ভিজে গামছা দিয়ে মুছে, চুলটাকে একটু আলগা করে রশিদের দোকানে গিয়েছিল দুটি নানরুটির জন্য।

'সোনা, সোনা' আওয়াজ শুনে ঝপ করে ফিরে তাকাল রূপালী। চোখাচোখি হতেই কানা জামাল অশ্লীলভাবে তার একমাত্র চোখটি টিপল। সোহেল দালাল জিহ্বা বের করে বিকৃত ভঙ্গি করল। খলিল বাচ্চু জোরে জোরে টেবিল থাপড়াল। দোকানে তেমন কোনো কাস্টমার নেই। কোনার টেবিলে মধ্যবয়সী একজন চায়ে পরোটা ডুবিয়ে খাচ্ছে আর চোখ কুঁচকে এদের কাণ্ডকারখানা দেখছে।

'হারামির পুত, সোনা ডাকস কারে?' গর্জে ওঠে রূপালী। তার ডান হাতের তর্জনী চ্যাংড়াদের দিকে প্রসারিত। ডান হাত ওপরে তোলার কারণে রূপালীর ডান স্তন আঁচলের তলা থেকে আরও বেরিয়ে আসে। সেদিকে লোভী নজর ফেলে রশিদ বলে, 'দুষ্টু ছেলে ওরা। ওদের কথায় কান দিয়ো না। তুমি আমার

BanglaBook.org

কাছে এসো।' বিশুদ্ধ বাংলায় চিবিয়ে চিবিয়ে কথাগুলো বলে রশিদ। তারপর কৃত্রিম রাগের গলায় লোকাল ছেলেদের উদ্দেশে বলে, 'এ-ই দুষ্টু ছেলেরা, ফাজলামি কোরো না। সোনা ডাকছ কাকে? ও কি সোনার মতো নাকি? সোনার আকার কি ওর মতো নাকি?'

রশিদের অসভ্যতা বুঝতে রূপালীর দেরি হয় না। তার কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। কোথায় ফাজিলদের দাবড়াবে, তা না, ওদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে অশ্লীল ইঙ্গিত করছে রশিদ। রূপালী আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। হুংকার দিয়ে উঠল, 'ওই খানকির পোলা সওদাগর, আমার লগে বাজে কথা কস? ওই বেতমিজদের সাথে মিশ্যা আমারে অপমান করস?'

রশিদ এই রকম প্রতিবাদের জন্য প্রস্তুত ছিল না। রূপালীর কথা শুনে প্রথমে সে হতভম্ব হয়ে গেল। মেথরানি বলে কী? দুই টাকার মেথরানি, তার মুখে গালিগালাজ, তা-ও আবার তাকে? এই এলাকার নামকরা রেস্টুরেন্ট—রশিদ রেস্টুরেন্ট। তার মালিক সে! তাকে গালাগালি? রূপালীর জন্য ভেতরে যে একটা চনমনে শিহরণ জেগেছিল, তা মুহূর্তেই উবে গেল। সেখানে জেগে উঠল ক্রোধ। চোখ লাল করে রশিদ বলল, 'কী কইলি, খানকি? চোদমারানি, চিনস আমারে? তোর মতো মেথরানিরে বিনা পয়সায়ও চুদি না আমি। গায়ে হাত দেওনর আগে বাইরাইয়া যা আমার দোকান থেইকা।'

বিয়ে হওয়ার পর রূপালী নিজেকে অনেক গুটিয়ে ফেলেছিল। রাগ-প্রতিবাদ এগুলোকে পরিহার করে দাম্পত্যজীবনে মন দিয়েছিল রূপালী। ইন্দলও তাকে ঘাঁটাত না। তার মনমেজাজকে সমঝে চলত। বাল্লু-কোকিলার স্নেহ আর ইন্দলের ভালোবাসায় রূপালীর দাম্পত্যজীবন সুখকর হয়ে উঠেছিল। হোক না সে মেথর। মেথরদেরও তো সুখী হওয়ার অধিকার আছে, সুন্দরভাবে চলবার স্বপ্ন আছে! সেই অধিকার ও স্বপ্ন দিয়েই নিজের জীবনটাকে সাজিয়ে তুলেছিল রূপালী। কিন্তু আজ এগুলো কী হচ্ছে? সওদাগর এ রকম বিশ্রী ভাষায় গালি দিচ্ছে কেন তাকে? অন্য সম্প্রদায়ের কোনো নারী হলে সওদাগর কি এ রকম বিশ্রী কথা বলার সাহস পেত? সে মেথর—সে জন্য কি এ রকম অশ্লীল কথাবার্তা? রূপালীর ভেতরে প্রচণ্ড ক্রোধ দলা পাকিয়ে উঠল। প্রতিবাদে ফেটে পড়ল রূপালী, 'শুয়রকা লেড়কা, মা-চোদ। হামে গালি দে রাহা হে তু?' বলতে বলতে পাশের চেয়ারটি উল্টে মেঝেতে ফেলে দিল রূপালী।

রে রে করে এগিয়ে এল চ্যাংড়ারা। রূপালী কোমরে শাড়ির আঁচল গুঁজে চিৎকার করে বলল, 'আয় দেখি, গায়ে হাত দিয়ে দেখ কী করি।'

কাউন্টার থেকে রশিদ নেমে এল। চ্যাংড়াদের ঠেলে পেছনে সরিয়ে দিয়ে

BanglaBook.org

বলল, 'এই, তোরা কি পাগল হইয়া গেছস? মেথর ছুঁইলে গোসল করতে হয় জানস না? এ সময় গোসল করবি নাকি তোরা?' তারপর রূপালীর দিকে ফিরে বলল, 'ওই মাগি, তুই কী করবি, এ্যাঁ? তুই আমার চনুর বাল ছিঁড়বি? আমি দোকানে আছি, কী দেখাইতে পারস, দেখা দেখি।'

রূপালী আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। হু-হু করে কেঁদে দিল। এই এত বয়স পর্যন্ত অন্য সম্প্রদায়ের কেউ কোনোদিন তাকে অপমান করেনি। আর আজ? বিনা অপরাধে এত বড় অপমান! কাঁদতে কাঁদতে মেথরপট্টিতে ফিরে গেল রূপালী।

মিনিট দশেকের মধ্যে দুই-চার-পাঁচ করে করে মেথররা জমা হতে লাগল রশিদ রেস্টুরেন্টের সামনে। এল ইন্দলালও। আধঘণ্টার মধ্যে চারটি পট্টির মেথররা ভেঙে পড়ল রশিদের দোকানে। দোকানে তখন কাস্টমারের ভিড়। রশিদ টাকা নিতে ব্যস্ত। চ্যাংড়ারা আড্ডা দিয়ে বেরিয়ে এলে রূপালী দেখিয়ে দিল—এরাই অপমান করেছে তাকে। রামগোলাম এগিয়ে এল সামনে। তাকে ঠেলে কার্তিক ঝপ করে কানা জামালের কলার চেপে ধরল, 'খানকির পোলা, তুই গাল দিয়েছিস আমাদের রূপালীকে?'

এতগুলো মানুষকে একত্রে দেখে ভয় পেলে গেল চ্যাংড়ারা। দোকানের কাস্টমাররাও খাওয়া ফেলে জটলার দিকে তাকিয়ে থাকল। রশিদ টাকা নেয়ায় ব্যস্ত ছিল। কার্তিকের উঁচু গলা শুনে সামনে তাকাল। রূপালীকে দেখে ভয় পেয়ে গেল সে-ও। বড় একটা ঢোঁক গিলে মোলায়েম কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'কী, কী হয়েছে? এত গন্ডগোল কিসের?'

রামগোলাম এগিয়ে এল কাউন্টারের দিকে, পাশে রূপালী। রূপালীকে দেখিয়ে রামগোলাম জিজ্ঞেস করল, 'তুমি একে অপমান করেছ? খারাপ কথা বলেছ তাকে?'

'কই, না তো? আমি কেন ওকে খারাপ কথা বলতে যাব?' আমতা আমতা করে বলল রশিদ।

রূপালী চিৎকার করে কাউন্টারের টেবিলে থাপ্পড় মেরে বলল, 'মিথ্যা কথা বলেছে ও আমাকে।' পাশে ইন্দলালাল দাঁড়িয়ে। রক্তচক্ষু তার।

'দেখো মেয়ে, মিথ্যে কথা বলো না। আমি তোমার চেয়ে বয়সে বড়। মিথ্যে মিথ্যে আমাকে ফাঁসাইও না। বদনাম হলে আমার দোকানটা বরবাদ হয়ে যাবে।' পাকা অভিনেতার কণ্ঠে কথাগুলো বলল রশিদ। ওই সময় বাইরে ধুপধাপ, ফটাস-ঠাস আওয়াজ হলো। শোনা গেল, 'আর করুম না, খারাপ কথা কমু না আর।' কার্তিক কলার চেপে কানা জামালকে কাউন্টারের কাছে নিয়ে

BanglaBook.org

এল। বাইরে তখন মেথররা গিজগিজ করছে। সবার হাতে টাট্টির টিন, আবর্জনার পোঁটলা। তারা সর্দারের আদেশের জন্য অপেক্ষা করছে। সর্দার রামগোলাম আদেশ দিলেই দোকানের ভেতরে ও বাইরে টাট্টি-আবর্জনা ছড়িয়ে দেবে। হই-হল্লা শুনে এলাকার মানুষরাও জড়ো হয়ে গেছে। কেউ বলছে, 'মেথরদের এত বড় সাহস! আমাদের মুসলমান ভাইয়ের গায়ে হাত!' আবার কেউ বলছে, 'মেথরের মেয়েটিকে একা পেয়ে বলাৎকার করতে চেয়েছে রশিদ সওদাগর। মেথর হয়েছে তো কী হয়েছে? ওরা মানুষ না? আমাদের মেয়েদেরকে এ রকম করলে কল্লা নামিয়ে ফেলতাম না আমরা?' আর কেউ বলছে, 'ওদের ব্যাপার নিয়ে আমাদের মধ্যে ঝগড়া করে লাভ কী? পারলে ওয়ার্ড কমিশনারকে খবর দেন। ব্যাপারটা লেজেগোবরে হয়ে যাওয়ার আগে সমাধান হোক।'

'বল কানাইয়া, বল, সওদাগর রূপালীকে কী বলছে?' এর আগে কানা জামালের গালে, নাকে দু-চারটা চড়থাপ্পড় পড়েছে। এ রকম পরিস্থিতির সামনে সে আগে কখনো পড়েনি। কাজির দেউড়ির বাজারে কত সুন্দর সুন্দর নারীকে জঘন্য কথা বলেছে! কিন্তু কেউ তো এ রকম করে প্রতিবাদ করেনি, কলার চেপে ধরেনি; চড়থাপ্পড়ও দেয়নি কেউ। এতগুলো মানুষকে দেখে ভয় পেয়ে গেছে কানা জামাল। কার্তিকের ধমকে গড়গড় করে বলল, 'আমরা দোকানে চা খাচ্ছিলাম, রশিদ সওদাগর এই মেয়েটিকে কুকথা বলেছে।'

'কী, কী হারামি! আমারে দোষ দিতাছস! আমার দোকানে বইসা বইসা বিনা পয়সায় চা-নাশতা গিলিস আর এখন আমার নামে বদনামি!' বলেই কাউন্টার থেকে নেমে এল রশিদ। জামালের গালে ঠাস ঠাস করে চড়াতে লাগল রশিদ। ইন্দল কিছু বলতে চাইলে হাত তুলে মানা করল রামগোলাম। জামাল মাটিতে পড়ে না যাওয়া পর্যন্ত চড়াল রশিদ। রামগোলাম বলল, 'খায়েস মিটেছে সওদাগর? এবার রূপালীর পা ধরে মাফ চাও।'

ভিড়ের মধ্যে কে যেন গর্জে উঠল, 'কী, মেথরানির পা ধরে মাফ চাইবে আমার ভাই! মেথরের বাচ্চাদের এত সাহস!' সবাই দেখল, রশিদের ছোট ভাই কালাম গজরাতে গজরাতে দোকানের ভেতর ঢুকছে। তার পিছু পিছু আট-দশজন হরিজনও ঢুকে পড়ল দোকানে। তাদের সবার হাতে গুয়ের টিন।

ভাইকে দেখে বুকে সাহস ফিরে পেল রশিদ সওদাগর। বলল, 'মাফ চাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। দেখি, তোরা কী করতে পারস?'

এ সময় ঝুপ করে এক পোঁটলা ময়লা এসে পড়ল কাউন্টারের সামনে। তার পর বাইরে থেকে ঝপাঝপ আসতে লাগল ময়লা।

BanglaBook.org

এ সময় বাইরে থেকে আওয়াজ ভেসে এল, 'থামো, তোমরা থামো। কী হয়েছে, দেখি।' ভিড় ঠেলে ওয়ার্ড কমিশনার ফারুক মেহেদি দোকানে ঢুকলেন। রশিদ যেন প্রাণ ফিরে পেল। গত ইলেকশনে কমিশনারের কর্মীদের জন্য চা-পরোটা ফ্রি করে দিয়েছিল রশিদ। নিশ্চয় কমিশনার সাহেব মেথরদের দাবড়াবেন এবার। উঁচু গলায় বলল, 'কমিশনার সাব, আমারে বাঁচান। খানকির পোলারা আমার নামে মিথ্যা বদনাম দিতাছে। এই মাইয়াডারে নাকি আমি কুকথা কইছি। এর কথা শুইন্যা পট্টি ভাইঙ্গা মেথররা আইছে আমার দোকানে। আর এই চোদমারানির পোলা বলে সর্দার! হে আমারে কয়, আমি বলে মেথরানির পা ধইরা মাফ চাইতাম।'

'থামো তুমি রশিদ। সব কথা শুনতে দাও আমাকে।' পরের ইলেকশন ঘনিয়ে এসেছে। মেথরদের ভোটের সংখ্যা কম নয়। ফারুক মেহেদির দৃষ্টি মেয়র পদের দিকে। মেথরদের কাছে টানার এই সুযোগ।

ফারুক মেহেদি একটা চেয়ারে বসলেন। জামাল-সোহেল-খলিল-বাচ্চুকে সামনে আনতে বললেন। রূপালীকে কাছে ডাকলেন। মনোযোগ দিয়ে তাদের সব কথা শুনলেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নানা প্রশ্ন করলেন রশিদকে। কমিশনার বুঝলেন—নাটের গুরু রশিদ। রায় শোনানোর আগে কমিশনার কিছুক্ষণ চুপ মেরে থাকলেন। বাইরে সম্মিলিত কণ্ঠে আওয়াজ উঠল—'উচিত বিচার করেন কমিশনার সাব। নইলে টাট্টি আমাদের হাতে আছে। দোকানটাকে টাট্টিখানা বানাইয়া ছাড়ব।'

কমিশনার ফারুক মেহেদি গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'মাফ চাও তুমি রশিদ। অনেক বড় অন্যায় করেছ তুমি। সামনে এসে হাত দুইটা একত্র করে রূপালীর কাছে মাফ চাও।'

বাইরে থেকে আওয়াজ এল, 'পায়ে ধরে মাফ চাইতে হবে।' গুঞ্জন শুরু হলো হরিজনদের মধ্যে। এই ফাঁকে রশিদকে উদ্দেশ্য করে চাপা স্বরে ফারুক মেহেদি বললেন, 'মেথরদের ঘাঁটাতে তোমাকে কে বলেছে? তোমার দোকানে এরা এখন যদি পায়খানা ঢেলে দিয়ে যায়, তোমার দোকানের কী অবস্থা হবে ভেবে দেখেছ? শহরের ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করে এরা। করপোরেশন ওদের পক্ষ নেবে। পুলিশরাও তাদের ঘাঁটাবে না। জলদি করো। আবর্জনা-টাট্টি ছোঁড়াছুঁড়ির আগে মাফ চেয়ে নাও।'

বাইরে তখন হট্টগোল। কমিশনার সর্দার রামগোলামের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দেখো সর্দার, হাজার হলেও রশিদ বয়স্ক লোক। রূপালীর বয়স কম। পায়ে ধরা থেকে রেহাই দাও রশিদকে। তুমি তোমার মানুষদের

BanglaBook.org

বলো—এবারের মতো ক্ষমা করে দিতে। হাতজোড় করে মাফ চাইবে রশিদ, তোমরা শান্ত হও।'

সর্দার রামগোলাম তা-ই বলল হরিজনদের। হরিজনরা শান্ত হলো। রশিদ কমিশনারের আদেশমতো রূপালীর সামনে গিয়ে ক্ষমা চাইল। চ্যাংড়ারা রূপালীর পায়ের কাছে বসে থাকল।

হরিজনরা ফিরে গেল যার যার পট্টিতে। পাশাপাশি হেঁটে ঘরে ফিরতে ফিরতে ইন্দল বলল, 'একা কেন গিয়েছিলে ওই হারামির দোকানে?'

'বড় খিদে পেয়েছিল। হাড়ভাঙা পরিশ্রম গেছে আজ। তুমি ফিরতে দেরি করলে। রাঁধতে ইচ্ছে করল না। দুইটা রুটির জন্য গেলাম রশিদের দোকানে। আর হারামিরা আমাকে গালি দিল, কুকথা বলল!'

ইন্দল দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'আমাদের আরও বেশি সাবধান হতে হবে রূপালী। মেয়ে দেখলে ওদের জিহ্বা থেকে লালা ঝরে, চোখ চকচক করে ওদের। আরও অনেক বেশি সাবধানে চলতে হবে তোমাকে।'

পনেরো

ফিরিঙ্গিবাজার সেবক কলোনি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এখন আবদুল আজিজ। কল্যাণী সরকার অন্য স্কুলে বদলি হয়ে গেছেন। আবদুল আজিজকে এ স্কুলে বদলি করার জন্য কল্যাণী সরকারকে বদলি করা হয়েছে। দীর্ঘদিন কল্যাণী সরকার এই স্কুলে প্রধান শিক্ষকতা করছেন। বাড়ি তাঁর ফতেয়াবাদ। চাকরির কারণে বংশাল রোডে বাসা নিয়েছেন। অনেকদিন ধরে তিনি আত্মীয়স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন। নিঃসন্তান তিনি। স্বামী চির রুগ্‌ণ। হাঁপানির টান তাঁর। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে টানও জোরদার হয়েছে। কল্যাণী যতক্ষণ স্কুলে থাকেন, মন পড়ে থাকে ঘরে। কোন্ সময় স্বামীর টান ওঠে! পট্টির মনিরামের মেয়েকে বাসায় রেখেছেন। দশ-বারো বছরের তাপসী। তার পক্ষে কল্যাণীর ভারী শরীরের স্বামীকে সামাল দেয়া কঠিন। স্বামী যতই অসুস্থ হোন, কাজে অবহেলা দেখাতে রাজি নন কল্যাণী সরকার। অনেকগুলো বছর

BanglaBook.org

কেটে যাওয়ার পর তিনি ঠিক করলেন, জন্মস্থানে ফিরে যাবেন। তাঁর শ্বশুরবাড়ি বাপের পাড়ায়। ফতেয়াবাদ অঞ্চলের কোনো একটি বিদ্যালয়ে বদলি হতে পারলে স্বামীর দেখাশোনার ভারটি স্বামীর অথবা নিজের কোনো-না-কোনো আত্মীয়ের হাতে তুলে দেয়া যাবে। তা ছাড়া বয়স হয়ে গেছে তাঁর। স্বামীর সেবা করতে করতে ভেতরে ভেতরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন তিনি। সন্ধেয় স্বামী বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাতরান। কল্যাণী একাকী নির্জন বারান্দায় বসে বসে অন্ধকার দেখেন। নিঃসঙ্গতার কারণে তাঁর মধ্যে একটা গভীর বিষণ্নতা তৈরি হয়েছে। বিষণ্নতায় আক্রান্ত কল্যাণীর মন মাঝেমধ্যে চঞ্চল হয়ে ওঠে। দিনরাত তাঁকে অনেক মানুষ ঘিরে রাখুক, নিকটাত্মীয়রা তাঁর চারদিকটা মুখর করে রাখুক—এ তিনি কামনা করেন। কিন্তু এই ইট-কাঠের শহরে তা সম্ভব নয়। এখানকার মানুষরা শুধু নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। অন্যের সুখ-দুঃখের খোঁজ নিতে শহুরেরা কোনোক্রমেই রাজি নয়। তিনি ঠিক করেন, এই শহরে আর না। তাঁর চাই আত্মীয়স্বজনের সান্নিধ্য, তার চাই নিবিড় গাছপালা; চাই জলভরা পুকুর। এসব ভাবতে ভাবতে তিনি একটি দরখাস্ত লেখেন, বদলির দরখাস্ত। ফতেয়াবাদের নন্দীগ্রামের আশপাশের যেকোনো স্কুলে বদলি হতে চান তিনি। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম শাখায় দরখাস্তটি জমাও দিয়ে আসেন এক দুপুরে। প্রথম প্রথম বদলির খোঁজখবর নিলেও একটা সময়ে তাঁর বদলিস্পৃহায় ভাটা লাগে। তিনি খোঁজ নেয়া বন্ধ করে দেন।

কিন্তু এক বিকেলে তাঁর কাছে দপ্তর থেকে একটা খাম আসে। খুলে দেখেন, তাঁকে ফতেয়াবাদ প্রাইমারি স্কুলে বদলি করা হয়েছে, প্রধান শিক্ষক পদে। গত মাসে এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক সন্ধের দিকে পা পিছলে পুকুরে পড়ে গিয়ে মারা গেছেন। আর কল্যাণীর জায়গায় পদায়ন করা হয়েছে আবদুল আজিজকে। আবদুল আজিজের বাড়ি সীতাকুণ্ডে। বাড়ির পাশের স্কুলেই তিনি দীর্ঘদিন প্রধান শিক্ষকতা করে আসছিলেন।

দীর্ঘদিন এক জায়গায় চাকরি করলে, বিশেষ করে ওই জায়গা যদি নিজ এলাকা হয়, তাহলে মানুষ স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে। আবদুল আজিজের ক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছে। তাঁর কয়েক কানি ধানি জমি আছে। ভোর-সকালে কামলা নিয়ে তিনি জমিতে চলে যান, অনেক বেলা পর্যন্ত তিনি হাল-চাষে নিমগ্ন থাকেন। স্কুলের সময় যে পেরিয়ে যাচ্ছে, সেদিকে তাঁর খেয়াল থাকে না। তাঁর স্বেচ্ছাচারিতায় সাধারণ শিক্ষকরাও সুযোগ পেয়ে গেছেন। তাঁরাও ইচ্ছেমতো স্কুলে যাতায়াত করেন। শিক্ষকের অভাবে পড়ুয়ারা স্কুলঘরে ও স্কুল-মাঠে হইচই করে, নিজেদের মধ্যে মারামারি করে, পাশের বাড়ির ফলের গাছ থেকে

BanglaBook.org

ফল পাড়ে এবং একটা সময়ে দল বেঁধে স্কুল ত্যাগ করে।

এসব খবর একদিন অধিদপ্তরে পৌঁছায়। চট্টগ্রাম শাখা থেকে স্কুল পরিদর্শক স্কুলে এসে প্রাপ্ত সংবাদের সত্যতা খুঁজে পান, আশপাশের মানুষের সঙ্গে কথা বলে প্রধান শিক্ষক আবদুল আজিজের স্বেচ্ছাচারিতার প্রমাণ পান। অধিদপ্তরে এসে তিনি আজিজ সাহেবের বদলির ব্যবস্থা করেন। ফাইল থেকে কল্যাণী সরকারের আবেদনটি বের করে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কল্যাণীকে ফতেয়াবাদ প্রাইমারি স্কুলে বদলি করেন আর আবদুল আজিজকে পানিশম্যান্ট ট্রান্সফার করেন ফিরিঙ্গিবাজারের প্রাইমারি স্কুলে।

মনে অনেক আনন্দ নিয়ে কল্যাণী সরকার ফিরে যান ফতেয়াবাদে আর অনেক ক্ষোভ নিয়ে আবদুল আজিজ যোগ দেন ফিরিঙ্গিবাজার সেবক কলোনি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।

আবদুল আজিজ সেবক কলোনি প্রাইমারি স্কুলে যোগদান করে শ্যামলী দে আর হরিমোহন জেঠাদাসকে পেয়ে যান। কল্যাণী সরকারের চাপে যে ঘৃণা এত দিন এই দুজন মনের মধ্যে চেপে-চুপে রাখতেন, আজিজ সাহেবের প্রশ্রয় ও প্ররোচনায় তা প্রকট আকার ধারণ করে। গ্রাম্য এবং গ্রামীণ জীবনে অভ্যস্ত আবদুল আজিজ। সীতাকুণ্ডের হরিণমারা গ্রামের সীমাবদ্ধ জীবনে আবদুল আজিজের মধ্যে মানবতা তেমন করে বিকশিত হয়নি। তিনি ধর্মকর্ম করতেন বটে, কিন্তু তা ছিল শুধু আচরণে সীমিত।

তিনি মানুষকে ভালোবাসতে শেখেননি; ভালোবাসতে শিখেছেন সংকীর্ণতাকে। প্রান্তিক মানুষের জন্য তাঁর মধ্যে কোনো দায়িত্বশীলতা তৈরি হয়নি। দায়িত্বজ্ঞানহীন সংকীর্ণ মনের আবদুল আজিজের ক্ষোভ সেবক কলোনি স্কুলে যোগদান করে ক্রোধে পরিণত হলো। সেই ক্রোধে ঘি ঢেলে যেতে লাগলেন শ্যামলী দে আর হরিমোহন জেঠাদাস। করপোরেশনের হীন-উদ্যোগে স্কুলটি মেথরপট্টি-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে একসময় মেথর-সন্তানরা স্কুল যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। পরে কল্যাণী সরকারের আহ্বানে সর্দার গুরুচরণ পট্টির ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠায়। সেই থেকে আজ পর্যন্ত মেথর-সন্তানরা স্কুলে যাওয়ার ধারাটি বজায় রেখেছে। ছোটখাটো দু-চারটি ঘৃণা-আচ্ছিল্যের ঘটনা ছাড়া তেমন কোনো দুর্বিষহ ঘটনা স্কুলে ঘটেনি। কল্যাণী সরকারের সহৃদয় চেষ্টা আর কুতুবুদ্দীনের নিখাদ সহযোগিতায় মেথর-সন্তানরা স্কুলে অধ্যয়ন করে যাচ্ছিল।

কিন্তু আবদুল আজিজ প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করে ঘোষণা করলেন—মেথররা ক্লাসের সর্বশেষ বেঞ্চিতে বসবে।

BanglaBook.org

শ্যামলী দে বাহবা দিয়ে বললেন, 'আপনি একটা যথার্থ কাজ করলেন স্যার। মেথররা সারা দিন গু-মুত ঘাঁটে, তাদের পোলাপাইন আর কতটুকু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে? এই স্কুলে ভদ্রলোকের ছেলেমেয়েরা পড়ে, তাদের সঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি করে ওই অভাগার পুতরা বসত। কল্যাণীদির আমলে কোনো নিয়মশৃঙ্খলা ছিল না স্যার। মেথরদের বেঞ্চি আলাদা করে দিয়ে একটা বড় কাজ করলেন স্যার।'

কুতুবুদ্দীন বললেন, 'আপনি ইয়ান কি কইল্লেন স্যার? মেথরের ছেলেমেয়ে পেছনের বেঞ্চিতে বইসবে—ইয়ান কি ঘোষণা দিলেন স্যার? ছোড ছোড পোলাপাইনদের হড়াই আমরা। আপনার এই আদেশে হেতাগোর মধ্যে প্রতিক্রিয়া অইব। অন্য সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের মনে ঘিনার সৃষ্টি অইব। আপনি এই আদেশ তুলি লন স্যার।'

আবদুল আজিজ কড়া চোখে কুতুবুদ্দীনকে বললেন, 'আপনি কি মেথরদের সঙ্গে ভদ্রঘরের মুসলমান-হিন্দুর ছেলেমেয়েদের একত্রে বসে পড়তে বলছেন? আপনি ভাবলেন কী করে যে গু-ঘাঁটা হীন জাতের মেথরদের সঙ্গে ভদ্রঘরের সন্তানদের পড়া উচিত?'

'স্যার, আপনি মেথরদের অভদ্র বইলছেন কেন? আঙ্গো মতন হেগোর হড়াশুনা নাই—এইডা সইত্য, কিন্তু হেরা অভদ্র না স্যার।' কুতুবুদ্দীন বললেন।

আবদুল আজিজ উঁচু গলায় বললেন, 'ছোটলোকরা ময়লা-আবর্জনা টানে, গুয়ের টাঙ্গি পরিষ্কার করে; তারা আবার ভদ্রলোক হলো কখন?'

কুতুবুদ্দীন একেবারে শান্ত গলায় বললেন, 'স্যার, ইদানীং কিছু হিন্দু-মুসলমানও করপোরেশনের এই কাম কইত্তাছে। তাই বলে হেরা কি ছোড জাত হই গেল, স্যার। আপনার ভাষায়, হিন্দু-মুসলমানরা তো ভদ্রলোক স্যার। ছোড কাম করে বলে মেথররা অভদ্র না স্যার। এখন স্যার অনেক চৌধুরী, সেন, রায় বাজারে মাছ বেচে; অনেক মুসলমান জুতা সেলাইয়ের কাজ করে, চুল কাটার কাজ করে। তাই বলে কি তারাও ছোট জাত হয়ে গেল, স্যার।' শেষের দিকে শুদ্ধ বাংলায় কথা বলতে শুরু করলেন কুতুবুদ্দীন।

জেঠাদাস এবার কথা বলে উঠলেন। চামচার স্বরে বললেন, 'কুতুব সাহেব, আপনি হেডস্যারের সঙ্গে তর্ক করছেন কেন? উনি যা ঘোষণা দিয়েছেন, বুঝেশুনে দিয়েছেন।'

কুতুবুদ্দীন বললেন, 'না, উনি বুঝেশুনে ঘোষণা দেননি। আপনাদের মতো দু-একজনের খপ্পরে পড়ে হেডস্যার ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই সিদ্ধান্ত কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের মনে মেথর-সন্তানের জন্য ঘৃণা আর তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যকে

BanglaBook.org

উসকে দেবে।'

শ্যামলী বললেন, কল্যাণীদির সঙ্গে সঙ্গে থেকে আপনার মাথাটা একেবারে গোল্লায় গেছে কুতুব সাহেব। দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা মদ নিয়ে পড়ে থাকে এই মেথররা। হরদম বউ পেটায়।'

কুতুবুদ্দীন ব্যঙ্গের সুরে বললেন, 'না দিদি, মাথা আমার গোল্লায় যায়নি। আপনাদের মস্তিষ্ক বিকারগ্রস্ত হয়েছে। মেথররা মদ নিয়ে পড়ে থাকে, এটা সত্য। সারাটা জীবন বঞ্চনা আর ঘৃণা ছাড়া অন্য কিছু জোটে না তাদের কপালে। যেখানেই যায়—শুধু দূর দূর ছেই ছেই। এগুলো ভুলে থাকার জন্য তো তাদের একটা আশ্রয় চাই! মদ তাদেরকে সেই আশ্রয় দেয়। আর মদ কে না খায়? বেহেড মাতাল কে না হয়? আপনি হিন্দু। আপনার না-জানার কথা নয়—আপনাদের দেবতারাও তো মদ খেত। অবশ্য তাঁরা মদের একটা সুন্দর নাম দিয়েছিলেন—সোমরস। আর শিবের কথা ভাবুন। তিনি তো সিদ্ধিতে নিপুণ, মানে নামকরা একজন গেঁজেল। ওই দেবতাদের জন্য কোনো ঘৃণা নেই আপনাদের মনে, যত ঘৃণা এই লাঞ্ছিত মেথরদের জন্য।' শ্যামলীর চোখমুখ লাল হয়ে গেল। তাঁর মুখে কোনো কথা সরলো না।

জেঠাদাস কুতুবুদ্দীনকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার ভঙ্গিতে বললেন, 'আর বউ পেটানোটা! মেথরানিদের হল্লা আর কান্নাকাটিতে ক্লাসে পড়ানো মুশকিল হয়ে পড়ে।'

'শুনুন, হরিমোহনবাবু, দাম্পত্য-কলহ কোন সমাজে নেই? আপনার সমাজের দিকে তাকান—উত্তর পেয়ে যাবেন। আর ভদ্দরলোকদের কথা বলছেন? কানটা ভদ্দরলোকের দরজায় লাগিয়ে দেখুন—সেখানে কী মাৎস্যন্যায় চলছে। শিক্ষিত অধ্যাপক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বড় বড় অফিসের জাঁদরেল অফিসাররা বউ পেটাচ্ছে। নির্যাতিত মহিলাদের কান্নার আওয়াজ দরজার এ-পাড়ে আসে না বটে, কিন্তু বউ পেটানোর কাজটি হরদম চালিয়ে যাচ্ছে আপনার ভাষায় সেই উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোকরা।' ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কথাগুলো বলে গেলেন কুতুবুদ্দীন।

আবদুল আজিজ এতক্ষণে বললেন, 'আপনি এত রেগে রেগে কথা বলছেন কেন?'

কুতুবুদ্দীন বললেন, 'স্যার, রেগে রেগে কথা বলছি না স্যার। ভেতরে অনেক দুঃখ জমা আছে, সেগুলো বেরিয়ে এল, স্যার। ও স্যার, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি—মদ খাওয়ার ব্যাপারে দেবতাদের কথা বলেছি, একটু ভদ্রমানুষের দিকে তাকান। শিক্ষিতজনরাও কি মদে ডুবে থাকে না? অস্বীকার

BanglaBook.org

করার কোনো উপায় আছে কি স্যার?'

আবদুল আজিজ কুতুবুদ্দীনের যুক্তিতে আপাতত চুপ মেরে যান। জেঠাদাস আর শ্যামলীদির সঙ্গে চোখে চোখে কী কথা যেন বিনিময় করেন। তারপর ধীরে ধীরে বলেন, 'ঠিক আছে, আমাদের আলোচনা আজ এ পর্যন্তই, তারপর বিরক্ত মুখে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'আমাকে তো আবার সেই সীতাকুণ্ডে যেতে হবে! শালারপুতের চাকরি!' শেষের কথাগুলো দ্বিধাহীন কণ্ঠে বললেন তিনি।

কুতুবুদ্দীনের মনে দিগ্বিজয়ের আনন্দ। ভাবলেন, কট্টরপন্থী হেডমাস্টারকে বোঝাতে পেরেছেন তিনি। শ্যামলীদি আর হরিমোহনবাবুর সংকীর্ণ পরামর্শের গণ্ডি থেকে আবদুল আজিজ সাহেবকে বের করে আনতে পেরেছেন। কল্যাণীদি বদলি হয়ে গেছেন বেশ কিছুদিন আগে। আজিজ স্যারের নানা কর্মকাণ্ড তাঁকে পীড়া দিচ্ছিল। শ্যামলীদি আর হরিমোহনবাবু তাঁকে কুপরামর্শ দিয়ে যাচ্ছিলেন। কুতুবুদ্দীনের ভেতরে একটা প্রচণ্ড ক্ষোভ উথালপাথাল করছিল। আজ তা বের করে দিতে পেরে মনে বড় শান্তি পেলেন কুতুবুদ্দীন। গভীর আনন্দ নিয়ে তিনি বাড়ি ফিরলেন। বহুদিন পরে বিকেলে একটা টানা ঘুম দিলেন। রাত নয়টার দিকে ঘুম ভাঙলে তিনি ঠিক করলেন—আজকে আর রাঁধবেন না, হোটেল নিউ জামানে রূপচাঁদা দিয়ে ভাত খাবেন।

পরের দিন প্রথম ও দ্বিতীয় পিরিয়ডে কুতুবুদ্দীনের ক্লাস ছিল না। এমনিতে সকাল সাড়ে নয়টার মধ্যে স্কুলে উপস্থিত হওয়ার নিয়ম। ক্লাস না থাকলে একটু দেরি করে আসার অলিখিত একটা প্রথা দাঁড়িয়ে গেছে প্রাইমারি স্কুলগুলোতে। তবে সে ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষকের প্রশ্রয়টা জরুরি। সেবক কলোনি স্কুলেও সেই নিয়ম প্রচলিত আছে। দেরিতে আসার কৈফিয়ত চেয়ে বকাঝকা করার অধিকারও আছে প্রধান শিক্ষকের। কুতুব সাহেব কিছুটা শঙ্কিত মনে হেডস্যারের কক্ষে ঢুকলেন। অস্বাভাবিক উচ্ছ্বাস দেখিয়ে আবদুল আজিজ জিজ্ঞেস করলেন, 'কী কুতুব সাহেব, ঘুম ভাঙতে দেরি হলো বুঝি?' কুতুবুদ্দীনের উত্তরের অপেক্ষা না করে তিনি আবার বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। এক-দুদিন দেরি হলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। হাজার হলেও পুরোনো শিক্ষক আপনি, নিবেদিত প্রাণ!' 'নিবেদিত প্রাণ' শব্দগুচ্ছটি তিনি এমনভাবে উচ্চারণ করলেন, এর সঙ্গে ব্যঙ্গ, না প্রশংসা জড়িয়ে আছে, বুঝতে পারলেন না কুতুবুদ্দীন সাহেব। দ্বিধান্বিত চোখে আবদুল আজিজের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

কুতুবুদ্দীনের সংশয় দেখে ঠোঁটে বাঁকা হাসি ঝুলিয়ে কৌতুকীকণ্ঠে আবদুল

BanglaBook.org

আজিজ বললেন, 'যান কুতুব সাহেব, শিক্ষক কমনরুমে যান। আপনার তো আবার পরের পিরিয়ডে ফাইভের সঙ্গে ক্লাস।'

পরের পিরিয়ডেই কুতুবুদ্দীন হেডস্যারের বাঁকা হাসি আর কৌতুকীকণ্ঠের মর্মার্থ টের পেলেন। ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে ক্লাসে ঢুকলেন তিনি। তাকিয়ে দেখলেন, মেথর-সন্তানরা ক্লাসের শেষ দুটো বেঞ্চিতে বসে আছে। বিষণ্ন মুখ। কুতুবুদ্দীনের মাথা ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠল। বোবা দৃষ্টিতে মেথর-সন্তানদের দিকে তাকিয়ে থাকলেন তিনি। তাঁর চিন্তা নিথর হয়ে গেল। কোনো কথা তাঁর মুখ দিয়ে সরলো না। বেশ কিছুক্ষণ পর তাঁর সংবিৎ ফিরে এল। গতকালকে মুখে মুখে তর্ক করার অপরাধের প্রতিশোধ নেয়ার আজ যথেষ্ট সুযোগ ছিল আজিজ সাহেবের। কিন্তু সেদিকে তিনি যাননি; বরং ঘুমের প্রসঙ্গ তুলে কৌতুক করেছেন। স্কুলে দেরিতে আসার ফায়দাটুকু যে আজিজ সাহেব নিয়েছেন, তা এ মুহূর্তে শ্রেণীকক্ষে দাঁড়িয়ে কুতুবুদ্দীন বুঝতে পারলেন। তিনি আরও বুঝলেন, তাঁর বিলম্বে আসার সুযোগে দুই সহযোগীকে নিয়ে তিনি ক্লাসে ক্লাসে নোংরা আদেশটি জারি করেছেন। শুধু আদেশ জারি করেই ক্ষান্ত হননি তিনি, আদেশ অনুসারে মেথর-সন্তানদের সমানোরও সুব্যবস্থা করে ফেলেছেন। হঠাৎ হা-হা-হা করে হেসে উঠলেন কুতুবুদ্দীন। তারপর মুখের ভেতর নিদারুণ তেতো অনুভব করতে লাগলেন তিনি। পেটটা গুলিয়ে উঠল হঠাৎ করে। গলা ঠেলে সকালের খাবার বেরিয়ে আসতে চাইল। অনেক কষ্টে বিবমিষা দমন করলেন তিনি। তারপর কোনো ভূমিকা না করে স্পষ্ট কণ্ঠে আবৃত্তি করে গেলেন—

হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান॥

মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।
বিধাতার রুদ্ররোষে দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে
ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান।
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান॥

BanglaBook.org

তোমাদের আসন হতে যেথায় তাদের দিলে ঠেলে
সেথায় শক্তিরে তব নির্বাসন দিলে অবহেলে।
চরণে দলিত হয়ে ধুলায় সে যায় বয়ে—
সেই নিম্নে নেমে এসো, নহিলে নাহিরে পরিত্রাণ।
অপমানে হতে হবে আজি তোরে সবার সমান ॥

যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে,
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।
অজ্ঞানের অন্ধকারে আড়ালে ঢাকিছ যারে
তোমার মঙ্গল ঢাকি গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান।
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান ॥

আবৃত্তি করতে করতে শেষের বেঞ্চির দিকে এগিয়ে গেলেন কুতুবুদ্দীন। একজন মেথরসন্তানের ময়লা চুলে ডানহাতের আঙুলগুলো ডুবিয়ে দিলেন। আবৃত্তি বন্ধ করে পাশেরজনকে বাঁ হাত দিয়ে কাছে টেনে নিলেন। তারপর হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন কুতুবুদ্দীন। তাঁর দাড়ি বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল পাঞ্জাবিতে। ক্লাসভর্তি ছেলেমেয়েরা হতবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকল। বুকে টেনে নেয়া মেথরসন্তান দুটো উসখুস করতে লাগল। পেছনের বেঞ্চিতে বসা অন্য মেথরসন্তানরা কী করবে বুঝে উঠতে পারছিল না। পঞ্চম শ্রেণীর পড়ুয়ারা কুতুব স্যারের কান্নার কারণ জানতে পারল না। কেউ ভাবল—স্যারের মনে বোধ হয় খুব কষ্ট জমা হয়ে আছে। সে জন্য কাঁদলেন। কেউ ভাবল—আজকে বোধ হয় স্যারের ছেলের মৃত্যুদিন। ওই বিকাশের চেহারার সঙ্গে হয়তো তাঁর ছেলের চেহারার মিল আছে। তাই তাকে বুকে জড়িয়ে স্যার হাউমাউ করে কেঁদে দিলেন।

মেথরসন্তানরা ঘরে ফিরে তাদের আলাদা করে পেছনের বেঞ্চিতে বসানোর ব্যাপারটি যার যার মা-বাবাকে বলল। হরিজনরা প্রথমে ব্যাপারটি নিয়ে পরিবারের ভেতর কথা বলল। তারপর এ-পরিবার ও-পরিবার মিলে আলোচনা করল। শেষ পর্যন্ত চার পট্টির মুখ্যরা একত্র হয়ে সর্দার রামগোলামের কাছে আরজি জানাল—এর একটা বিহিত করা উচিত, এ বিষয়ে একটা কড়া ব্যবস্থা নাও সর্দার।

সর্দারের তখন ব্যবস্থা নেয়ার অবস্থা না। বাবাঠাকুরের ভীষণ অসুখ। মন্দিরলগ্ন একটি কক্ষে তাঁকে রাখা হয়েছে। মুমূর্ষু তিনি। তাঁকে একনজর দেখার জন্য পট্টির মানুষরা মন্দিরে ভিড় করে। জানালা-দরজা দিয়ে উঁকি

BanglaBook.org

দেয়। চাকরি বাঁচাবার জন্য যতটুকু সময় দেয়া প্রয়োজন, অতটুকু সময় দিয়ে বাদবাকি সময় রামগোলাম বাবাঠাকুরের বিছানার পাশে বসে থাকে। অন্যান্য পট্টি থেকে মুখ্যরা আসে, কিছুক্ষণ বসে চলে যায়। কিন্তু রামগোলাম যায় না। রামগোলামের ঠাকুমা অঞ্জলি সর্বক্ষণ বাবাঠাকুরের দেখাশোনা করছে। সময়মতো ওষুধ খাওয়ানো, কপালে জলপট্টি দেয়া, ভিজা গামছা দিয়ে হাত-পা-গা মুছে দেয়া—সব কাজ অঞ্জলি করছে। সর্দার গুরুচরণের সঙ্গে বাবাঠাকুরের নিবিড় সম্পর্ক ছিল। সর্দার প্রকাশ্যে বাবাঠাকুরকে বাবা বলে ডাকত না, কিন্তু অঞ্জলি জানত বাবাঠাকুরকে সর্দার পিতার আসনে বসিয়েছিল। বিপদে আপদে পরামর্শের জন্য সর্দার ছুটে আসত এই বাবাঠাকুরের কাছে। বাবাঠাকুরও সর্দারকে খুব ভালোবাসতেন। তিনি চাপাপ্রকৃতির লোক বলে তাঁর আচরণে প্রগলভতা প্রকাশ পেত না, কিন্তু সর্দার-পরিবার জানত এই পরিবারের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসার কথা। তাই বাবাঠাকুরের অসুস্থতায় সবচেয়ে বিচলিত হয়ে পড়েছে সর্দার-পরিবার।

এই বিচলিত সময়ে মুখ্যরা আবদুল আজিজের ঘৃণার ব্যাপারটি নিয়ে সর্দার রামগোলামের কাছে এল। সব শোনার পরও চুপ মেরে থাকল রামগোলাম। তার চুপ থাকা দেখে ঝাউতলার মুখ্য যোগেশের খুব রাগ হলো। সর্দার নির্বাচনে তার প্রস্তাব গৃহীত না হওয়ার কারণে আগে থেকেই রামগোলামের ওপর রেগে আছে সে। যোগেশ বলল, 'তুমি কিছু বলছ না কেন সর্দার? আমাদের এত বড় অপমানে চুপ থাকবে নাকি? হরিজনদের পেছনের বেঞ্চিতে বসানো! এত বড় সাহস আজিজ মাস্টারের!'

যোগেশের এত কথার পরও রামগোলাম নির্বাক বসে থাকল মন্দির চত্বরে। সে বাবাঠাকুরের চিন্তা ছাড়া আর কোনো বিষয়ে ভাবতে এখন রাজি নয়। গত রাতে খুব বাড়াবাড়ি গেছে বাবাঠাকুরের। দুদিন আগে চোখ বন্ধ হয়ে গেছে তাঁর। মাঝে মাঝে প্রলাপ বকছেন। বাবাঠাকুর আবার অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা করাতে রাজি নন। ছোটবেলা থেকে হোমিওপ্যাথিকের অনুরাগী তিনি। এই চিকিৎসাপদ্ধতির ওপর গভীর আস্থা তাঁর। দারোগাহাটের তপনলাল ভৌমিক বাবাঠাকুরের চিকিৎসা করছেন। নামকরা ডাক্তার তিনি। বাবাঠাকুরকে দেখেশুনে বলেছেন, বার্ধক্যজনিত অসুখ। এ যাত্রা টেকানো মুশকিল।'

রামগোলাম ডাক্তারের পায়ে ধরে বলেছে, 'যে করেই হোক, বাবাঠাকুরকে বাঁচান ডাক্তারবাবু। উনি মরলে হরিজনদের সবকিছু শেষ হয়ে যাবে। তিনি আমাদের রাস্তা দেখানেওয়ালা।'

আজ সকালে ডাক্তার তপনলালের কাছে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল

BanglaBook.org

রামগোলাম। ওই সময় আরজি নিয়ে এল মুখ্যরা। যোগেশের ক্ষোভ প্রকাশের পরও কোনো কথা বলল না রামগোলাম। তাতে আরও উত্তেজিত হয়ে উঠল যোগেশ। ঠাট্টা মেশানো কণ্ঠে বলল, 'এখন আর প্রতিবাদ করবে কেন? সর্দার বনে গেছো! আবার চাকরি পেয়েছো ছোট জমাদারের! জমাদার আর সর্দার দুটো হয়ে যাওয়ার পর গায়ে তো গরম আসা স্বাভাবিক!'

যোগেশের এ রকম উসকানিমূলক কথার কোনো জবাব দিল না সর্দার। অন্য মুখ্যদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'আপনারা একটু ধৈর্য ধরেন। বাবাঠাকুর ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁকে আগে ভালো করে তোলা দরকার। তাঁকে আগে সুস্থ করে তুলি। তারপর ব্যাপারটা নিয়ে হেডমাস্টারের কাছে যাব আমরা। কী বলেন আপনারা?'

মাদারবাড়ির মুখ্য বলল, 'সর্দারের সিদ্ধান্ত ঠিক আছে। প্রতিবাদ করার সময় আছে। পরে প্রতিবাদ করলেও চলবে। আগে বাবাঠাকুরের চিকিৎসা।'

রামগোলাম বলল, 'বাবাঠাকুরের অসুখ বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে গেছে গতরাতে। ডাক্তার আনতে যেতে হবে। আমি যাই তাহলে?'

মুখ্যরা যার যার পট্টিতে ফিরে গেল। রামগোলাম বের হলো ডাক্তার তপনলালকে আনতে।

আশ্বিনের শেষাশেষি। দুর্গাপুজোর আমেজ লেগেছে চারদিকে। এ বছর পুজো আর ঈদ গায়ে গায়ে লাগানো। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের মনে আনন্দের ছোঁয়া। শুধু আনন্দ নেই রামগোলামের মনে। দাদু তাকে ছেড়ে চলে গেছে। দাদুর পরিবর্তে বাবাঠাকুরকে আঁকড়ে ধরেছে রামগোলাম। নানা সংকটে বিচক্ষণ পরামর্শ দিয়েছেন বাবাঠাকুর। আজ সেই বাবাঠাকুর যেতে বসেছেন। বাবাঠাকুর মারা গেলে ভীষণ ক্ষতি হয়ে যাবে রামগোলামের। তাঁকে যেভাবেই হোক বাঁচিয়ে রাখতে হবে। প্রয়োজন হলে অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারের কাছে যাবে রামগোলাম। বাবাঠাকুরের কথা শুনবে না। ভাবতে ভাবতে পট্টির গেইটে পৌঁছাল সর্দার। গেইটের পাশেই বড় ডাস্টবিন। গত দিন ও রাতের আবর্জনা সেখানে। রামগোলাম তাকিয়ে দেখল, মদো শ্যামল এই সাতসকালে ওই ডাস্টবিনে গড়াগড়ি খাচ্ছে। মত্ত সে। ডাবের খোসা তার হাতে। কখনো ওই ডাবে পরম মমতায় ডান হাত বুলাচ্ছে, আবার কখনো গভীর চুমো খাচ্ছে। চুমো খাবার ফাঁকে ফাঁকে বলছে, 'সোন্দরি, তুমি আমার। আমার ছাড়া আর কারও নও তুমি। আহা! এ রকম করছ কেন তুমি? তোমার কাছে বেশি কিছু তো চাইছি না। শুধু একটা চুমা। উ-ম্মা।' বলেই ঠোঁট দুটো ডাবের গায়ে চেপে ধরছে শ্যামল।

BanglaBook.org

রামগোলামের মেজাজ তেতো হয়ে উঠল। নিজেকে দমন করে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। একটা রিকশায় উঠে পড়ল সে। রিকশা ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, 'কোনানে যাইবেন?'

রামগোলাম বলল, 'দারোগাহাট, রাজহোটেলের পাশে।'

ডাক্তার তপনলাল ভৌমিকের চেম্বারের সামনে রিকশা থেকে নেমে রামগোলাম অন্যমনস্কভাবে একটা দশ টাকার নোট এগিয়ে দিল রিকশাওয়ালার দিকে। রিকশাওয়ালা বলল, 'বিশ টেকা দেন স্যার।'

রামগোলাম এবার রিকশাওয়ালার দিকে ভালো করে তাকাল। হাঁটুনাম লুঙ্গি পরা রিকশাওয়ালাটির গায়ে ছেঁড়া একটি শার্ট। খোঁচা খোঁচা দাড়ি। দু চোখের কোনায় রাতের পিচুটি লেগে আছে। দারিদ্র্য তার পোশাকে-আশাকে, সারা গায়ে। ভেতরে চাগিয়ে ওঠা রাগ দমন করে শান্ত কণ্ঠে রামগোলাম বলল, 'ছয় টাকার ভাড়া, দশ টাকা দিয়েছি। তারপরও আপনি চাইছেন বিশ টাকা!'

'এখন ঈদের মউসুম স্যার। বকশিশ দেবেন না?' লোভী চোখে বলল রিকশাওয়ালা।

'আমি তো মুসলমান না।'

'তয়, আপনি হিন্দু তো? হিন্দুদেরও পূজা চইলছে এখন। দেন স্যার দেন, বিশ টেকা দেন।'

নিবিড় কষ্টের মধ্যেও কৌতুক ঝিলিক দিয়ে উঠল রামগোলামের মনে। নির্বিকার কণ্ঠে বলল, 'আমি হিন্দুও না।'

'তয়, আপনি কি?'

'আমি মেথর।'

চমকে রামগোলামের মুখের দিকে তাকাল রিকশাওয়ালা। তার চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছে সে রামগোলামের কথা বিশ্বাস করছে না। করুণ মুখে বলল, 'স্যার, না দিলে না দিবেন, মিছা কথা কইতাছেন ক্যান?'

রামগোলাম স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, 'সত্যি বলছি, আমি মুসলমান নই, হিন্দুও না, এমনকি বৌদ্ধ-খ্রিস্টানও না। আমি মেথর।'

রিকশাওয়ালার অবিশ্বাসী মুখাবয়বে ঘৃণার ঘন আস্তর পড়তে শুরু করল। পিচুটিপড়া চোখে তিরস্কারের ছায়া। ধীরে ধীরে ডান হাতটা এগিয়ে দিল রামগোলামের দিকে। বুড়ো আঙুল আর তর্জনীকে একত্র করে ছোঁয়া বাঁচিয়ে নোটটি নিল রিকশাওয়ালা। রামগোলাম সবকিছু দেখল, বুঝল। কিন্তু কিছু বলার সময় এখন নয়। তার হাতে সময় কম। যত শিগগির সম্ভব ডাক্তারবাবুকে নিয়ে যেতে হবে, বাবাঠাকুরকে বাঁচাতে হবে। দ্রুত পায়ে

BanglaBook.org

ডাক্তারের চেম্বারে ঢুকে গেল রামগোলাম।

রামগোলাম চেম্বারে ঢুকে গেলে রিকশাওয়ালা ধীরে ধীরে সিটটি তুলল। সিটের নিচ থেকে নোংরা এক টুকরা কাপড় বের করল। তারপর যে সিটের ওপর রামগোলাম বসেছিল, সেই সিটটি দীর্ঘক্ষণ ধরে ঘষে ঘষে মুছতে থাকল।

ডাক্তার তপনলাল দীর্ঘক্ষণ ধরে বাবাঠাকুরের চোখ দেখলেন, পেট টিপলেন, পাল্‌স দেখলেন, বুকে-পিঠে স্টেথিস্কোপ লাগালেন। তারপর চোখ বন্ধ করে গম্ভীর মুখে ডানে-বাঁয়ে মাথা নাড়লেন। তারপর রামগোলামের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বললেন, 'শেষের দিকে। ইচ্ছে করলে মেডিকেলে নিয়ে যেতে পারো। আমার অভিজ্ঞতা যা বলছে— আর একদিন টিকলে বেশি। বার্ধক্য ভেতরে ঝুরঝুরে করে ফেলেছে।' তারপর থার্মোমিটার, স্টেথিস্কোপ ব্যাগে ঢুকাতে ঢুকাতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ডাক্তার। বললেন, 'আমি দুঃখিত সর্দার। আমি যাই এখন। চেম্বারে অনেক রোগী।' ওই দিন বিকেলে মারা গেলেন বাবাঠাকুর। বাইরে মণ্ডপে মণ্ডপে তখন নবমীপুজো চলছে, আর হরিজনপল্লিতে বিসর্জনের ক্রন্দনরোল।

অক্টোবর, নভেম্বর পেরিয়ে ডিসেম্বর এল। ষোলোই ডিসেম্বর বাঙালির বিজয়ের দিন। বাংলাদেশে এই দিনটি মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয়। হাসি এবং কান্না এই দিনটির সঙ্গে মিশে আছে। পঁচিশে মার্চ থেকে পনের ডিসেম্বরের বেদনা আর ষোলোই ডিসেম্বরের আনন্দে বাঙালি উদ্বেলিত হয় এই দিনে। অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মতো ফিরিঙ্গিবাজার সেবক কলোনি প্রাইমারি স্কুলেও ষোলই ডিসেম্বরকে উদ্‌যাপন করার উদ্যোগ নিলেন প্রধান শিক্ষক আবদুল আজিজ। সপ্তাহ খানেক আগে থেকে তোড়জোড় শুরু করলেন তিনি। একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপস্থাপনের দায়িত্ব দিলেন কুতুবুদ্দীনকে। কুতুবুদ্দীন বাছা বাছা ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে কবিতা আবৃত্তি, নাচ, গান, কৌতুক, একক অভিনয়ের মহড়া শুরু করলেন। আজিজ সাহেব হরিমোহনবাবুকে সাথে সাথে রাখলেন। তাঁকে নিয়ে করপোরেশনের বড় সাহেব আবদুস ছালামের সঙ্গে দেখা করলেন। বললেন, 'স্যার, ষোলোই ডিসেম্বর উপলক্ষে আমাদের স্কুলে একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি আপনি। আপনাকে ওই দিন আমাদের স্কুলে যেতে হবে।' কথা শেষ করে আবদুল আজিজের মনে হলো তিনি গুছিয়ে কথাগুলো বলতে পারেননি। না হলে কেন বড় সাহেব তাঁর দিকে এই রকম নির্বিকার চোখে তাকিয়ে আছেন! তিনি পাশে বসা হরিমোহনের পেটে কনুইয়ের গুঁতা মারলেন। হরিমোহন চকিতে আজিজ সাহেবের দিকে তাকালেন। তারপর দ্রুত বললেন, 'স্যার, আপনি গেলে ছোট ছেলেমেয়েরা

BanglaBook.org

উৎসাহিত হবে। ভাববে, এ-ত বড় অফিসার! সব কাজ ফেলে আমাদের অনুষ্ঠানে এসেছেন! কী আনন্দ!'

আবদুস ছালাম মুখে হালকা হাসি ছড়িয়ে বললেন, 'বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পারেন দেখি আপনি! কী নাম আপনার? কী নাম বলছিলেন যেন?' 'জি স্যার, আমার নাম হরিমোহন দাস।' 'জল' শব্দটি বেমালুম গিলে নিজের নাম বললেন হরিমোহন।

আবদুল আজিজ দেখলেন, পাখি হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে করপোরেশনের বড় সাহেবকে প্রধান অতিথি করতে মনস্থ করেছেন তিনি। বড় সাহেবের যদি একটু অনুকম্পা পাওয়া যায়! পরিবার-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এত দূরে এসে চাকরি করতে বড় কষ্ট হচ্ছে তার। সেই আজান-ভোরে বাড়ি থেকে রওনা দিতে হয়, পৌঁছাতে পৌঁছাতে রাত আটটা। বড় সাহেব অনুষ্ঠানে গেলে সভাপতি হিসেবে তাঁর পাশে বসার অধিকার পাবেন আজিজ সাহেব। অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে তাঁর কষ্টের কথা বোঝাবেন। প্রয়োজন হলে হাত ধরে অনুনয়-বিনয় করবেন। বলবেন, 'স্যার, আপনি একটু সুপারিশ করলে আমার কষ্টটা লাঘব হবে। আমি আল্লাহর কাছে খোলা দিলে আপনার জন্য দোয়া করব।' আর এ বেটা, ময়ূরপুচ্ছধারী জাইল্যার পোলা, কী দিব্যি নিজের পরিচয় গোপন করে বলছে, 'জি স্যার, আমার নাম হরিমোহন দাস!' আবদুল আজিজ তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'স্যার, আমি ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক আবদুল আজিজ। উনি আমার স্কুলের সহকারী শিক্ষক।' তারপর দুহাত কচলাতে কচলাতে বললেন, 'আপনি অনুষ্ঠানে গেলে সবাই ধন্য ধন্য করবে। আপনার অনেক সুনাম হবে স্যার।'

আবদুস ছালাম মুচকি হেসে বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি চেষ্টা করব।'

'চেষ্টা নয়, চেষ্টা নয় স্যার। আপনাকে যেতেই হবে।' হরিমোহনবাবু কিছু বলার আগে তাড়াতাড়ি বললেন আবদুল আজিজ সাহেব।

স্কুলের সামনে এক চিলতে জায়গা—উঠোনও বলা যায়, আবার মাঠও বলা যায়। ওখানেই ষোলোই ডিসেম্বর উদ্‌যাপনের আয়োজন করা হয়েছে। উঁচুমতন মঞ্চ, সামনে লো-বেঞ্চের সারি। মঞ্চে পাঁচ-ছয়টি চেয়ার পাশাপাশি বসানো, সাদা কাপড়ে ঢাকা টেবিল। টেবিলের মাঝখানে ফুলের একটি তোড়া। ওপরে রঙিন শামিয়ানা। চারদিকে দড়িবাঁধা রঙিন পতাকা। লো-বেঞ্চে শত পড়ুয়ার কিচিরমিচির। কিছু কিছু অতিথি-অভ্যাগত এসে পড়েছেন। আপাতত হেডস্যারের রুমেই বসেছেন তাঁরা। প্রধান অতিথি আবদুস ছালাম

BanglaBook.org

এসে পৌঁছাননি বলে অনুষ্ঠান শুরু করা যাচ্ছে না। একটা কক্ষে কুতুবুদ্দীন তাঁর সাংস্কৃতিক দলের শেষ মহড়া তদারক করছেন।

শ্যামলী দে আজ বেশ সেজেগুজে এসেছেন। তাঁর ঘাড়ে, গলায় ছোপ ছোপ পাউডার। তিব্বত স্নোর ঘন আস্তরণও তাঁর গালের মেছতা ঢাকতে পারেনি। অতি উৎসাহী হরিমোহন জে. দাস সমবেত ছাত্রছাত্রীদের ধমকাচ্ছেন। ধমকানোর ফাঁকে ফাঁকে বলছেন, 'খবরদার, বেশি গোলমাল করবি না তোরা। আজ আমাদের একটা স্মরণীয় দিন। করপোরেশনের বড় সাহেব আসছেন আজ। একটা মহান দিন আজ। তাঁর প্রথম পদধূলি পড়বে আজ এই স্কুলে।' ছাত্রদের মধ্য থেকে নাকি সুরে কে যেন আওয়াজ দিল, 'ঠিক বলছেন জে—দাস।'

হরিমোহনবাবু চমকে ফিরে তাকালেন, দেখলেন সমবেত মেথরসন্তানদের মধ্য থেকে আওয়াজটা ভেসে এসেছে।

হরিমোহন এগিয়ে গেলেন সেদিকে। চোখে আগুন ঝরিয়ে বললেন, 'কে, কে বললি রে জে-দাস?'

তাঁর পেছন থেকে একজন আওয়াজ দিল, 'আমি সেয়ার, থুক্কু জেঠাদাস।' ছট করে পেছন ফিরলেন হরিমোহন। দেখলেন—সেখানে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্ররা নিজেদের মধ্যে আলাপে মশগুল। তিনি নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না। হাতের কাছে যাকে পেলেন, তার চুল খপ করে ধরলেন। ভদ্রলোকদের সন্তানদের কাছ থেকে একটু দূরে বসে ওদের কথা শুনছিল সেবক কলোনির বিকাশ। হরিমোহন তাকেই হাতের কাছে পেয়ে চুল ধরে টানতে টানতে হেডস্যার আবদুল আজিজের কক্ষে নিয়ে এলেন। বিকাশের গালে জোরে একটা থাপ্পড় বসিয়ে হরিমোহন বললেন, 'স্যার, এই শুয়োরের বাচ্চা আমার পেছনে আওয়াজ দিয়েছে। বলেছে—জেঠাদাস। বিচার করেন স্যার। না হলে আমি আপনার অনুষ্ঠানে নাই। যা করেন আর তা-ই করেন।'

বিকাশ তখন হরিমোহনবাবুর হাত থেকে মুক্তির জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে। কিন্তু হরিমোহনবাবুর মুঠি আলগা হচ্ছে না।

আবদুল আজিজ বললেন, 'ওর চুলের মুঠি ছেড়ে দেন হরিমোহনবাবু।'

তারপর বিকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী হয়েছে রে? বাড় বেড়ে গেছে তোদের, না?'

স্কুলের সেক্রেটারি হাজি আবদুল হাকিম বলে উঠলেন, 'ওদের কথা বইলেন না হেডমাস্টার সাব। এই মেথরদের বাড়াবাড়িতে এই অঞ্চলে টিকা মুশকিল।' সেক্রেটারির কথার কোনো জবাব না দিয়ে আবদুল আজিজ ধমকে উঠলেন,

BanglaBook.org

'কিরে হারামজাদা, জবাব দেস না কেন?'

'স্যার, আমি কিচ্ছু করিনি।' কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে জবাব দেয় বিকাশ।

হরিমোহন বিকাশের গালে আবার একটা চড় মারেন, 'আবার মিথ্যা কথা হারামি!'

হাজি হাকিম বললেন, 'যাক হরিমোহনবাবু, চিকা মারি হাত গন্ধ করেন কেন?' তারপর হেডমাস্টারের দিকে ফিরে বলেন, 'কিছু একটা করেন হেডমাস্টার। করপোরেশনে বড় কর্তাকে দাওয়াত দিয়েছেন। এসব মেথর এই অনুষ্ঠানের সৌন্দর্য নষ্ট কইরব।'

হুট করে চেয়ার থেকে উঠে পড়লেন আবদুল আজিজ। বিকাশের বাঁ হাত চেপে ধরে হনহন করে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। হরিমোহনবাবু তাঁর পিছু নিলেন। বিকাশকে সামনের দিকে ধাক্কা দিয়ে মঞ্চে উঠে দাঁড়ালেন হেডমাস্টার। তারপর উত্তেজিত কণ্ঠে চিৎকার করে বললেন, 'ছেলেমেয়েরা শুন, এখানে যারা মেথর মানে হরিজন-সন্তান আছ, সবাই আমার রুমে আস। এখনই।' বলে হেডস্যার নিজের রুমের দিকে এগিয়ে গেলেন।

হেডস্যারের এ রকম উত্তেজনাপূর্ণ আদেশে সমবেত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হলো। গুঞ্জন শুনে হরিমোহনবাবু ধমকে উঠলেন, 'ওই পোলাপাইনরা, এত কথা কিসের? আদেশ শুনো নাই? মেথরের বাইচ্চারা বসে রইলা ক্যান? যাও, হেডস্যারের রুমে যাও। গেলে বুঝবা ঠ্যালা। হারামখোররা, আমি বলে জেঠাদাস!' হরিজন-সন্তানরা একে অপরের দিকে করুণ চোখে তাকাল। তারপর একজন-দুজন করে করে হেডস্যারের রুমের দিকে হাঁটা শুরু করল। বিকাশ গেল প্রথমে।

আবদুল আজিজ সামনে দাঁড়ানো হরিজন-সন্তানদের দিকে তাকালেন। দেখলেন, তাদের গায়ে ময়লা জামা, মাথায় উসকোখুসকো চুল। তাঁর ভেতরে রাগ আবার চাগিয়ে উঠল। ভাবলেন, এই ছোটলোকের বাচ্চারা যদি অনুষ্ঠানে থাকে, তাহলে অনুষ্ঠানের বারোটা বাজবে। কোনো ক্রমে যদি এই নোংরা ছোট জাতের ছানাগুলোর ওপর বড় সাহেবের চোখ পড়ে, তাহলে ঘৃণায় নাক সিটকাবেন তিনি। গা রি রি করবে তাঁর। তাঁর মেজাজ বিগড়ে যাবে। যে উদ্দেশ্যে তাঁকে আনা, সে উদ্দেশ্য ভেস্তে যাবে। নাহ্, এই ছোট জাতের ছেলেমেয়েদের অনুষ্ঠানে রাখা যাবে না। বেয়াদপের বাচ্চারা আবার শিক্ষকের সাথে ইয়ার্কি করে!

আবদুল আজিজ চেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন, 'শুন, তোরা নোংরা জামাকাপড় পরে এসেছিস। তোদের গুষ্টিজ্ঞাতিরা যে করপোরেশনে চাকরি

BanglaBook.org

করে, সেই করপোরেশনের সবচাইতে বড় সাহেব এই অনুষ্ঠানে আসবেন। এখন বুঝ, অনুষ্ঠানটা কত বড়। এত বড় অনুষ্ঠানে তোদের মানায় না।' তারপর বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে নাকটাকে অযথা ঘষাঘষি করলেন কিছুক্ষণ। পরে চেয়ারে বসা গণ্যমান্য ব্যক্তিদের দেখিয়ে বললেন, 'এদের মতো সম্মানিত ব্যক্তিরাও এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন। তোরা এই অনুষ্ঠানে একেবারেই বেমানান। যা, সবাই বেরিয়ে যা এখন স্কুল থেকে।'

দু-দুবার চড়-থাপ্পড় খাওয়ার ফলে বিকাশের মন থেকে ভয়ডর কেটে গেছে। মৃদু প্রতিবাদের সুরে সে বলল, 'আপনি এটা কী বলছেন স্যার? এই স্কুল সবার জন্য। এই অনুষ্ঠানে থাকার অধিকার আমাদের আছে।'

'যা বলছি তা-ই কর। মুখে মুখে তর্ক করস হারামখোর, ছোট জাত কোথাকার!' আবদুল আজিজ গর্জে উঠলেন।

বিকাশ এবার গলায় জোর ঢেলে বলল, 'তর্ক না স্যার, অধিকারের কথা বলছি।'

আবদুল আজিজ নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না। এতগুলো গণ্যমান্য মানুষের সামনে মুখে মুখে তর্ক! মেথরের বাচ্চার সাহস তো কম না! ধুম করে টেবিলে ঘুষি মেরে বললেন, 'তুই শ্যামল মদাতির ছেলে না? দারুখোরের পোলার এত বড় সাহস! অধিকার চেনাচ্ছস আমাকে? এই ইউনুইচ্ছা, এই ছোটলোকের বাচ্চাদের গলাধাক্কা দিয়ে স্কুল থেকে বের করে দে।' হেডস্যারের আদেশ পেয়ে স্কুলের দপ্তরি ইউনুছ ঘরে ঢুকে বিকাশদের ঘরের বাইরে ঠেলতে লাগল।

অসহায় হরিজনসন্তানরা করুণ মুখে একে একে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। মাঠের এক জায়গায় সবাই থমকে দাঁড়াল কিছুক্ষণ, নিজেদের মধ্যে কী যেন বলাবলি করল। তারপর সবাই গেইটের দিকে এগিয়ে গেল। এ সবকিছু কুতুবুদ্দীনের অজ্ঞাতেই ঘটে গেল।

অনুষ্ঠানে একে একে প্রায় সবাই বক্তৃতা দিলেন। বাকি আছেন প্রধান অতিথি আবদুস ছালাম আর সভাপতি। পদাধিকারবলে আবদুল আজিজ সভাপতি। তাঁর মনস্কামনা আজ পূরণ হয়েছে—প্রধান অতিথির পাশের চেয়ারে বসেছেন তিনি। স্কুলের সেক্রেটারি হাজি হাকিমের বক্তৃতার সময় নিচু স্বরে তাঁর আবেদনের কথা উপস্থাপনও করেছেন বড় সাহেবের কাছে। প্রথম দিকে আবদুস ছালাম অন্যমনস্কতার ভান করলেও হেডমাস্টারের ঘ্যানর ঘ্যানরে তাঁর দিকে ফিরেছেন। মুখে কৃত্রিম হাসি ঢেলে 'আচ্ছা, আমি দেখব'ও বলেছেন বড় সাহেব। আবদুল আজিজের ভেতরটা আনন্দে টলমল করে উঠল। ভেতরের

BanglaBook.org

উল্লাস তাঁর চোখেমুখে ভেসে উঠল। সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করছিলেন কুতুবুদ্দীন। হঠাৎ তিনি চেয়ার ছেড়ে কুতুবুদ্দীনের দিকে এগিয়ে গেলেন। অনেকটা ঝাঁপিয়ে পড়ে কুতুবুদ্দীনের হাত থেকে মাইক্রোফোন কেড়ে নিলেন। সব নিয়মকানুন জলাঞ্জলি দিয়ে তিনি বলতে শুরু করলেন, 'উপস্থিত সুধীমণ্ডলী ও প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা, এখন আমাদের সামনে এমন একজন ব্যক্তি বক্তৃতা দেবেন, যিনি আমাদের প্রাণের চেয়েও প্রিয়, তিনি অপার করুণা করে আমাদের এই ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানে এসেছেন। তাঁর হাতে অনেক কাজ, মহাব্যস্ত এই মহান পুরুষটির আগমনে আমরা সবাই কৃতার্থ। তিনি অনেক ক্ষমতাবান একজন মানুষ। তিনি ইচ্ছে করলে জলে পাথর ভাসাতে পারেন, অসহায়কে সাহায্য করতে পারেন। তাঁর মতো খ্যাতিমান মানুষ এই জন্মে আমি আর দেখিনি।' পাশ থেকে হাজি হাকিম চাপা স্বরে ধমকে উঠলেন, 'তেলের বোতলটি এখন বন্ধ করেন হেডমাস্টার। নাম বলেন। আমাদের হাতে সময় কম।'

হাজি হাকিমের ধমকে হুঁশ ফিরল হেডমাস্টারের। তিনি বললেন, 'তিনি আর কেউ নন, তিনি করপোরেশনের সবচাইতে বড় অফিসার, আমাদের প্রাণের ধন জনাব আবদুস ছালাম সাহেব। আমি তাঁকে তাঁর মহামূল্যবান বক্তৃতা উপহার দেয়ার জন্য বিনীত আহ্বান জানাচ্ছি।'

স্মিত মুখে আবদুস ছালাম মাইক্রোফোনের দিকে এগিয়ে গেলেন। বড় করে গলা খাঁকারি দিলেন। তারপর বলতে শুরু করলেন, 'প্রিয় সভাপতি, সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, প্রিয় ছা...' এই সময় হুড়মুড় করে হরিজনরা সভাস্থলে ঢুকে পড়ল। ভিড় থেকে কে যেন চিৎকার দিল, 'কোন খানকির বাচ্চা আমাদের ছেলেমেয়েদের অনুষ্ঠান থেকে বের করে দিয়েছে?' আরেকজন বলল, 'ওই শালার পুত হেডমাস্টার, নেমে আয় মঞ্চ থেকে। বেলচা ঢুকাইয়া দিমু তোর পোন্দে।'

অনুষ্ঠানে বেশ একটা হট্টগোল লেগে গেল। চারদিকে শত শত মেথর দাঁড়িয়ে। দু-চারজন অতিথি অভ্যাগত তাদের সঙ্গে তর্কাতর্কিতে জড়িয়ে গেল। হরিজনরাও ছেড়ে কথা বলছে না। আবদুল আজিজের মুখ শুকিয়ে গেল। আবদুস ছালাম ঘটনার কিছুই জানেন না। তিনি হতভম্ব হয়ে মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

কুতুবুদ্দীন চিৎকার করে বলতে লাগলেন, 'আপনারা শান্ত হোন, শান্ত হোন। আপনাদের কোনো অভিযোগ থাকলে মঞ্চের কাছে আসুন। দয়া করে অনুষ্ঠানটি চলতে দিন।'

জটলার ভেতর থেকে রামগোলাম মঞ্চের দিকে এগিয়ে এল। কুতুবুদ্দীনের

BanglaBook.org

দিকে তাকিয়ে বলল, 'এটা হরিজনদের স্কুল। হরিজনদের স্কুল থেকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়ে আপনারা আরামে অনুষ্ঠান চালাবেন, ভাবলেন কী করে?'

কুতুবুদ্দীন ঘটনার আগামাথা কিছুই অবগত নন। বোকা বোকা চেহারা করে জিজ্ঞেস করলেন, 'মানে, হরিজনদের বের করে দিয়েছে মানে?'

রামগোলাম এবার গর্জন করে উঠল, 'জিজ্ঞেস করেন আপনার ওই চেয়ারে বসা হেডমাস্টারকে।' তারপর হেডমাস্টারের সামনে গিয়ে বলল, 'আমরা ছোট জাত, না? হারামখোর আমরা?'

হেডমাস্টার কোথায় মুখ লুকাবেন দিশে পাচ্ছেন না। কাঁচুমাচু মুখে একবার বড় সাহেব আর একবার রামগোলামের দিকে তাকাচ্ছেন। এই সময় বড় সাহেব মাইক্রোফোন ছেড়ে নিজ আসনে ধপ করে বসে পড়লেন। আবদুল আজিজ করুণ মুখে বললেন, 'আমার ভুল হয়ে গেছে স্যার। নোংরা জামা-কাপড় পরে এসেছিল বলে মেথরসন্তানদের আমি স্কুল থেকে বের করে দিয়েছি।' জেঠাদাসের প্রসঙ্গটি দিব্যি গিলে ফেললেন তিনি।

আবদুস ছালাম বিচক্ষণ মানুষ, অল্পতেই ব্যাপারটি বুঝে গেলেন। ব্যাপারটি সামাল দেয়া দরকার। উঠে মাইক্রোফোনের কাছে গেলেন তিনি। বললেন, 'প্রিয় সেবক ভাইয়েরা, আপনারা শান্ত হোন।' তাঁর কথায় হইচই একটু কমে এল। কিন্তু মদো শ্যামল জড়ানো কণ্ঠে চিৎকার দিল, 'হেড মাস্টারকে কান ধরতে বলেন।'

শান্ত কণ্ঠে বড় সাহেব বললেন, 'রামগোলাম, তোমার মানুষদের চুপ থাকতে বলো।'

'চুপ থাকবে কী করে স্যার? এত বড় অন্যায় করল হেডমাস্টার! আর আপনি বলছেন চুপ থাকতে?' মুখের ওপর বলে উঠল রামগোলাম।

বড় সাহেব বিচলিত বোধ করলেন। দুই টাকার রামগোলাম মুখে মুখে তর্ক করছে? কী আশ্চর্য! তাঁরই অধীনে সাধারণ চাকুরে এই রামগোলাম। রামগোলামের চাকরি এখন-তখন খেতে পারেন তিনি। তাঁর ভীষণ রাগ হতে লাগল। কিন্তু বুদ্ধিমান আবদুস ছালাম রাগকে দমন করে মুখে হাসি ফুটিয়ে রামগোলামকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'হেডমাস্টারের ব্যাপারটা আমি দেখছি। তুমি তোমার মানুষদের চুপ করাও।'

রামগোলাম বলল, 'হরিজনরা চুপ মেরে যাবে স্যার, আপনি হেডমাস্টারকে মাফ চেয়ে আমাদের ছেলেমেয়েদের ফিরিয়ে নিতে বলেন।'

নিজের রাগটাকে আর দমন করে রাখতে পারলেন না আবদুস ছালাম। মাইক্রোফোনে বাঁ হাত চাপা দিয়ে ডান হাতের তর্জনী রামগোলামের দিকে

BanglaBook.org

এগিয়ে ধরে ধমকে উঠলেন, 'মেথরদের কাছে একটা স্কুলের হেডমাস্টার ক্ষমা চাইবে, ভাবলে কী করে তুমি? তোমাকে বলেছি—আমি ব্যাপারটি দেখব। মানতে চাইছ না তুমি, পাত্তা দিচ্ছ না তুমি আমাকে!'

'পাত্তা দিচ্ছি স্যার। কিন্তু আমাদের অপমানের কথা আপনি ভাববেন না?' রামগোলাম বলল।

'বড় সর্দার হয়ে গেছো তুমি? নেতা? জননেতা? দেখছি আমি তোমাদের।' বলে আবদুস ছালাম মঞ্চ ত্যাগ করলেন। গাড়িতে উঠতে উঠতে ভাবলেন, এত বড় অপমান তার জন্য জমা ছিল এখানে? তারই আন্ডারে চাকরি করে এই মেথররা। এই রামগোলামকে হারাধন শালার পুতের কথা ধরে জুনিয়র জমাদারের চাকরি দিয়েছেন। হারাধনের ওপর খুব রাগ হলো ছালাম সাহেবের। হারাধনবাবু তাকে বলেছিলেন, ব্রেইন ওয়াশ করে দেবেন রামগোলামের। হাতের পুতুলে পরিণত হবে সে। হাগতে বললে হাগবে, মুততে বললে মুতবে। আজ সেই শুয়োরের বাচ্চা রামগোলাম, তাকে ন্যাংটো করে ছেড়ে দিল! কুত্তার বাচ্চারা, দাঁড়া। দেখে নিচ্ছি তোদের। আর ওই মা-চোদ হেডমাস্টার, আমার কাছে সাহায্য চায়? মেথরদের চেতানোর দরকার কী ছিল? কেন বের করে দিলি তুই ছোট জাতের পোলা-মাইয়াদের? শালার পুত। শেষের গালিটা কার জন্য উচ্চারণ করলেন বোঝা গেল না। গাড়িতে উঠে ড্রাইভারকে আদেশ দিলেন, 'সোজা অফিসে যাও রহমত।'

নিজের চেয়ারে বসে করপোরেশনের ইঞ্জিনিয়ারকে ডেকে পাঠালেন আবদুস ছালাম। ইঞ্জিনিয়ার রাকিবউদ্দীনকে বললেন, 'ফাইলটা বের করেন রাকিব সাহেব।'

'কোন ফাইলটা স্যার?'

'ওই যে ফিরিঙ্গিবাজার মেথরপট্টির পাশে প্রস্তাবিত কসাইখানার ফাইলটা।'

'ওই ফাইল দিয়ে কী করবেন স্যার? আপনিই তো প্রজেক্টটা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, হরিজনপল্লির পাশে কসাইখানা কী করে হয়? ওরা হিন্দু। গরুকে পবিত্র জ্ঞানে মানে। পট্টির পাশে কসাইখানা দেয়া ঠিক হবে না। প্রজেক্টটার অনুমোদন দেবেন নাকি স্যার?'

'হ্যাঁ।'

'কী বলেন স্যার? আপনার আগের ডিসিশন?' অবাক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন ইঞ্জিনিয়ার।

'ডিসিশন থেকে সরে এসেছি।' তারপর বিড়বিড় করে ছালাম সাহেব বললেন, 'হারামির পোলারা, দেখাচ্ছি মজা।'

BanglaBook.org

ষোলো

ষোলশহরের আবেদ কলোনিতে রাধিকাদের ঘরটি ঘিরে অনেক মানুষের জটলা। জটলায় নারীর সংখ্যা বেশি। তাদের মুখে অশ্রাব্য গালিগালাজ। বোরকাপরা এক মহিলা নেকাবটা একটু আলগা করে বলছে, 'তওবা, তওবা। কত বড় গুনার কথা! কবিরা গুনা। পরিচয় লুকিয়ে এত দিন আমাদের সাথে উঠবস করল! কিছুই বুঝতে পারলাম না আমরা!' মধ্যবয়সী এক হিন্দু নারী বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের শাখা ঘুরাতে ঘুরাতে বলল, 'অদি, বুঝিবেন কেএন করি। কোয়ালত্ সিঁদুরের মতন লাল টিপ, হাতত্ তক্তইক্যা সাদা শাঁখা, ঝক্ঝইক্যা কাওড়চোওড়! আঁর বাসাত্ যে কতবার পাত পাতি খাইল! হায় হায় ভগবান, আরার তো জাত-কুলমান বিয়াগ্গিন গেল। মেথরনির ছোঁয়া খাই চইদ্দগুষ্টি নরকত্ গেল।'

সদ্য বিবাহিত এক তরুণী এগিয়ে এল। দুই নারীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জোর গলায় বলল, 'আপনারা এগুলো কী বলছেন? আমাদের মতোই একজন নারী প্রসব বেদনায় ঘরের ভিতর কাতরাচ্ছে, আর আপনারা জাত গেল জাত গেল বলে চিল্লাচ্ছেন!'

বোরকাপরা মহিলা প্রতিবাদী গলায় বলল, 'ও নারী কোথায়? ও তো মেথরনি। মেথরকে ছুঁয়ে এই কনকনে শীতে আবার গোসল করবে কে?'

তরুণী বোরকাপরা নারীটির কথার কোনো জবাব না দিয়ে সমবেত নারীদের উদ্দেশে বলল, 'এখানে কি কেউ দাই আছেন? যদি থাকেন আমার সাথে আসেন। মহিলাটি মারা যাবে যে!'

তামাশা দেখতে আসা নারীদের মধ্য থেকে কেউ এগিয়ে এল না। হতাশ চোখে তরুণীটি নারীদের দিকে তাকিয়ে থাকল। তরুণীটির চোখে আঁধার দেখল। ঘরের ভেতর থেকে কোঁকানোর আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল। সেই কোঁকানো ধীরে ধীরে আর্তনাদে রূপান্তরিত হতে লাগল। অসহায় ভঙ্গিতে তরুণীটি এবার পুরুষদের দিকে চোখ ফেরাল। অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলল, 'এখানে আসা নারীরা কেউ আপনাদের স্ত্রী বা বোন বা খালা বা শাশুড়ি। আপনারা তাদের বলেন কেউ

BanglaBook.org

যেন আমাকে সাহায্য করে। মেয়েটি মারা যাবে। তাকে এখনই হাসপাতালে নিয়ে না গেলে মারা যাবে।' বলতে বলতে সামনে দাঁড়ানো লুঙ্গিপরা মধ্যবয়সী এক লোকের হাত চেপে ধরল তরুণীটি।

লোকটি এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'মেথরনি মরলে আমাদের কী? এ্যাঁ? আমাদের কী?'

এ সময় হন্তদন্ত হয়ে সেখানে উপস্থিত হলো শক্তিলাল। তার ঘরের পাশে এত মানুষের জটলা দেখে সে ভয় পেয়ে গেল। ভীত কণ্ঠে সে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে? এত মানুষ কেন এখানে?'

'অই চোদানির পোয়া মেথইয্যা, পরিচয় লুকাই ভদ্রলোক সাজি বাসা লইয়ছ আঁরার পাড়াত্। হিন্দু-মুসলমানর বসবাস এন্ডে। বিয়াগ্গুনর জাত খাইয়ছ খানকির পোয়া। জান লওনর আগে ডিমপারনিরে লই ধা এত্তোন।' ভিড়ের ভেতর থেকে গর্জে উঠল একজন।

গালাগালির কোনো জবাব না দিয়ে দ্রুত ঘরে ঢুকল শক্তিলাল, তার পিছু পিছু সেই তরুণীটি।

বাপ-মা-ভাইবোন-আত্মীয়স্বজনকে ত্যাগ করে সেই সকালে রাধিকা আর শক্তি আবেদ কলোনির দু কামরার ঘরে এসে উঠেছিল। টিনশেড ইটের দেয়ালের ঘর। বান্ডিলপট্টি থেকে চলে আসার সপ্তাহ খানেক আগে শক্তি আর রাধিকা এই ঘর ঠিক করে গিয়েছিল। বাড়িওয়ালা জহিরউদ্দীনকে নিজেদের নাম বলেছিল—রাধা এবং শক্তিচন্দ্র। পদবি বলেছিল কর্মকার। বাড়ি বলেছিল শেখেরখিল। আরও বলেছিল দুজনেই ফ্রি-পোর্টে চাকরি করে। ভালো বেতন পায়। ঘর ভাড়া দিতে অসুবিধা হবে না। জহিরউদ্দীন চশমার ফাঁক দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দুজনকে দেখল। ছিমছাম চেহারার দুজনকে ভালো লেগে গেল তার। ওদের ঘর দিতে রাজি হয়ে গেল জহিরউদ্দীন।

ঘরে উঠেই শক্তি-রাধিকা বোল পাল্টে ফেলল। বাঙালিদের মতো উচ্চারণ করে কথা বলতে শুরু করল তারা। প্রতিবেশীদের যথাসম্ভব এড়িয়ে চলল। সবচেয়ে বেশি খোলনলচে পাল্টে ফেলল রাধিকা। শাড়ি ছেড়ে সালোয়ার-কামিজ ধরল। কোনো কারণে শাড়ি পরতে হলে বাঙালি নারীর মতো ডান দিকে পেঁচিয়ে পরতে শুরু করল। হাতে শাঁখা, কপালে সিঁদুর দিয়ে নিজকে হিন্দু হিসেবে প্রতিবেশীদের কাছে প্রতিপন্ন করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগল। সকালে শক্তি-রাধিকা একসঙ্গে চাকরির উদ্দেশে বের হয়। মূল রাস্তায় এসে একই বাসে চড়ে দুজনে। ওয়াসার মোড়ে নেমে রাধিকা করপোরেশনের অফিসের দিকে হাঁটে আর শক্তি ছোটে ফ্রি-পোর্টের দিকে।

BanglaBook.org

বাপের কল্যাণে রাধিকার ডিউটি পড়ে করপোরেশন অফিসে। সেখানে সবাই এত ব্যস্ত যে রাধিকা হরিজন-নারীর ঢঙে শাড়ি পরল কি পরল না—এ নিয়ে মাথা ঘামাবার কেউ নেই।

দুপুরে চাকরি শেষ হয়ে গেলে প্রায় সময়ই রাধিকা বাপের বাড়ি যায়। কাজ শেষে তখন মাদারবাড়ির পট্টিতে একে একে ফিরতে থাকে সবাই। তাদের চোখে রাধিকাকে অচেনা অচেনা মনে হয়। তার কথা বলার ভঙ্গি, তার কাপড়চোপড় পরার ধরন, তার চালচলন, সবকিছু তাদের কাছে অন্য রকম মনে হয়। তাদের মনে হয়—রাধিকার মধ্য থেকে কী যেন হারিয়ে গেছে। রাধিকা যেন আর হরিজনকন্যা নয়, যেন ভদ্রঘরের এক শিক্ষিত কন্যা।

মা জিজ্ঞেস করে, 'কেমন আছিস রে তুই রাধিকা?'

রাধিকা উত্তর দেয়, 'ভালো আছি মা।'

'তোর প্রতিবেশীরা তোকে হরিজন বলে ঘৃণা করে না?'

'আমাকে চিনলে তো করবে!'

'কেন, চিনে না?' মা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।

রাধিকা বলে, 'আমাদের কেউ ঘর ভাড়া দেয় নাকি মা? মেথর বলে চিনলে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়। নিজেদের পরিচয় লুকিয়ে ঘর ভাড়া নিয়েছি।'

'যদি কোনো দিন চিনে ফেলে, তাহলে তো অনেক বিপদ হবে তোদের।' মা আতঙ্কিত স্বরে বলে।

ভাতের গ্রাস মুখে তুলে নিতে নিতে রাধিকা বলে, 'তুমি ঘাবড়িও না মা। ওখানে কেউ আমাদের চিনবে না।'

অনেক চাপাচাপি করে কোনো কোনো বন্ধের দিন রাধিকাকে বান্ডেলে নিয়ে যায় শক্তি।

ভাইবোনরা শুকনা মুখে কুশলাদি জিজ্ঞেস করে। দাদা দাদি দীর্ঘশ্বাস ফেলে অন্যদিকে মুখ ঘুরায়। শক্তি-রাধিকা আসার খবর পেয়ে ওরা না যাওয়া পর্যন্ত চমনলাল নিচ থেকে ওপরে ওঠে না। কিন্তু মা মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে না। হাজার হলেও প্রথম সন্তান, প্রথম সন্তানের বউ! রাধিকা-শক্তিকে দেখলে ক্ষোভে-অভিমানে ভেতরটা পুড়ে খাক হতে থাকে মায়ের, 'হায় রে শক্তি, প্রথম সন্তান তুই আমার! কত কষ্ট করে তোকে মানুষ করেছি। আর সেই তুই বউ পেয়ে আমাদের পর করে দিলি!' রাধিকার দিকে তাকিয়ে চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে মা। 'উপযুক্ত মেয়ে বিয়ে না দিয়ে তোমাকে ঘরে এনেছিলাম রাধিকা। মনে বড় আশা ছিল, সেজেগুজে তুমি সামনে সামনে হাঁটবে। হাতের টুকটাক কাজ কেড়ে নেবে। মা মা বলে ডাকবে। কিন্তু হায় রে কপাল, সেই রাধিকা আমার ছেলেকে কেড়ে

BanglaBook.org

নিয়ে গেলে। তোমার মতো বয়সে আমিও তো এ ঘরে বউ হয়ে এসেছিলাম। জায়গার সংকুলান সেই সময়েও তো ছিল না, চারদিকে মানুষ গিজগিজ করত সেই সময়েও। কই, আমি তো শক্তির বাপকে ফুসলিয়ে ঘর থেকে বের করে নিয়ে যাইনি! পরিবারের সকল মানুষকে আপন করে নিয়েছিলাম সেদিন। আর তুমি রাধিকা, ছলচাতুরী করে আমার ছেলেটির মন বিগড়ে দিলে। তাকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে গেলে!' এইসব দুঃখ-আফসোস মনের ভেতর চেপে রাখে মা। মুখে হাসি ফুটিয়ে বউয়ের কাছে এগিয়ে আসে। পাশে বসে জিজ্ঞেস করে, 'কেমন আছো বউ?'

রাধিকা বেজার মুখে সংক্ষেপে বলে, 'ভালো।'

'রান্নাবান্না করতে কষ্ট হয় না?'

'কষ্ট হবে কেন? দুজনেরই তো রান্না।'

মা মাথা নিচু করে জিজ্ঞেস করে, 'না, ভাবলাম পয়সাওয়ালার মেয়ে, বাপের বাড়িতে কোনোদিন রান্নাঘরে ঢুকোনি। এখন রাঁধতে গিয়ে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে তোমার।'

রাধিকা শাশুড়ির চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে বলে, 'দুজনের জন্য রাঁধতে কষ্ট পাবার কিছুই নেই। আপনাদের মতো রাবণের সংসার তো না!'

বউয়ের কথায় শাশুড়ির ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে। তারপরও মুখে হাসি ফুটিয়ে প্রসঙ্গ পাল্টায়। জিজ্ঞেস করে, 'পানি আর টাট্টিখানার সুবিধা আছে তো সেখানে?'

রাধিকা জ্বলজ্বলে মুখে বলে, 'চব্বিশ ঘণ্টা পানি। আর টাট্টিখানার কথা জিজ্ঞেস করছেন? এখানকার মতো সকাল সকাল উঠে টাট্টিখানার সামনে লাইন দিতে হয় না। শুধু আমাদের জন্যই একটা টাট্টিখানা। সেখানে যতক্ষণ ইচ্ছা বসে থাকা যায়। বাইরে দাঁড়িয়ে কেউ চিৎকার করে না—জলদি করো, জলদি করো। টাট্টি প্যাড় যাতা হ্যায়। আবে শালা, এতক্ষণ লাগে টাঙ্গি খালাস করতে?'

শাশুড়ি হাসবে না কাঁদবে বুঝে উঠতে পারে না। বউয়ের কথা তো এক অর্থে সত্য। এই কলোনিতে এতগুলো মানুষের জন্য মাত্র পাঁচটি টাট্টিখানা। ভোরে আজান পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শত মানুষের ভিড় লেগে যায় টাট্টিখানার সামনে। নারী-পুরুষের বাছবিচার নেই। কেউ ভিতরে ঢুকে বেশিক্ষণ থাকতে পারে না। বাইরে থেকে আওয়াজ ওঠে। কিন্তু টাট্টি বলে কথা। কারও খবরদারি শুনতে সে রাজি নয়। জোর চাপ পড়লে দিশেহারা হয়ে যায় মানুষ। তখন লজ্জা-শরম মাথায় ওঠে। বেদিশা হয়ে সে এদিক-ওদিক তাকাতে থাকে। টাট্টিখানা থেকে একটু দূরে বড় নালা। সেদিকে দৌড়ে যায় তখন সে। চোখ বন্ধ করে ওই নালার ধারে বসে

BanglaBook.org

পড়ে। কী লজ্জা, কিন্তু কী মুক্তি! এভাবে মেথরজীবনের দিন শুরু হয়। নারী বলে রেহাই নেই কারও। সুবিধা বা অগ্রাধিকারও নেই। টাট্টি ত্যাগের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়ের সমান অধিকার। তাই ওই নালার ধারে শুধু পুরুষ বসে না, নারীও বসে। তবে নারীর ক্ষেত্রে আড়াল-আবডাল আছে। চাদর বা কাপড় দিয়ে মুখ-মাথা ঢেকে নারীরা নালার ধারে বসে মলত্যাগ করে। এই খোঁচাটাই দিয়েছে রাধিকা তার শাশুড়িকে।

'কী করব মা। মানুষের চোখে আমরা ছোট জাত। আমাদের ছুঁলে নাকি তাদের জাত চলে যায়। মুরুব্বিদের কাছে শুনেছি—কলকাতা শহরে এই সেই দিন পর্যন্ত নাকি আমাদের মতো হরিজনরা দিনের বেলায় রাস্তায় বেরুতে পারত না। আমাদের দিয়ে কঠিন কাজগুলো আদায় করে নেয় ভদ্রলোকরা, আমাদের সুযোগ-সুবিধার দিকে তাকায় না। তোমার বাপের বাড়ির পট্টিতে যেমন, আমাদের এখানেও তেমনি পাঁচটি করে টাট্টিখানা। একই বেইজ্জতি, একই কষ্ট সব পট্টিতে। শুধু আমাদের পট্টির দোষ দিয়ে লাভ কী মা।' শাশুড়ি ধীরে ধীরে কথাগুলো বলে।

রাধিকা তৎক্ষণাৎ বলে, 'ওই জন্যই তো এই নোংরা পরিবেশ ছেড়ে গেছি আমরা। ভালো চাকরি করছি। সন্তানরা ভালো পরিবেশে মানুষ হোক, কে না চায়?'

শেষের বাক্যটি নিজেদের জন্য, না আগত সন্তানদের জন্য বলল রাধিকা, শাশুড়ি বুঝে উঠতে পারল না। তারপরও বলল, 'আমরাও চাই মা, তবে এই সুস্থ পরিবেশে কত দিন থাকা যাবে—ঈশ্বরই জানেন শুধু!'

রাধিকা ঝাঁজের গলায় বলল, 'কেন থাকা যাবে না, যাবে না কেন থাকা? আমরা কি কারও বাড়া ভাতে ছাই দিচ্ছি যে আমাদের থাকতে দেবে না?' শাশুড়ি বলল, 'থাকতে পারলে তো খুবই ভালো। তবে বাস্তবতা বড় নিষ্ঠুর মা।'

এবার উঁচু গলায় রাধিকা বলল, 'সে আমরা দেখব। এ ব্যাপারে আপনারা মাথা না ঘামালেই ভালো।'

এরপর শাশুড়ির আর কথা বলতে ভালো লাগে না। বুকের ভেতর কষ্ট দলা পাকিয়ে ওঠে। শাশুড়ি উঠে দাঁড়ায়। 'দেখি, তোমাদের একটু চা দেয়া যায় কি না' বলে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে যায় শাশুড়ি।

'রমাদিদি, যেভাবে পারেন একটা লোক ডেকে আনেন। বাপের বাড়িতে খবর দিতে হবে।' বউয়ের হাত চেপে ধরে তরুণীটিকে উদ্দেশ্য করে বলল শক্তিলাল।

রমাদি তীরবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। রাধিকার মাথায় হাত বুলাতে

BanglaBook.org

বুলাতে শক্তি আবার বলল, 'তুমি একটু ধৈর্য ধরো রাধা, আমি একটা ট্যাক্সি নিয়ে আসি। হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে তোমাকে।'

রাধিকা ঘন ঘন শ্বাস টানতে টানতে বলল, 'আমি আর পারছি না। আমি মরে যাব। আমার মাকে খবর দাও।'

রাধিকার ঘন চুলে আঙুল ডুবিয়ে শক্তি বলল, 'এখনই সবার কাছে খবর পাঠাচ্ছি। তুমি ধৈর্য ধরো, আমি একটা গাড়ি নিয়ে আসি।' বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল শক্তিলাল। ঘরের বাইরে রমাদির সঙ্গে দেখা। তার পেছনে বছর পঁয়ত্রিশের একজন মানুষ।

রমাদি বলল, 'তাড়াতাড়ি ঠিকানা বলেন। ও আমার স্বামী। ও সঙ্গে নিয়ে আসবে আপনার আত্মীয়দের।'

শক্তিলাল রমাদির স্বামীকে বান্ডেল আর মাদারবাড়িপট্টির ঠিকানা বলে বাবা ও শ্বশুরের নাম বলল। ছট করে রমার স্বামীর হাত চেপে ধরে বলল, 'দাদা, আমাদের বাঁচান, আমার স্ত্রীকে বাঁচান।'

লেবার রুমের বাইরে শক্তির বাপ-মা-ভাইবোন, শ্বশুর-শাশুড়ি ও অন্য আত্মীয়স্বজনের ভিড়। ভেতর থেকে নার্স এসে বলল, 'মেয়ে হয়েছে।' চমনলালকে দাদু আন্দাজ করে নার্সটি বলল, 'আমাদের বকশিশ দেন, মিষ্টি খাবার বকশিশ দেন।'

চমনলালকে ঠেলে শক্তির শ্বশুর সামনে এগিয়ে এল। হতদরিদ্র চমনলাল আর কী বকশিশ দেবে—এ রকম মুখভঙ্গি করে একশ টাকার দুটো নোট নার্সের হাতে গুঁজে দিল। বলল, 'আমি মেয়ের বাপ। নাতনি আর আমার মেয়ে সুস্থ আছে তো?'

নার্সটি মিষ্টি হেসে হ্যাঁ-সূচক মাথা নেড়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

এ দুই পরিবারের মানুষ আজ আবেদ কলোনিতে গিয়ে বড় লাঞ্ছনার শিকার হয়েছে। বাড়িওয়ালা জহিরউদ্দীন ক্ষিপ্ত হয়ে লাঠি উঁচিয়ে রামপ্রসাদের দিকে তেড়ে এসেছে। 'হারামখোর, মেথরের বাচ্চা, পরিচয় লুকিয়ে আমার বাড়িতে বসবাস! হায় হায় হায়, আমার জাত-সম্মান সবই গেল। এই ঘরে কি আর কোনো ভাড়াটে আসবে? মেথরের থাকা ঘর কোনো ভদ্র ভাড়াটে কি আর ভাড়া নেবে?'

রামপ্রসাদ অনুনয়ের সুরে কী যেন বলতে চাইল, কিন্তু প্রতিবেশী আম্বিয়া খাতুনের মা ঝাঁজিয়ে উঠল, 'চুপ থাক বেয়াদপপ্পী। এখনি ঘরের জিনিসপত্র নিয়ে যা, নইলে সব নালায় ফেলব।'

BanglaBook.org

অনেক মানুষের ক্ষিপ্ত মুখ দেখে হরিজনরা ঘাবড়ে গেল। ঘরের ভেতর ঢুকে যে যা পারল, গুছিয়ে নিল।

হাসপাতালের করিডরের এক কোণে বসে শক্তিলালের মা ভাবছে—ঈশ্বরের কী কৃপা! আমাদের বুকের ধন আমাদের ফিরিয়ে দিল। বড় আশা করে ছেলেকে বিয়ে করিয়ে ছিলাম। বউটি ছলচাতুরী করে শক্তিকে আমাদের কাছ থেকে নিয়ে গেল। দেড় বছর ফুরাতে না-ফুরাতে ঈশ্বর আমার আকুতি শুনল। একদিক দিয়ে বাড়িওয়ালা ভালো করেছে। বাড়িওয়ালা আর পড়শিরা একজোট হয়ে যদি শক্তি-রাধিকাকে ঘরছাড়া না করত, তাহলে নাতনি লালন-পালনের সুযোগ পেতাম না। হে ঈশ্বর, তোমাকে অসংখ্য নমস্কার। ঘরে জায়গা না হোক, তাতে কিচ্ছু আসে-যায় না। নাতনি দিয়েছে ঈশ্বর, জায়গাও করে দেবে ঈশ্বর।

কর্ণফুলী পাড়ের ঢালু মতন জায়গায় ফিরিঙ্গিবাজার মেথরপট্টিটি। পূর্ব দিক থেকে ক্রমশ পশ্চিম দিকে ঢালু। এ পট্টির পশ্চিম দিক ঘেঁষে বড় একটি নালা। এই নালা দিয়ে এলাকার যত বর্জ্যজল নিষ্কাশিত হয়। উত্তর দিকে পিচঢালা বড় রাস্তা, দক্ষিণে দূরে-কাছে বসতি। পূর্ব দিকে বড়সড় একটা খালি জায়গা। অচ্ছুত এই সম্প্রদায়টিকে জনবিচ্ছিন্ন করে রাখার জন্য পট্টির চারদিকে দেয়াল দিয়ে ঘিরে দেয়া হয়েছে। উত্তরে ছোট্ট একটি গেইট। ঈশ্বর-বিশ্বাসী এই পট্টির মানুষরা পূর্ব দিকের দেয়াল ঘেঁষেই তাদের মন্দিরটি তৈরি করেছিল বহু বছর আগে। পট্টির মানুষরা দেখল, পট্টিঘেঁষা পূর্ব দিকের ওই খালি জায়গাটিতে পাকা ঘর তোলার তোড়জোড় শুরু হয়েছে। করপোরেশনের ইঞ্জিনিয়ার আর কয়েকজন মানুষ মিলে ওই জায়গায় কী যেন মাপজোখ করল। তারপর কন্ট্রাক্টর এল, মজুর এল, ইট এল, রড-সিমেন্ট এল। জোরেশোরে মাটি খোঁড়াখুঁড়িও শুরু হলো। কৌতূহলী মানুষের ভিড় লেগে গেল সেখানে। অন্যান্য মানুষের তুলনায় পট্টির মানুষের কৌতূহল বেশি। তাদের পট্টির সীমানাদেয়াল ঘেঁষে, মন্দিরের সঙ্গে গা লাগিয়ে কী বানাচ্ছে করপোরেশন? ওদের ক্ষতি হবে এমন কিছু নয়তো? ওরা এগিয়ে যায়, মজুরদের জিজ্ঞেস করে, 'কী হচ্ছে ভাই এখানে?' মজুররা বলে, 'আমরা তো সঠিক জানি না, এখানে কী বানানো হচ্ছে। আমরা দিনমজুর। কন্ট্রাক্টর যা করতে বলছে, তাই করছি। তবে শুনেছি, বরফকল তৈরি করা হবে এখানে।' হরিজনরা আশ্বস্ত হয়—যাক, বরফকল হলে অসুবিধা কী? গরমের দিনে দু-এক টুকরা বরফ তো পাওয়া যাবে। চিনি-লেবু মিশিয়ে ঠান্ডা শরবত খাওয়া যাবে তখন। কিন্তু সেদিন মন্দির চত্বরে মদো শ্যামল বলল, 'বরফকল-টরফকল কিছু না। আমার কাছে পাক্কা খবর আছে। কন্ট্রাক্টর বলেছে, আমাদের জন্য আরেকটা

BanglaBook.org

বিল্ডিং বানাচ্ছে করপোরেশন।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তৃপ্তমুখে চেদিলাল বলল, 'যাক, এতদিনে তাহলে করপোরেশনের দয়া হলো! আমাদের কষ্টের কথা বড় সাহেবের কানে পৌঁছাল!'

কার্তিক সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলল, 'তুমি মানুষকে খুব সহজে বিশ্বাস করো কাকা। ওটাই তোমার বড় দোষ। করপোরেশনের বড় সাহেবের দয়ার শরীর, তা-ও আবার মেথরদের জন্য! বিশ্বাস করলে কী করে কন্ট্রাক্টরের কথা? যে লোক হরিজনদের চাকরি কেড়ে নেয়ার কৌশল করছে, সে কিনা বিল্ডিং বানাচ্ছে আমাদের মতো ছোটলোকদের জন্য!'

মদো শ্যামল বলল, 'আমার খবর পাক্কা। কন্ট্রাক্টরই বলেছে আমাকে।'

'রাখো তোমার কন্ট্রাক্টর। খবরটার মধ্যে যে গোঁজামিল আছে, বুঝতে পারছ না? মজুররা বলছে—বরফকল বানাচ্ছে আর কন্ট্রাক্টর বলছে হরিজনদের থাকার জন্য বিল্ডিং বানাচ্ছে।' কার্তিক রাগীকণ্ঠে বলল।

এতক্ষণ চুপচাপ থাকা সর্দার রামগোলাম বলল, 'ডালমে কুছ কালা হ্যায়। নিশ্চয় কোনো চালাকি আছে এখানে। ওইদিন বড় সাহেব অপমানিত হয়ে গেলেন স্কুল থেকে, এর কোনো বদলা নিচ্ছেন না তো তিনি?'

চেদিলাল বলল, 'আমার তা মনে হচ্ছে না।'

কার্তিক আগের মতো উষ্ণ স্বরে বলল, 'আমার বিশ্বাস—আবদুস ছালাম কোনো একটা অঘটন ঘটাতে যাচ্ছে এখানে। ওর মতো বদমাশ স্কুল থেকে অপমানিত হয়ে যাওয়ার পর টুঁ-শব্দটি করেনি, সর্দারকে ডেকে বকাঝকা করেনি, হরিজনদের বরখাস্ত করার ভয় দেখায়নি। একেবারে চুপচাপ। ওই ঘটনার দুই মাস পরে উনি দয়াবান হয়ে উঠলেন! হরিজনদের জন্য প্রাসাদ নির্মাণ করা শুরু করলেন! কী মজার ঘটনা, তা-ই না কাকা?'

চেদিলাল ইতস্তত করে বলল, 'না, আমি বলছিলাম কি—মানুষের মধ্যে তো পরিবর্তন আসে। বড় সাহেবের মধ্যেও হয়তো পরিবর্তন এসেছে।'

মদো শ্যামল জড়ানো কণ্ঠে হঠাৎ বলল, 'স্বভাব যায় না ম'লে, ময়লা যায় না কয়লা ধুলে।'

'তুমি ঠিক কথা বলেছ শ্যামল—যতই ধোও না কেন, কয়লার ময়লা সাফ হওয়ার নয়। বড় সাহেব ভালো লোক নয়। আমাদের ভালোর চিন্তা সে করে না। সর্দার, তুমি খোঁজ নাও—এর ভেতরের রহস্য কী?' কার্তিক বলল।

পরদিন কাজের শেষে দুপুরবেলায় হারাধনবাবুর সামনে কথাটি পাড়ল রামগোলাম, 'ব্যাপারটার রহস্য কী বলেন তো কাকা?'

'কোন ব্যাপার?' উদাসীন চোখে জিজ্ঞেস করেন হারাধনবাবু।

BanglaBook.org

'ওই যে আমাদের পট্টির পাশে করপোরেশন যে ঘরটি তুলছে, তার কথা জিজ্ঞেস করছি।'

'দেখ বাপু, আমি হলাম দুই টেইক্যা আদার ব্যাপারি, আমার জাহাজের খবর রেখে লাভ কী? সিনেমা হল বানাচ্ছে না কসাইখানা—তা আমার জানার কোনো উপায় আছে? ইঞ্জিনিয়ার আর বড় সাহেব তলে তলে কী বানাচ্ছেন, তা তো আমার জানার কথা নয় বাপু।' একটুক্ষণ কী চিন্তা করলেন হারাধনবাবু। তারপর স্বর নিচু করে বললেন, 'কন্ট্রাক্টর জানে, সে-ই তো বানাচ্ছে ঘরটা। তাকে চেপে ধরো, রহস্য বেরিয়ে আসবে।'

রামগোলাম বিচলিত কণ্ঠে বলল, 'কোনো ঘটনা আছে নাকি কাকা? আপনার গলায় কিসের যেন রহস্য?'

গত মাসে হঠাৎ করে হারাধনবাবুর বড় ছেলেটি মারা গেছে। ভেদবমি হয়ে এক রাতেই মারা গেল ছেলেটি। ডাক্তার দেখানোর সুযোগটি পর্যন্ত পাননি হারাধনবাবু। ছোট ছেলেটি হাবাগোবা। বড় ছেলেটি মারা যাওয়ার পর হারাধনবাবুর চোখের সামনে থেকে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল আলো সরে গেল। তাঁর ভেতর গভীর অনুশোচনা দেখা দিল। অতীতে যেসব অপরাধ করেছেন, সেগুলো তাঁকে কুরে কুরে খেতে লাগল। তিনি ঠিক করলেন—আর না, বড় সাহেবের সঙ্গে আর কোনো কুচক্রে অংশ নেবেন না তিনি। এই শেষ বয়সে ভগবান তাঁকে এত বড় শাস্তি দিলেন! নিশ্চয়ই কৃতকর্মের শাস্তি এটা। মিথ্যার সঙ্গে আর জড়াবেন না তিনি। বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হারাধনবাবু বললেন, 'ঘরটার রহস্য অল্প সময়ের মধ্যে তোমরা জেনে যাবে। তোমার যে কথাটি জানার দরকার, তা শোনো...।' বলে চুপ মেরে গেলেন হারাধনবাবু। তারপর চোখের ইশারায় রামগোলামকে আড়ালে যেতে বললেন। কিছুক্ষণ পর তার কাছে গিয়ে হারাধনবাবু এদিক-ওদিক সতর্ক দৃষ্টিতে তাকালেন। চাপা স্বরে বললেন, 'রামগোলাম, তোমাদের দুর্দিন সামনে। মাস খানেকের মধ্যে করপোরেশন নতুন সুইপার নিয়োগ দেবে। সবাই, মানে সব ধর্মের মানুষরা এই চাকরি পাবে, শুধু তোমাদের জন্য এই চাকরি আর থাকবে না।' তারপর গভীরভাবে কী যেন ভাবলেন তিনি। হঠাৎ কণ্ঠকে উঁচু করে বললেন, 'সংগঠিত হও, গর্জন করে ওঠো।' বলেই হন হন করে হাঁটা দিলেন হারাধনবাবু।

কয়েক দিনের মধ্যে চট্টগ্রামের হরিজনরা জেনে গেল, ফিরিঙ্গিবাজার সেবক কলোনির গায়ে গা লাগিয়ে করপোরেশন কসাইখানা তৈরি করছে। স্তম্ভিত হয়ে গেল তারা। তারা রামনামি হিন্দু। ঈশ্বর-ভগবান-দেবতায় বিশ্বাস তাদের। গরুকে মাতা হিসেবে মান্য করে তারা। আর সেই তাদের পাশেই কসাইখানা!

BanglaBook.org

হা ঈশ্বর, কী অরাজকতা শুরু হলো! ঈশ্বর তাদের মাথার ওপর কী দুর্বিষহ বজ্র নামিয়ে দিল! এ রকম ভাবতে ভাবতে একসময় মেথররা ঠিক করল—ঘরে বসে বসে আফসোস করলে চলবে না। প্রতিবাদ করতে হবে। প্রতিবাদের আগে বড় সাহেবের কাছে আরজি জানাতে হবে—হুজুর, এই সিদ্ধান্ত থেকে আপনি সরে আসুন। আমাদের সর্বনাশ করবেন না। নিত্যদিন গরু-ছাগলের রক্ত মাড়িয়ে আমাদের চলাচল করতে হবে। আমরা নিরীহ জাতি, আমাদের জীবন, আমাদের ধর্ম নিয়ে এভাবে খেলবেন না হুজুর।

হরিজনদের আরজি শুনে চেয়ারে হেলান দিয়ে আবদুস ছালাম বললেন, 'ওখানে কসাইখানাই যদি হয়, তাতে তোমাদের সমস্যা কোথায়?'

'হুজুর, আমাদের ধর্ম নাশ হবে।' বিনীতভাবে বলল চমনলাল।

বড় সাহেব সামনের টেবিল থেকে তাঁর পানি খাবার দামি গ্লাসটা হাতে তুলে নিলেন। হঠাৎ মেঝেতে গ্লাসটি জোরে ছুঁড়ে দিলেন। গ্লাসটি মেঝেতে পড়ে চুরমার হয়ে গেল। বড় সাহেব বললেন, 'তোমাদের ধর্ম কি এই কাচের গ্লাসের মতো ঠুনকো যে, সামান্য কসাইখানার কারণে ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে?'

বড় সাহেবের এই অদ্ভুত কাণ্ডে সামনে দাঁড়ানো সর্দার-মুখ্যরা হতভম্ব হয়ে গেল। কিছুক্ষণ তাদের মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরোল না। তারপর ধীরে ধীরে সর্দার রামগোলাম বলল, 'না, বলছিলাম কি হুজুর, ব্যাপারটি আমাদের ধর্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। সেই বিশ্বাসে আঘাত না দিলেই কি নয়?'

পাশ থেকে যোগেশ বলে উঠল, 'আহা! আঘাত দেয়া কোথায় দেখলে সর্দার? করপোরেশন সিদ্ধান্ত নিয়েছে—কসাইখানা করবে, করুক। তাতে আমাদের বাধা দেয়ার কী আছে? জায়গা তো করপোরেশনের। নিজের জায়গায় কী বানাবে—সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার তো করপোরেশনের আছে, কী বলো?'

'চামচার বাচ্চা, বেহেনচোদ। চামচাগিরি করস খানকির পোলা?' বলতে বলতে কার্তিক যোগেশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। অতর্কিতে আক্রমণের ফলে ধপাস করে মেঝেতে পড়ে গেল যোগেশ। বুকের ওপর বসে অবিরাম চড়-ঘুষি চালিয়ে যেতে লাগল কার্তিক। রে রে করে ছুটে এল মনুলাল। এক ঝটকায় যোগেশের বুক থেকে কার্তিককে সরিয়ে দিল। যোগেশকে টেনে তুলতে তুলতে বড় সাহেবকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'যোগেশ এমন কী অন্যায় কথা বলেছে হুজুর, এতগুলো লোকের সামনে যোগেশকে মার খেতে হলো? হাজার হলেও মুখ্য সে, ঝাউতলার মুখ্য। কার্তিকের মতো একজন সাধারণ মানুষ মুখ্যর গায়ে হাত তুলল? জঘন্য অপরাধ হুজুর, বিচার করেন।'

আবদুস ছালাম গর্জে উঠলেন, 'বেরিয়ে যা, দুজনেই আমার সামনে থেকে

BanglaBook.org

বেরিয়ে যা। এই ইউসুফ, এ দুইজনকে আমার রুম থেকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দে।'

যোগেশ আর কার্তিক ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে পাকা অভিনেতার মতো নিরুত্তাপ কণ্ঠে রামগোলামকে উদ্দেশ্য করে বড় সাহেব বললেন, 'দেখ সর্দার, করপোরেশনের নিজস্ব একটা কসাইখানা দরকার। আজকাল শহরের যেখানে-সেখানে মানুষরা গরু-ছাগল জবাই করছে। এখানে-ওখানে নাড়িভুঁড়ি ফেলে রাখছে। তাতে মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হচ্ছে। এগুলো বন্ধ করা দরকার। মানুষের সার্বিক সুবিধার কথা চিন্তা করে আমি একটা কসাইখানা তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

'তাই বলে জায়গাটা ঠিক করলেন আমাদের পট্টি ঘেঁষেই? আমাদের স্বাস্থ্যের কথা ভাবলেন না আপনি?' রামগোলাম জিজ্ঞেস করল।

পাশ থেকে মদো শ্যামল বলে উঠল, 'ভাববেন কেন? আমরা তো মানুষ না, গুয়ের পোকা। গুয়ের পোকাদের আবার স্বাস্থ্য!'

ছালাম সাহেব চোখ লাল করে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। তারপর নিরাবেগ কণ্ঠে বললেন, 'আমি তো বলিনি—তোমরা গুয়ের পোকা। তোমাদের আমি রক্ত-মাংসের মানুষ হিসেবে মর্যাদা দিই। নইলে কেন তোমরা সেদিন স্কুলে আমাকে এত বড় অপমান করলে, তার পরেও কিছু বলেছি আমি? কিছু করেছি আমি তোমাদের বিরুদ্ধে?'

সর্দার বলল, 'আপনি বড় বুদ্ধিমান মানুষ হুজুর। সেদিন কিছু করেননি, আজ করছেন। মন্দির ঘেঁষে কসাইখানা তৈরি করে আমাদের সর্বনাশ করছেন।'

বড় সাহেব কঠিন কিছু বলতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিলেন। তারপর শান্ত স্বরে মিষ্টি গলায় বললেন, 'দেখ রামগোলাম, তুমি শুধু পট্টির সর্দার নও, এই করপোরেশনের একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারীও। হরিজনদের প্রতি তোমার যেমন দায়িত্ব আছে, তেমনি করপোরেশনও তোমার কাছ থেকে সুবিবেচনা আশা করে। করপোরেশনের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে যদি এর কোনো লোকসান ঘটাও, তাহলে সে লোকসানের দায়ভার তোমার ওপরও বর্তাবে।'

চেদিলাল বলল, 'করপোরেশনের লোকসানের কথা বলে হুজুর আপনি আমাদের সর্দারকে ভয় দেখাচ্ছেন?'

মনুলাল বলল, 'ভয় দেখানোর কী দেখলে চেদিলাল? যেখানে চাকরি করে আমরা পেটের ভাত জোগাড় করি, তার কথাও তো ভাবতে হবে আমাদের।'

ঠান্ডা মাথার চেদিলাল নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারল না। রাগী কণ্ঠে বলল, 'তোমাদের মতো বেইমানদের জন্য যুগে যুগে আমরা পায়ের তলায় পড়ে আছি। তোমাদের জন্য আমাদের ধর্ম যাবে, নীতি যাবে, বিশ্বাস যাবে। তোমাদের

BanglaBook.org

জন্যই আরও হাজার হাজার বছর ধরে আমাদেরকে ভদ্রলোকদের গোলামি করে যেতে হবে।' শেষের দিকে আবেগে চেদিলালের কণ্ঠ বুজে এল।

'বিপ্লবী কথা বলে তুমি হরিজনদের চেতাবার চেষ্টা করছ চেদিলাল? একদিকে অসীম ক্ষমতার করপোরেশন, অন্যদিকে তোমরা। কতটুকুই বা ক্ষমতা তোমাদের? তোমরা আবার একজোট নও। তোমাদের মধ্যে মনুলাল আছে, যোগেশ আছে—তাদের সহযোগিতা তোমরা কখনো পাবে না। মদ এবং ক্ষমতার লোভে এরা আমার পাশে ঘুরঘুর করবে। এদের দিয়ে আমি অন্যদের কিনব। কিছুই করতে পারবে না তোমরা।' ভয় পাইয়ে দেয়া কণ্ঠস্বরে কথাগুলো বললেন আবদুস ছালাম।

এবার দৃঢ় কণ্ঠে সর্দার রামগোলাম বলল, 'আপনি ঠিকই বলেছেন হুজুর, যোগেশ-মনুলালদের জন্য যুগে যুগে আন্দোলন থেমে গেছে। প্রত্যেক যুগে বিভীষণ আছে, মীরজাফর আছে, খন্দকার মোশতাক আছে। আবার এটাও সত্য যে কুম্ভকর্ণ, মীরমর্দানও আছে সব যুগে। তারা সত্য প্রতিষ্ঠার, অধিকার আদায়ের জন্য জান দেয়; আমরাও দেব।'

হঠাৎ সমবেত হরিজনরা চিৎকার করে উঠল—'ভয় দেখাবেন না, প্রয়োজনে জান দেব, ওইখানে কসাইখানা হতে দেব না।'

আবদুস ছালাম বিচলিত হলেন। হইচইয়ের মধ্যে বেল টিপে ইউসুফকে ডাকলেন, ইঞ্জিনিয়ার আর হারাধনবাবুকে ডেকে আনতে বললেন। ওরা এলে ঠান্ডা মাথায় হরিজনদের উদ্দেশ্য করে বললেন, 'দেখ তোমরা, এর মধ্যে কসাইখানার জন্য লক্ষাধিক টাকা খরচ হয়ে গেছে। কন্ট্রাক্টরের সঙ্গে চুক্তি ভঙ্গ করলে আমাদের আরও কয়েক লক্ষ টাকা লোকসান গুনতে হবে।'

আবদুস ছালামের কথার মাঝখানে ইঞ্জিনিয়ার বলে উঠলেন, 'তা ছাড়া কসাইখানাটি এমনভাবে তৈরি করা হবে, বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যাবে না। তাঁবুর স্টাইলে এটা তৈয়ার করা হবে। তোমরা কিছুই দেখবে না। রক্তের নিশানা পর্যন্ত দেখবে না তোমরা। প্রতিদিন এমন ওষুধ ব্যবহার করা হবে, কোনো গন্ধ পাবে না তোমরা। কসাইখানার চারদিকে ফুলের বাগান করা হবে।' তারপর হারাধনবাবুর দিকে ফিরে বললেন, 'আপনি কি বলেন হারাধনবাবু?'

হারাধনবাবু বললেন, 'আমি আর কী বলব স্যার, ওদের সমস্যা ওরা বুঝবে। প্রত্যেকের ধর্ম আছে, বিশ্বাস আছে; এদের ধর্ম-বিশ্বাসে যাতে আঘাত না লাগে, সে ব্যবস্থা করেন।' তারপর করুণ চোখে হরিজনদের দিকে তাকালেন হারাধনবাবু। রামগোলামের চোখে চোখ রেখে দুই কাঁধ ঝাঁকালেন।

রামগোলাম কী যেন বলতে চাইল। ডান হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলেন

BanglaBook.org

আবদুস ছালাম। বললেন, 'ধর্মবিশ্বাসে আঘাত লাগবে কেন? ওরা হরিজন বলে কি ওদের ধর্ম নেই? যার যার ধর্ম তার তার কাছে বড়। আমারও তো ধর্ম আছে। কেউ আমার ধর্মে আঘাত করলে আমি কি ছেড়ে দেব? কখনো নয়। দেখ, এই কসাইখানা তোমাদের ধর্ম পালনে যদি বাধার সৃষ্টি করে, তখন বলো। একদিনে গুঁড়িয়ে দেব আমি ওই কসাইখানা। কোথায় সামান্য একটা কসাইখানা আর কোথায় মানুষের মহান ধর্ম! তোমাদের ধর্মবিশ্বাস আমার কাছে অনেক বড়। তোমাদের সামনে আমি ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে নির্দেশ দিচ্ছি—এই কসাইখানা এমন করে বানাবেন, যাতে বিন্দু পরিমাণ রক্ত আর সামান্য পরিমাণ দুর্গন্ধ বাইরে না আসে। এমন ব্যবস্থা নিন—বাইরে থেকে এটাকে মানুষ যাতে কসাইখানা হিসেবে বুঝতে না পারে।'

আবদুস ছালামের ভাষণে হরিজনরা একে অন্যের মুখ চাওয়াচাওয়ি শুরু করল। তাদের চেহারায় যেন আগের মতো উগ্রতা নেই, তাদের চোখেমুখে যেন সদয় বিবেচনার ভাব।

ছালাম সাহেব গভীর অভিনিবেশে তাদের দিকে চেয়ে থাকলেন। ভেতরটা তার বিজয়ের আনন্দে নেচে উঠল। সুযোগ নিলেন তিনি। বললেন, 'দেখো, তোমাদের ধর্মকে আমি কত ভালোবাসি আর তোমাদের কত পছন্দ করি, তার প্রমাণ দেব আমি, আজকে। তোমাদের মন্দির টাইলস দিয়ে বাঁধিয়ে দেয়া হবে—দেয়াল, মেঝে, সিঁড়ি—সব জায়গা। এ জন্য যা খরচ হবে—সব বহন করবে করপোরেশন। কী, খুশি তো তোমরা?'

আবদুস ছালামের এই প্রতিশ্রুতির মধ্যে কোনো চালাকি আছে কি না—এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র না ভেবে সর্দার রামগোলাম ছাড়া সমবেত হরিজনরা সমস্বরে আচমকা বলে উঠল, 'আমরা খুশি, আমরা খুব খুশি হুজুর। আপনি আমাদের মন্দির টাইলস দিয়ে মুড়িয়ে দেবেন, এটা ভাবতেও পারিনি আমরা।'

আবদুস ছালাম কণ্ঠে আবেগ ঢেলে বললেন, 'তোমাদের খুশিতে আমার খুশি।'

'আমি কিন্তু খুশি না বড় সাহেব। আপনার এ প্রস্তাবে আমি আনন্দ পাচ্ছি না। ষড়যন্ত্রের ইশারা পাচ্ছি।' জোর গলায় বলে উঠল রামগোলাম।

চেদিলালই প্রথমে প্রতিবাদ করে উঠল, 'এসব কী বলছ তুমি সর্দার। কত কষ্ট করে এক-দুই টাকা চাঁদা তুলে তুলে কোনোরকমে মন্দিরটাকে খাড়া করেছি আমরা। তা-ও কত বছর লেগে গেল! সেই মন্দিরকে একেবারে টাইলসে ঢেকে দেয়া! হরিজনদের কত বড় সৌভাগ্য, ভেবে দেখেছ তুমি?'

চেদিলালের মুখ থেকে কথা অনেকটা কেড়ে নিয়ে মনুলাল বলল, 'তা ছাড়া,

BanglaBook.org

তুমি বড় সাহেবের কথায় ষড়যন্ত্রের ইশারা পেলে কোথায়? তিনি যা বলেছেন, সাফছোফ বলেছেন।'

রামগোলাম মাথা ঠান্ডা রেখে শান্ত স্বরে বলল, 'তোমরা এখন বুঝতে পারছ না। একসময় সত্য বেরিয়ে আসবে তোমাদের সামনে, তখন মুক্তির কোনো পথ পাবে না। সেদিন আমার কথা স্মরণ করো।'

পেছন থেকে জোর গলায় কে যেন বলল, 'যখন সমস্যা, তখন দেখা যাবে। এখন আমাদের মন্দিরটার উন্নতি হোক, তুমি বাধা দিয়ো না সর্দার।'

সর্দার রামগোলাম অত্যন্ত অসহায় দৃষ্টিতে হরিজনদের দিকে তাকাল, একজন থেকে আরেকজনের মুখে দৃষ্টি ফেলল। দেখল, সবারই মুখ একই কথা বলছে—মন্দিরের উন্নয়নের কাজে বাধা দিয়ো না সর্দার। এ কাজে বাধা দিলে তোমাকে সমর্থন করব না আমরা। রামগোলাম তারপর তাকাল হারাধনবাবুর দিকে। দেখল, অত্যন্ত অসহায় চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছেন হারাধনবাবু। হারাধনবাবুর চোখ বলছে—কাদের জন্য যুদ্ধ করছ তুমি রামগোলাম? যাদের জন্য প্রতিবাদ করছ তুমি, তারা সরল বিশ্বাসী, কথার মারপ্যাঁচ, জীবনের রুক্ষকঠিন চালাকি ওদের জানা নেই। ওরা বর্তমানে বিশ্বাসী, ভবিষ্যতের দুর্যোগকে ওরা আমলে আনে না। আজ দেখো, সামান্য আশ্বাসে ওরা ভেসে গেল। এই কসাইখানা ভবিষ্যতে তোমাদের জীবনে কী দুর্ভাবনা বয়ে আনবে, তা ওরা ভাবতে রাজি নয়। ওরা তোমাকে চুপ থাকতে বলছে। আমিও বলছি—তুমি চুপ থাকো। এখন প্রতিবাদ করলে তুমি হরিজনদের কাছ থেকে কোনো সমর্থন পাবে না; বরং উল্টো দুই কথা শুনিয়ে দেয়ার সম্ভাবনা আছে। তুমি চুপ মেরে যাও রামগোলাম।

রামগোলাম মাথা নিচু করল। মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকল। সারা মুখে শ্লেষের হাসি ছড়িয়ে আবদুস ছালাম রামগোলামের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর বললেন, 'তোমরা এখন যাও। ফুর্তি করো আজ। যাওয়ার সময় ক্যাশিয়ারের সাথে দেখা করে যাও তোমরা। এই ইউসুফ, এদের কিছু টাকা দিয়ে দিতে বলো ক্যাশিয়ারকে। ওরা আজ রাতে একত্রে বসে আনন্দ করবে।' তারপর টেনে টেনে বললেন, 'তুমিও যাও রামগোলাম। তুমিও ফুর্তি করো তোমার পরমাত্মীয়দের সঙ্গে।'

রামগোলাম হরিজনদের মাঝখান দিয়ে মাথা নিচু করে বড় সাহেবের কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল।

BanglaBook.org

সতেরো

পরদিন থেকে কসাইখানার নির্মাণকাজ জোরকদমে এগিয়ে চলল। মাটির নিচ থেকে কাঠামো মাথা তুলল। টিনের ঘেরা দিয়ে চারদিক আড়াল করা হলো। ভেতরে কী হচ্ছে—অন্য মানুষের কৌতূহল থাকলেও হরিজনদের মধ্যে বিন্দুমাত্র কৌতূহল দেখা গেল না। তারা তো জেনে গেছে—ওখানে একটা কসাইখানা হবে; কসাইখানাটি হবে দুর্গন্ধমুক্ত, জবাই করা পশুর রক্তের ছিটেফোঁটাও বাইরে আসবে না। সুবাসিত ফুলের বাগান হবে ওখানে। ওদের ধর্ম নাশ হবে—এমন কোনো কাজ এই কসাইখানাকে ঘিরে হবে না। এখন ওদের যত কৌতূহল মন্দির ঘিরে। পিকআপভর্তি টাইলস এনে মন্দিরের চত্বরে রাখা হয়েছে। প্যাকেট প্যাকেট নানা কিসিমের টাইলস—মেঝের, দেয়ালের; ধবধবে সাদা, রঙিন। প্যাকেটের চারদিকে সকাল থেকে ভিড় লেগে যায়—নানা বয়সের ছেলেমেয়ের, বুড়োবুড়ির, তরুণী-কিশোরীর, সধবা-বিধবার, তরুণ-বয়স্কের, মুখ্য-সাধারণের। মন্দিরে টাইলস লাগানোর কাজ শুরু হলে হরিজনদের কৌতূহল বাড়ে, ভিড় বাড়ে। এই ভিড়ে সবাই থাকে, থাকে না শুধু সর্দার রামগোলাম আর কার্তিক।

কাজ শেষে রামগোলাম ঘরে ফেরে। চুপচাপ নিজের খাটিয়ায় শুয়ে থাকে। কখনো কখনো চেয়ারে বসে গালে হাত দিয়ে মগ্ন হয়ে কী যেন ভাবে। তার মধ্যে আগের কর্মোদ্দীপনা নেই; পট্টির অন্যদের সুখ-দুঃখের খোঁজখবর নেয়ার যে স্পৃহা ছিল তার মধ্যে, তা-ও উধাও হয়ে গেছে।

চাঁপারানী জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছে বাপ? এত চুপচাপ কেন?'

রামগোলাম করুণ চোখে মায়ের দিকে তাকায়। বলে, 'কিছু না মা, কিছু না।'

রামগোলামের বেদনাদীর্ণ গাম্ভীর্য দেখে চাঁপারানী আর কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস পায় না, রামগোলামের পাশ থেকে সরে যায়।

অঞ্জলি কাছে এসে বসে। চোখের জ্যোতি কমে এসেছে অঞ্জলির, অনেকগুলো দাঁতও পড়ে গেছে। মুখটা রামগোলামের মুখের কাছে এগিয়ে এনে

BanglaBook.org

জিজ্ঞেস করে, 'সর্দার, নিশ্চয় তোমার কিছু হয়েছে। বলো কী হয়েছে?'

'ঠাকুমা, কিছুই হয়নি। আমাকে নিয়ে শুধু শুধু তোমরা চিন্তা করছ।' রামগোলাম চাপা স্বরে বলে।

অঞ্জলি বলে, 'দেখো রামগোলাম, চুল তো আমার এমনি এমনি পাকেনি। আমি শুধু সর্দারের ঠাকুমা না, সর্দারের বউও ছিলাম একসময়। তোমার দাদুর মতো জাঁদরেল সর্দারের ঘর করেছি অ-নে-ক বছর। তুমি কি আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে?'

ঠাকুমার কথায় শোয়া থেকে উঠে বসে সর্দার। খাটিয়ায় পা ঝুলিয়ে দাদির চোখে চোখ রেখে সেদিনের সব কথা ধীরে ধীরে বলে যায় রামগোলাম। শেষে বলে, 'হরিজনদের সরলতার সুযোগ নিচ্ছেন ছালাম সাহেব। মন্দির উন্নয়নের প্রলোভন দেখিয়ে আমাদের সর্বনাশ করছেন তিনি। ইঞ্জিনিয়ার তাঁর সঙ্গে জুটেছে। হারাধনবাবু অসহায়। তিনি সবকিছু আমাকে বলেছেন। বলেছেন—আমাদের সর্বনাশ সামনে। এ কথাগুলো বোঝাতে চেয়েছি আমি ওদের। কিন্তু অন্ধ ওরা, আমার কথা বিশ্বাস করছে না। আমি এখন কী করব, বুঝতে পারছি না।'

'ওদের একবার ঠকতে দাও। শিক্ষা হোক ওদের। ধাক্কা খেলে তোমাকে আবার আঁকড়ে ধরবে ওরা।' দুজনেই চমকে তাকাল। দেখল, শিউচরণ দাঁড়িয়ে।

'বাবা তুমি?' রামগোলাম বলল।

'হ্যাঁ, আমি।' ছেলের পাশে বসতে বসতে শিউচরণ বলল, 'গত বেশ কিছুদিন ধরে আমি তোমাকে লক্ষ করছি। তোমার আশপাশে ঘুরেছি, তুমি মুখ খোলোনি। নিরুপায় হয়ে হারাধনবাবুর কাছে গেছি। সেদিনের সব ঘটনা তার কাছ থেকে শুনেছি আমি। সব শুনেই তোমাকে বলছি—একবার ঠকতে দাও ওদের।'

রামগোলাম বলল, 'বাবা, তুমি কি ঠিক বলছ? এ ঠকা তো ঠকা নয়, একেবারে লোকসানের সমুদ্রে তলিয়ে যাবে হরিজনরা। আজীবন হরিজন-সমাজ এই লোকসানের হাত থেকে মুক্তি পাবে না।'

শিউচরণ বলল, 'ওরা মোহে অন্ধ হয়ে গেছে। ইন্ধন জোগাচ্ছে যোগেশ আর মনুলাল। তোমার সবচেয়ে কাছের মানুষ যারা, সেই চেদিলাল, চমনলালদের লোভে পেয়েছে। সেদিনের অপমানে কার্তিক চুপ মেরে গেছে। আমার যা মনে হচ্ছে, ভবিষ্যতে হরিজনদের আরও বড় ক্ষতি করবে বড় সাহেব। তুমি কার্তিককে ডেকে নাও, তার সঙ্গে পরামর্শ করো।'

রামগোলাম অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে শিউচরণের দিকে। সারাটা জীবন বাপকে তার সহজ-সরল মানুষ বলে মনে হয়েছে। সাদামাটা বাপটি তার এত

BanglaBook.org

প্যাঁচগোছের ধার ধারে না—এটা তার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু আজকে বাপের পরামর্শ শুনে পিতা সম্পর্কে রামগোলামের ধারণাটাই পাল্টে গেল। ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বলল, 'তুমি ঠিকই বলেছ বাবা, কার্তিকই আমার ভরসা।'

অঞ্জলি হঠাৎ শিউচরণকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'তোমার ছেলের বয়স তো কম হলো না। বিয়ে করাবে না তাকে? স্বামী-স্ত্রী দুজনেই চুপচাপ বসে আছ যে? এপট্টি-ওপট্টি মেয়ে দেখো না কেন?'

বাপকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে রামগোলাম বলে উঠল, 'বিয়ে আমি করব না ঠাকুমা।'

'দূর পাগলা, ওই রকম সবাই বলে। তোমার দাদুও নাকি বিয়ে করবে না বলেছিল।' অঞ্জলি হাসতে হাসতে বলল।

'সত্যি বলছি ঠাকুমা, বিয়ে আমি কখনো করব না।' শান্ত কণ্ঠে রামগোলাম বলল।

অঞ্জলির মুখ থেকে হাসিটা মিলিয়ে গেল। বিপন্ন-বিষণ্ণতার আভা সে মুখে ছড়িয়ে পড়ল ধীরে ধীরে। অঞ্জলি করুণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'কেন তুমি বিয়ে করবে না?'

রামগোলাম বলল, 'সর্দার হওয়ার পর দাদু একদিন বলেছিল, হরিজনরা বড় অসহায় জাত। তাদের দেখবার কেউ নেই। তাদের হয়ে লড়তে গেলে হারার সম্ভাবনা বেশি। তারপরও তোমাকে বলছি রামগোলাম, ওদের ভুলে যেয়ো না। হরিজনরা অশিক্ষিত। তাই ওদের মনের জোরও কম। একটুতেই নিজেদের বিকিয়ে দেয় ওরা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ওরা সহজ-সরল। এই মানুষদের সর্দার হয়েছ তুমি। ওদের অনেক ভুল-ভ্রান্তি তোমাকে মাফ করে দিতে হবে। ওদের জন্য জীবনটা উৎসর্গ করো তুমি রামগোলাম। তাহলে আমি অনেক বেশি সুখ পাব। অবহেলিত হরিজনদের জন্য লড়াই করতে হলে সংসারের বন্ধনে জড়ালে চলবে না।'

শিউচরণ অসহায়, বিষণ্ন চোখে পুত্রের দিকে তাকিয়ে আছে। পিতা হয়ে পুত্রকে এ মুহূর্তে কী বলা উচিত, তা ঠিক করতে পারছে না শিউচরণ। এ অবস্থায় অঞ্জলি বলল, 'তুমি কিছু বলছ না কেন শিউচরণ? আমি তো ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছি না—বিয়ে করবে না!'

'আমি কী বলব মা! সারাটা জীবন ওকে আমি বাধা দিইনি। দাদুর কথা শুনে চলেছে সে। আজকে দাদুর দোহাই দিচ্ছে। ও বড় হয়েছে মা। ওকে ওর মতো করে ভাবতে দাও। যদি কোনোদিন বিয়ে করার আগ্রহ প্রকাশ করে, তখন বিয়ের ব্যবস্থা করব আমরা।' শিউচরণ মাকে উদ্দেশ্য করে বলে।

BanglaBook.org

খেতে ডাকতে এসে শিউচরণের সব কথা শোনে চাঁপারানী। সে প্রতিবাদ করে, 'তাই বলে কি রামগোলাম বিয়ে করবে না? ছেলের কথাই কি শেষ কথা? আমাদের আবদার-আকাঙ্ক্ষা বলে কিছুই নাই?'

শিউচরণ বলে, 'আহা চাঁপা, মাথা ঠান্ডা করো। একদিন না একদিন রামগোলাম সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসবে। তখন তো আমরা আছি। তখন বিয়ের ব্যবস্থা করো তুমি।'

'বুঝি না আমি, কিছু বুঝি না। তোমরা বাপ-ছেলে মিলে যা ইচ্ছা করো।' বলতে বলতে ধুপধাপ করে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল চাঁপারানী।

শার্ট গায়ে দিতে দিতে রামগোলাম বলে, 'দেখি, কার্তিককে পাওয়া যায় কি না।'

অঞ্জলি বলে, 'রাত হয়ে গেছে, এখন কোথায় পাবে কার্তিককে? খাওয়ার সময় হয়েছে। খেয়ে যাও।'

'তোমরা খেয়ে নাও। এই যাব আর আসব। মাদারপট্টি আর কত দূর?' বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল রামগোলাম। রামগোলামের ঘরে দুই প্রজন্মের দুজন মানুষ মুখোমুখি চুপচাপ বসে থাকল দীর্ঘক্ষণ।

মাদারপট্টিতে মদের জমজমাট আসর বসেছে। মদো শ্যামলও এসে জুটেছে। বান্ডেলের মুখ্য চেদিলাল আজ এই আসরের প্রধান অতিথি। যোগেশ আয়োজক। অন্যরা এই পট্টিরই। গোল হয়ে চাটাইয়ে বসেছে তারা। মাঝখানে চার-পাঁচটা বাংলা মদের বোতল। দাঁড়ানো এবং কাত হয়ে শোয়া। কাতেরগুলোকে এর মধ্যে খালি করে ছেড়েছে মদোরা। এগুলোর ঠিক মাঝখানে একটা হুইস্কির বোতল বনেদি ভঙ্গি নিয়ে দাঁড়ানো। পূর্ণ। ছিপিটি পর্যন্ত খোলা হয়নি। সবাই ঢুলুঢুলু। তারপরও সবার দৃষ্টি ওই বনেদি বোতলের দিকে। যোগেশই এনেছে বোতলটি। যোগেশকে ওটি কেনার টাকা জুগিয়েছে ইউসুফ। বলেছে, 'বড় সাহেব বলেছেন গণ্যমান্যদের নিয়ে খেতে। কসাইখানা শেষ না হওয়া পর্যন্ত যেন কেউ ট্যাঁ-ফ্যাঁ না করে।'

যোগেশ ঠিক করেছে—আসরটা মাদারপট্টিতেই বসাবে। কার্তিক সম্বন্ধীর পুতের ঘর ওই পট্টিতে। ওখানকার মানুষদের কবজা করতে হবে। মাদার চোদ, সেদিন বড় সাহেবের রুমে কী অপমানটাই না করেছে! প্রতিশোধ নেয়ার এই তো সুযোগ। প্রথমে মদো শ্যামলকে খবর দিয়েছে যোগেশ। বিদেশি মালের লোভ দেখিয়েছে। মাদারপট্টিতেই আসর বসাতে হবে। ওখানকার পাঁচ-ছয়জনকে আসরে টানতে হবে। মন্দির ও কসাইখানা-সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে চেদিলাল ও যোগেশ

BanglaBook.org

কাছাকাছি এসেছে। চেদিলালকে মুঠোয় পুরতে পারলে বড় সাহেবের উদ্দেশ্য হাসিল হবে। কার্তিক শালার বেটা কোথায় ভেসে যাবে!

সর্দার রামগোলামকে তো বড় সাহেব কৌশলে বসিয়ে দিলেন। মন্দির বাঁধাইয়ের প্রলোভনটা সামাল দিতে পারল না হরিজনরা। এক তুরুপেই কেল্লা ফতে। ভালো হইচই বাঁধাতে চেয়েছিল রামগোলাম। বড় সাহেব বলে কথা! মাথাটা বুদ্ধির কারখানা ছাড়া কিছু না। কসাইখানার বিষয়ে এমন সাফাই গাইলেন—বোকা হরিজনরা মুগ্ধ হয়ে গেল। সঙ্গে মিশেছে ধুরন্ধর ইঞ্জিনিয়ার। তারপরও তো হরিজনদের মধ্যে বিচলিত ভাব রয়ে গেল। মন্দিরের এক টেক্কাতেই কুপোকাত। এরপরও বড় সাহেবের মনে হরিজনদের নিয়ে ভয়। যদি এককাট্টা হয়ে প্রতিবাদে নামে? রামগোলাম সম্পর্কে সতর্ক না হলে চলে না। তাকে সবাই শ্রদ্ধা করে। অপমানের ঘোর কাটিয়ে যদি সবাইকে ডাক দেয়, যদি সবাইকে একত্র করে কোনো হাঙ্গামায় নামে, তাহলে বিপদ। এ জন্য অন্তত কসাইখানা তৈরি শেষ না হওয়া পর্যন্ত হরিজনদের মধ্যে বিভেদটা টিকিয়ে রাখতে হবে।

বড় সাহেব খবর নিয়ে জেনেছেন, রামগোলাম নিজেকে একেবারে গুটিয়ে নিয়েছে। আগের মতো সবার সঙ্গে মেলামেশা করে না। মেথররাও মন্দিরের কাজে তাকে ডাকছে না। ফায়দা লুটার সময় এসে গেছে। হরিজনদের মধ্যে আরেকজন সর্দার তৈরি করা যাবে না, তবে সর্দার রামগোলামের প্রতিপক্ষ তৈরি করা যাবে। মেথরপট্টিতে রামগোলামের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে কেউ রাজি হবে না। কার্তিককে রামগোলামের বিকল্প চিন্তা করা যেত। কিন্তু সে রামগোলামের চেয়েও উগ্র; তার হরিজনপ্রীতিতে কোনো খাদ নেই। তাকে দলে ভেড়ানো সম্ভব নয়। তাই যোগেশকে কাছে টেনেছেন বড় সাহেব। তাকে দিয়ে হরিজনদের মধ্যে বিভেদটা চাগিয়ে রাখতে তৎপর হয়েছেন তিনি। যোগেশকে বলে দিয়েছেন, যেভাবে পারো রামগোলামকে একা করে ফেলো। অন্যদের দলে টানো। তোমার সুযোগ-সুবিধা বাড়িয়ে দেব।

সেই রাতে মাদারপট্টিতে রামগোলাম ঢুকতে ঢুকতে শুনল, 'মেমের মুখটা কখন খুলবে বাবা? মুখে ঠোঁটটা লাগাতে পারলে জীবন ধন্য হয়ে যাবে। দে না বাবা, লাল মুখটা আমার দিকে এগিয়ে!'

থমকে দাঁড়াল রামগোলাম। কণ্ঠটা চেনা চেনা লাগছে। আলো-আঁধারিতে মুখ না দেখলেও মদো শ্যামলকে চিনতে কষ্ট হলো না রামগোলামের। এত রাতে এখানে কী করছে সে? বলছেই বা কী?

যোগেশের কণ্ঠ ভেসে এলো, 'শালা, আগে দেশের মালে চুম্মা খা। মেমের

BanglaBook.org

মন উঠে নাই এখনো। আমাদের এই আসরের প্রধান চেদিলাল দাদা। মেমসাব তার ঠোঁটেই প্রথমে চুম্মা দেবে। কী বলো চেদিলালদা? পেয়েই এক্কেবারে চাটা শুরু কইরো না। জিহ্বা দিয়ে প্রথমে একটু লেহনটেহন করো। তারপর না হয় বুকে টাইন্যা লইও।'

রামগোলাম বুঝল, এখানে মদের আসর বসেছে। চেদিলালও উপস্থিত হয়েছে সেই আসরে। নিশ্চয়ই বিদেশি কোনো দারু জোগাড় করেছে তারা। নইলে মেমসাব-টেমসাব বলত না।

মদো শ্যামল জড়ানো গলায় বলে উঠল, 'শালা, আমাকে দিয়ে এদের দলে টেনেছ, আর এখন আমাকেই ফাঁকি! তা হবে না, মেমসাব প্রথমে আমাকে খুশি করবে, তারপর অন্যদের।' বলতে বলতে চাটাইয়ে ঢলে পড়ল সে।

যোগেশ বলল, 'শালার বেটা, বাংলা খেতে পারে না, মেমসাবের সাথে শুতে চায়।'

সবাই হো-হো, হা-হা করে হেসে উঠল। রামগোলাম সেখানে আর দাঁড়াল না। কার্তিকের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

রামগোলামের ডাক শুনে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এল কার্তিক। বিষণ্ন রামগোলামকে দেখে কার্তিক একটু থমকে গেল। জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার সর্দার? খারাপ কিছু?'

'না, এমনিতে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।'

'এমনি এমনি তুমি আসোনি। কোনোদিনই তো আসোনি আমার ঘরে। নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে।'

রামগোলাম কার্তিকের কথার কোনো জবাব দেয় না। ম্লান চোখে কার্তিকের দিকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। একটু যেন ইতস্তত ভাব তার চোখেমুখে।

কার্তিক বলে, 'এসো সর্দার, ঘরে এসো। বসো।'

রামগোলাম হঠাৎ হা-হা করে হেসে ওঠে। বলে, 'আমাকে যে ঘরে ডাকছ, বসাবে কোথায়? মেথরদের তো একটাই ঘর!' রামগোলামের শেষের কথায় শ্লেষ। নিজেকে দমন করে করুণ কণ্ঠে রামগোলাম আবার বলে, 'ঘরে বউ-বাচ্চারা ঘুমাচ্ছে। তাদের কষ্ট দিয়ো না। চলো, বাইরে কোথাও বসি।'

কার্তিক দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, 'তা-ই চলো। রাস্তার দিকে চলো। কোথাও বসার জায়গা পেয়ে যাব।'

পট্টি থেকে বেরিয়ে আসার সময় রামগোলাম আর কার্তিক দেখল—অধিকাংশ মদতি চাটাইয়ে লুটিয়ে পড়েছে। দু-একজন যা-ও জেগে আছে, তাদের মুখে অজস্র গালিগালাজ। মদের আসর পেরিয়ে ওরা রাস্তায় পৌঁছাল। রাস্তায় মানুষের

BanglaBook.org

চলাচল কমে গেছে; মাঝেমধ্যে দু-একটা গাড়ি এদিক থেকে ওদিকে বা ওদিক থেকে এগিয়ে ভোঁ ভোঁ করে চলে যাচ্ছে। রাস্তার পাশে প্রশস্ত একটা ফুটপাত বেছে নিয়ে দুজনে মুখোমুখি বসল।

রামগোলাম বলল, 'আসবার সময় মদের আসর খেয়াল করেছ তুমি। কিন্তু তুমি কি জানো, ওই আসরে কে কে আছে?'

'না তো, জানি না। কোনো ঘটনা আছে নাকি?' কিছুটা বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল কার্তিক। মদের আড্ডা মেথরপট্টিগুলোতে হরহামেশা লেগে আছে। হরিজনদের রাগের জায়গা মদের আসর, অনুরাগের জায়গাও। হরিজনদের অধিকাংশেরই ভাত না খেলে চলে, কিন্তু দারু তাদের খেতেই হয়। তাই মদের আসর পট্টির নিত্যনৈমিত্তিক চিত্র। ব্যাপারটি হরিজনদের দৈনন্দিনতার সঙ্গে মিশে গেছে। নিত্যদিনের চিত্র বলে বৈচিত্র্যহীন। বৈচিত্র্যহীন চিত্রের প্রতি মনোযোগী না হওয়া স্বাভাবিক। তাই মদের আসর পেরিয়ে আসার সময় কার্তিক খুব ভালো করে ওদিকে তাকায়নি। কিন্তু সর্দারের কথা শুনে কার্তিকের মনে হলো, নিশ্চয়ই ওই আসরের কোনো মাহাত্ম্য আছে, নইলে কেন সর্দার তার কাছে আসরের প্রসঙ্গ তোলে?

রামগোলাম বলে, 'ওই আসরের মধ্যমণি আমাদের চেদিলাল। মদো শ্যামলও আছে ওখানে। আয়োজন করেছে কে জানো? যোগেশ। বড় সাহেবের পা-চাটা ঝাউতলার মুখ্য যোগেশ।'

'কী ব্যাপার, বলো তো সর্দার? আমি তো ষড়যন্ত্রের আভাস পাচ্ছি।' কার্তিক বলে।

'আমারও একই অনুমান। ওই দিন তোমাকে বের করে দিলেন বড় সাহেব। কৌশলে আমাকে জব্দ করলেন। হরিজনদের মন্দিরের মোহে জড়ালেন। আন্দাজ করছি, দু-চারজনকে হাতে মুঠোয় ভরে ফেলেছেন তিনি। প্রমাণ—চেদিলাল। দারু এবং ধর্মের ফাঁদে ফেলে হরিজনদের বোবা বানিয়ে ছেড়েছেন তিনি। এই ফাঁকে কসাইখানা তৈরি হয়ে যাবে। আমাদের সব যাবে, সবকিছু হারাব আমরা।'

'এভাবে তো ভাবিনি!' বিস্মিত কার্তিক বলল।

রামগোলাম বলল, 'শুধু তা-ই না, আমাকেও হরিজনদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়ার পাঁয়তারা করছেন বড় সাহেব।'

'কসাইখানা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে জিত হলো বড় সাহেবের। এই জিতের পর তিনি আরও বড় কিছুতে হাত দেবেন।'

'মানে—?'

'মানে চাকরির ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্ত কার্যকর করবেন এবার।' কার্তিক বলে।

BanglaBook.org

রামগোলাম কিছুক্ষণ চুপ মেরে থাকে। গভীরভাবে কী যেন ভাবে। তারপর ধীরে ধীরে বলে, 'তুমি ঠিকই বলেছ কার্তিক। হরিজন-সমাজের কিছু মীরজাফর বড় সাহেবের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। এই হাত মেলানোর সুযোগ নিয়ে কসাইখানার পর চাকরির ব্যাপারটিতে হাত দেবেন বড় সাহেব। একবার যদি এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করে ফেলতে পারেন, তাহলে তা করপোরেশনের আইনে পরিণত হবে। তখন আমরা জান দিয়েও এই আইন রদ করতে পারব না। সুইপারের চাকরিতে সবাই ঢোকার একবার সুযোগ পেয়ে গেলে, ভিখারির জাতে পরিণত হব আমরা।'

'এখন কী করবে তুমি সর্দার? মুখ্যদের অনেকে মদে বিকিয়ে গেছে। সাধারণ হরিজনদের ধর্মে পেয়েছে। এ অবস্থায় আমরা কী করতে পারি?' কার্তিক বলে।

ডান হাতের বুড়ো আঙুলের নখ দাঁত দিয়ে কিছুক্ষণ কামড়াল রামগোলাম। তারপর থু থু করে সামনের রাস্তায় থুতু ফেলল। পরে বলল, 'অভিমান করে এদের কাছ থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখলে ভুল হবে। মন্দিরের কাজ প্রায় শেষ। নতুন করে সাজানো মন্দির উদ্‌বোধনের নাম করে আরও কিছু একটা করাবেন বড় সাহেব। তাঁকে আর সুযোগ দেয়া যাবে না।'

'তুমি কী করতে চাও সর্দার?' কার্তিক জিজ্ঞেস করে।

রামগোলাম বলে, 'প্রতিবছর তো আমরা মহোৎসব করি। অষ্টপ্রহর কীর্তন হয়। সঙ্গে সঙ্গে ধর্মসভা। মহোৎসবের নির্ধারিত দিন সামনের মাসের সাত তারিখ। পরশু সন্ধ্যায় সবাইকে একত্র করো। মহোৎসবের সঙ্গে সঙ্গে মন্দির উদ্বোধনের ব্যাপারটিও সেরে ফেলব। বড় সাহেব টেক্কা দেয়ার সুযোগ পাবেন না। মহোৎসবের কারণে আমরা সবাই কাছাকাছি আসব। আমাদের ভুল বোঝাবুঝি ভাঙবে।'

কার্তিক চোখ বড় বড় করে বলল, 'ঠিক বলেছ তুমি সর্দার। খুবই বুদ্ধির কথা বলেছ। পরশু মন্দির-চত্বরে আমি চার পট্টির সকলকে উপস্থিত থাকার জন্য খবর দিচ্ছি। বলব, সর্দার তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে চায়।'

'ঠিক আছে। উঠি এবার।' উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে রামগোলাম আবার বলল, 'মনটা বড় অস্থির হয়ে গিয়েছিল। শান্তি পাচ্ছিলাম না কোথাও। তোমার সঙ্গে কথা বলে মনের শক্তি ফিরে এল।'

কার্তিক দৃঢ় কণ্ঠে বলল, 'সর্দার, আমি তোমার সঙ্গে আছি। বিশ্বাস রেখো আমার ওপর।'

BanglaBook.org

আঠারো

সে সন্ধের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, হরিজনরা এসেছে রতন চক্রবর্তীর বাড়িতে। ঘরের ভেতর ঢুকবার অনুমতি তারা পায়নি। রতনবাবুদের পৈতৃক বাড়ি এটি। ইটের দেয়াল, টিনের ছাউনি। অনেকগুলো কামরা এ বাড়ির। মাটির উঠোন। উঠানের তিন দিকে সীমানাপ্রাচীর ঘেঁষে আম-কাঁঠাল-নারকেলগাছ। পুরোনো একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ গেটের পাশে দাঁড়িয়ে যুগ যুগ ধরে ফুল ফুটিয়ে যাচ্ছে।

হরিজনদের উপস্থিতির কথা কমলার মা ভেতরে গিয়ে জানালে ধুতি পরা রতন চক্রবর্তী খালি গায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। দুধে-আলতা রং তাঁর। দীর্ঘদেহী। উন্নত নাসা। কাঁচা-পাকা লম্বা চুল পেছন দিকে আঁচড়ানো। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। দিব্যকান্তি চেহারা। কাঁধ ছাড়িয়ে কোমর পর্যন্ত নামা ধবধবে সাদা পৈতা রতন চক্রবর্তী মশাইয়ের ব্রাহ্মণত্বকে সগৌরবে ঘোষণা করছে। একটা কলেজের অধ্যাপক তিনি, ইংরেজির। উচ্চারণে, উদাহরণে আর উপস্থাপনে অনন্য তিনি। সুবক্তা হিসেবে তাঁর নাম শ্রেণীকক্ষ ছাড়িয়ে হিন্দু-ধর্মসভা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। চট্টগ্রামের হিন্দু ধর্মসভার তিনি একজন অপরিহার্য বক্তা। যে সভায় রতন চক্রবর্তী বক্তৃতা দেন, সেই সভা মর্যাদা আর মাহাত্ম্যে গরীয়ান হয়ে ওঠে। আত্মশুদ্ধি আর সমাজ-মানুষদের ধর্মমুখী করার জন্য শহরের নানা এলাকায় এবং গ্রামেগঞ্জে ধর্মসভার আয়োজন করে হিন্দুরা। সে সভা আলোকিত হয়ে ওঠে, যে সভার মঞ্চে রতন চক্রবর্তী উপস্থিত থাকেন। মনে অনেক দ্বিধা নিয়ে হরিজনপল্লির সর্দার-মুখ্যরা আজ রতন চক্রবর্তীর উঠোনে উপস্থিত হয়েছে। যদি চক্রবর্তী মশাইকে ফিরিঙ্গিবাজার মেথরপট্টিতে বক্তৃতা দিতে রাজি করানো যায়, তাহলে হরিজনদের জীবন পবিত্রতায় ভরে উঠবে। তাঁর উপস্থিতিতে হরিজনপল্লির মানুষরা ধর্মানন্দে ভাসবে; তাদের হীন জীবনে পবিত্র আলোর উদ্ভাসন ঘটবে।

উপুড় হয়ে প্রণাম করে করজোড়ে সর্দার বলল, 'ঠাকুর, আমরা হরিজনপল্লি থেকে এসেছি, আপনার পদধূলি নেয়ার জন্য।'

BanglaBook.org

স্মিত মুখে চক্রবর্তী মশাই রামগোলামের দিকে তাকালেন। তারপর চোখ ফেরালেন পাশে দাঁড়ানো চেদিলাল, কার্তিক, চমনলাল, মনুলাল ও অন্যদের দিকে। শান্তকণ্ঠে বললেন, 'কী জন্য এসেছ, বলো।'

চেদিলাল গলায় গামছা জড়িয়ে বিনীত কণ্ঠে বলল, 'আমাদের পট্টিতে ধর্মসভা হবে ঠাকুর। আপনি যদি আমাদের সভায় আসেন...।'

রামগোলাম চেদিলালের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে গুছিয়ে বলল, 'প্রতিবছরের মতো এ বছরও ফিরিঙ্গিবাজার পট্টিতে নাম-সংকীর্তন ও ধর্মসভা হবে। চার পট্টিতে হরিজনরা মিলে এই মহোৎসবের আয়োজন করে। আপনার মতো মহান পুরুষ কখনো এর আগে আমাদের ধর্মসভায় বক্তৃতা দেননি। আমরা আপনার চরণধূলি পেতে চাই ঠাকুর। মানুষরা বলে—আমরা নাকি ছোটজাত; গু-মুত-আবর্জনা টানি আমরা। এ জন্য সবাই ঘৃণা করে আমাদেরকে। আপনি গেলে সেই ঘৃণার প্রতিবাদ হবে। আমরা ধন্য হব।'

'তুমি তো দেখি বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পারো। কী নাম তোমার?' চক্রবর্তী মশাই জিজ্ঞেস করেন।

রামগোলাম উত্তর দেয়ার আগে কার্তিক বলে ওঠে, 'রামগোলাম ঠাকুর, ও আমাদের সর্দার রামগোলাম। ম্যাট্রিক পাস।'

রতন চক্রবর্তী মুগ্ধ দৃষ্টিতে রামগোলামের দিকে তাকান। তারপর বলেন, 'হরিজনপল্লিতে আমি কখনো যাইনি। তারপরও তোমাদের ধর্মানুষ্ঠানের কথা শুনে আমার ভালো লাগল। ঠিক আছে, আমি যাব তোমাদের ধর্মসভায়। ওই দিন আমাকে কেউ এসে নিয়ে যেয়ো।'

চমনলাল পাশ থেকে বলল, 'ঠাকুর, ওই দিন আমাদের পট্টিতে মহাপ্রসাদ হবে। আপনি মহাপ্রসাদ গ্রহণ করলে আমরা খুব খুশি হব।'

চমকে চমনলালের দিকে ফিরলেন রতন চক্রবর্তী। চোখের রং যেন একটু পাল্টে গেল তাঁর! ক্রুদ্ধকণ্ঠে কী যেন বলতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিলেন তিনি। তারপর কৃত্রিম মমতা ভরা কণ্ঠে বললেন, 'সে দেখা যাবে তখন। এখন তোমরা আসো। আমার আবার কলেজের সময় হয়ে এল।'

'রতন, ও-রতন, এদিকে এসো।' ওই সময় ভেতর থেকে রতন চক্রবর্তীর বৃদ্ধ মা ডেকে উঠলেন।

'আসি মা। তাহলে তোমরা আসো।' বলতে বলতে রতন চক্রবর্তী ঘরের দিকে রওনা দিলেন।

রতন চক্রবর্তীর মা বিন্দুবাসিনী। সত্তর পেরুনো বয়স। বিধবা। ছোট করে চুল ছাঁটা, চওড়া পাড়ের সাদা ধুতি পরেন তিনি। পবিত্র পবিত্র চেহারা। একটু

BanglaBook.org

কুঁজো হয়ে হাঁটেন। প্রচণ্ড শুচিবায়ুগ্রস্ত। পরিবারের মানুষজন ছাড়া অন্যদের স্পর্শ এড়িয়ে চলেন তিনি। বহু বছরের কাজের মহিলা কমলার মা, তারও বিন্দুবাসিনীর কাপড়চোপড় স্পর্শ করার অধিকার নেই। অতিথিরা চলে যাওয়ার পর, যেখানে যেখানে তাদের ছোঁয়া লেগেছে, সেখানে সেখানে তুলসীজলে-ভেজা ন্যাকড়া দিয়ে ঘষে ঘষে মোছান। তিনি যে ব্রাহ্মণকন্যা, কখনো ভোলেন না। ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য জাতের মানুষরা তাঁর চোখে হীন জাত, মেথররা তো হিসেবের বাইরে। সেই মেথরদের ধর্মসভায় তাঁর ছেলে বক্তৃতা দিতে যাবে! ভাবতেই পারেন না তিনি! দরজায় দাঁড়িয়ে ছেলের কথা শুনছিলেন তিনি। ছেলের সম্মতির কথা শুনে বিন্দুবাসিনী রেগে কাঁই। রতন চক্রবর্তী ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় চিৎকার করে উঠলেন, 'যত বয়স বাড়ছে, তত তোমার হুঁশ-জ্ঞান চলে যাচ্ছে বাছা?'

'কেন মা? কী হয়েছে?' রতন চক্রবর্তী মাকে দেবীজ্ঞানে সম্মান করেন। মায়ের মনে কষ্ট দেয়ার লোক নন তিনি। তাই মায়ের কথায় ভড়কে গেলেন চক্রবর্তী মশাই।

'তুমি শিক্ষিত, হিন্দু সমাজে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াও, সেটা ঠিক আছে। ওরা উঁচু বংশ, তোমার কথার মাহাত্ম্য ওরা বোঝে। কিন্তু আজকে তুমি এটা কী করলে, মেথরদের পট্টিতে গিয়ে বক্তৃতা দিতে রাজি হলে?' কাঁপা কাঁপা গলা থেকে রাগ ঝরে পড়ছে বিন্দুবাসিনীর।

মায়ের মনোচিত্র রতন চক্রবর্তীর জানা। জাতপাত নিয়ে মায়ের শুচিবাই আছে। মেথরপট্টিতে বক্তৃতা দিতে রাজি হওয়ায় মায়ের রেগে যাওয়া স্বাভাবিক। তাঁকে রাগানো যাবে না। তাই শান্ত কণ্ঠে মাকে উদ্দেশ্য করে চক্রবর্তী মশাই বললেন, 'দেখো মা, তোমার আশীর্বাদে ধর্মীয় বক্তা হিসেবে আমার নাম সমস্ত হিন্দুসমাজে ছড়িয়ে পড়েছে। আমার খ্যাতির কথা শুনে হরিজনরাও উদ্যোগী হয়েছে তাদের সভায় আমাকে নেয়ার জন্য। ব্রাহ্মণ হিসেবে আমরা তো উদার জাতি মা, তুমি কী বলো? যদি তা-ই হয়, তবে ওদের সভায় বক্তৃতা দিলে ক্ষতি কী?' তারপর একটু থেমে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'ওরাও তো মানুষ মা!'

'না, ওরা মানুষ না, ওরা মেথর। গু-মুত টানতে টানতে ওদের জীবন চলে।' অন্তরের প্রকট ঘৃণাটা বিন্দুবাসিনীর কথায় প্রকাশ পেল।

রতন চক্রবর্তীর ভেতরটা থরথর করে কেঁপে উঠল। হরিজনদের জন্য এত ঘৃণা মায়ের অন্তরে জমা আছে! প্রতিবাদ করতে চাইলেন তিনি। কিন্তু নিজেকে অনেক কষ্টে দমন করে মায়ের চোখে চোখ রেখে বিনয়ের সুরে বললেন, 'ঠিক

BanglaBook.org

আছে মা, ভবিষ্যতে আর হবে না। আমি ওদের কথা দিয়েছি। এবারের মতো যেতে দাও।'

বিন্দুবাসিনী বিরক্ত কণ্ঠে বললেন, 'তুমি যা ভালো বোঝ, করো।' তারপর গলা উঁচু করে বললেন, 'কই রে কমলার মা, স্নানঘরে গরম জল দিলি?'

ভেতর থেকে কমলার মায়ের কণ্ঠ শোনা গেল, 'যাই মা।'

চার পট্টির সবাই মিলে মহোৎসবের আয়োজনে লেগে গেছে। ওই সন্ধের সভায় বিচ্ছিন্ন হরিজনরা অনেক কাছাকাছি চলে এল। মন্দির নিয়ে, কসাইখানা নিয়ে, এমনকি সবার জন্য সুইপারের চাকরি উন্মুক্ত করে দেয়ার সিদ্ধান্ত বিষয়েও অনেক কথা হলো। কসাইখানাটি যে এখানকার মেথরদের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলবে—সেটা মানতে নারাজ অধিকাংশ হরিজন। বড় সাহেবের ওপর অগাধ বিশ্বাস তাদের। যে লোক অন্য ধর্মের উপাসনালয়ের জন্য অকৃপণভাবে খরচ করেন, তাঁকে অবিশ্বাস করা তো পাপ। সময়ই তাদের উচিত শিক্ষা দেবে—এ ভেবে রামগোলাম তর্কে লিপ্ত কার্তিককে থামিয়ে দিয়েছে। চাকরির ব্যাপারে করপোরেশনের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করার ব্যাপারে সবাই একমত হয়েছে। যোগেশ-মনুলাল কিছু একটা বলতে চাইলে সবাই হইচই করে চুপ করিয়ে দিয়েছে তাদের। মহোৎসবের ব্যাপারে সমান উৎসাহ সবার। চেদিলাল বলেছে, 'উৎসবের আয়োজন করার দায়িত্ব সব সময় সর্দারই পালন করে এসেছে। সর্দার রামগোলাম সেই দায়িত্ব নেবে। আমরা সবাই সর্দারের সঙ্গে আছি।'

রামগোলাম বলল, 'মন্দিরের কাজ শেষ। মহোৎসবের সময় নতুন মন্দিরের উদ্‌বোধনের কাজটাও হয়ে যাক, আপনারা কী বলেন?'

'আমি তো কোথাও আপত্তি দেখছি না।' রামলাল বলল।

'তবে এই উদ্‌বোধনের প্রধান অতিথি করতে হবে করপোরেশনের বড় সাহেবকে।' তাড়াতাড়ি বলে উঠল যোগেশ।

কার্তিক বলল, 'চামচার বাচ্চার চামচাগিরি গেল না।'

রামগোলাম সমবেত মানুষের দিকে তাকাল। দেখল—অধিকাংশ মানুষের মধ্যে যোগেশের কথার সমর্থন আছে। এখন স্রোতের বিপরীতে সিদ্ধান্ত নিলে বোকামি হবে। রামগোলাম বলল, 'তুমি থামো কার্তিক। যোগেশ মুখ্য ঠিক কথা বলেছে। যে সাহেবের দানে আমাদের মন্দিরের সৌন্দর্য বাড়ল, তিনি প্রধান অতিথি হলে আপত্তি কোথায়? ধর্মসভার দিন বড় সাহেব মন্দির উদ্‌বোধনের বক্তৃতা দেবেন—এটাই ঠিক হলো।' কার্তিক ছাড়া সবাই আনন্দধ্বনি দিয়ে উঠল।

BanglaBook.org

'ও হ্যাঁ, আরেকটা কথা, বিখ্যাত ধর্মীয় বক্তা রতন চক্রবর্তীকে আনবার চেষ্টা করব আমরা।' রামগোলাম বলল।

'খুব ভালো হবে, খুব ভালো হবে।' সবাই জয়ধ্বনি দিল, 'জয় শ্রীশ্রী মা কালীর জয়।'

সভার শেষে রামগোলাম কার্তিকের সঙ্গে একান্ত দীর্ঘক্ষণ কথা বলল। যাওয়ার সময় কার্তিক বলল, 'ঠিক আছে। ওভাবেই হবে।'

ফিরিঙ্গিবাজার পট্টির গলির মুখে আবুল হোসেনের চা-দোকান। বহুদিনের পুরোনো। এ দোকানে হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান কাস্টমাররা ভেতরে বসে চা-নাশতা খায়। দোকানের ভেতরে তকতকে ঝকঝকে। টেবিলবয়দের প্রতি আবুল হোসেনের কড়া নির্দেশ—টেবিলে ময়লা থাকা চলবে না। কাপ-প্লেট-গ্লাস অপরিষ্কার হলে খবর আছে। টেবিলে, নাশতায় মাছিও বসতে পারবে না।

তবে মেথর কাস্টমারদেরও আবুল হোসেন বঞ্চিত করে না। তাদের কাছে চা-নাশতা বেচে। তবে মেথরদের ভেতরে ঢোকার অধিকার নেই। চা-নাশতা নেয়ার এবং দাম দেয়ার আলাদা কাউন্টার মেথরদের জন্য। আবুল হোসেনের ক্যাশ-টেবিলের ডান পাশে রাস্তার দিকে একটা গোল ফোকর, ওপর দিকটা মোটা তারে ঘেরা। ওই ফোকর দিয়ে হাত ঢুকিয়ে চা-নাশতার দাম চুকিয়ে টিকিট নেয় মেথররা। পাশে চা-নাশতা নেয়ার ব্যবস্থা। সিনেমার কাউন্টারের মতো। ওখানেও ফাঁকফোকরের ব্যবস্থা আছে। টিকিট দেখিয়ে চা-নাশতা নেয় হরিজনরা। দেয়ার দায়িত্বে আছে কোরবান আলী। মধ্য বয়স তার, কিন্তু শরীরে যৌবনের কিলিবিলি। হরিজনরা মগ এগিয়ে দেয় কাউন্টারের ভেতরে, ওপর থেকে চা ঢালে কোরবান। পরোটা, নানরুটি দেয়ার সময় যৌবনবতী মেথরানিদের পেলব হাতটা ছুঁয়ে দেয় কোরবান। সেই ছোঁয়ার ভাষা আছে। সোহিনীরা বুঝতে পারে সেটা। বলে, 'ওই কোরবাইন্যা, যৌবন জাগছে তোর কলিজায়? টাট্টি ঢেলে দেব মুখে। হারামজাদা কাঁহিকা।'

আজ আবুল হোসেনের চা-দোকানে হরিজনদের ভিড়। ছুটির দিন আজ। কিন্তু আরামে-আয়েশে সময় কাটানোর দিন নয়। আজ মহোৎসবের দিন। গত রাত থেকে নাম-সংকীর্তন শুরু হয়ে গেছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া আর চাঁদপুর থেকে দুটো কীর্তনিয়া দল এসেছে, মহেশখালীর গোবিন্দবাবুর দল তো আছেই। চার ঘণ্টা পালা করে গাইছে দলগুলো। আজ বিকেলে মন্দির উদ্বোধন আর ধর্মসভা। করপোরেশনের বড় সাহেব আবদুস সালাম অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হতে সানন্দে রাজি হয়েছেন। ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে আসবেন তিনি।

BanglaBook.org

জমাদার হারাধনবাবুও আমন্ত্রিত হয়েছেন। এই আনন্দে মেথরপট্টির মানুষ আজ দিশেহারা। আজ নারীরা রান্নাবাটি ছেড়ে দিয়েছে বললে চলে। ঘরে নাশতা তৈরি করতে রাজি নয় তারা আজ। তাই আবুল হোসেনের চা-দোকানে এত ভিড়। কেউ কেউ চা-নাশতা নিয়ে দোকানের পাশের ফুটপাতে বসে গেছে, দোকানের বাইরে পানি খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। কেউ আবার চা-নাশতা নিয়ে ঘরের দিকে যাচ্ছে।

বিকেলের মধ্যে মঞ্চ তৈরি হয়ে গেছে। মাইক্রোফোন টেস্ট করা হচ্ছে বারবার। মঞ্চ ও মাইকের দায়িত্ব পেয়েছে কার্তিক। সামনে সারি সারি প্লাস্টিকের চেয়ার। ধীরে ধীরে চেয়ারগুলো ভরে উঠছে। চার পট্টি থেকে আবালবৃদ্ধবনিতার সমাগম হচ্ছে আজকের মহোৎসবে। চারদিক গমগম করছে। কোলাহল কলরব। নারী পুরুষে, পুরুষে নারীতে কুশলাদি বিনিময় চলছে। সর্দার রামগোলাম আর মুখ্যরা ধোপ-দুরস্ত পোশাকে সজ্জিত। অতিথি অভ্যাগতদের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত ওরা।

বড় সাহেব এলেন, সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ার রাকিবউদ্দীন; পেছনে হারাধনবাবু। স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারাও আমন্ত্রিত। কুতুবুদ্দীন ছাড়া কাউকে দেখা যাচ্ছে না। চেদিলাল চার-পাঁচজনকে সঙ্গে নিয়ে রতন চক্রবর্তীকে আনতে গেছে। চক্রবর্তী মশাই এলেই সভার কাজ শুরু হবে। সামনের সারির গদিওয়ালা চেয়ারে বসে বড় সাহেব উসখুস করছেন আর বারবার ঘড়ি দেখছেন। অবশেষে রতন চক্রবর্তী এলেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনের দায়িত্ব পালন করছে কার্তিক। ঘোষণানুসারে আবদুস ছালাম, রাকিবউদ্দীন আর রতন চক্রবর্তী একে একে মঞ্চে উঠলেন। অনুষ্ঠানের দুটো অংশ। প্রথমে মন্দির উদ্বোধন, শেষে ধর্মসভা। বড় সাহেবের হাতে সময় কম। ছোট মেয়েটাকে অসুস্থ দেখে এসেছেন। তার বড় আদরের মেয়ে এটি। মঞ্চে বসেও ছোট মেয়েটির জ্বরাক্রান্ত মুখ মনে পড়ছে বারবার। ইঞ্জিনিয়ারের বক্তৃতার পর বড় সাহেব বক্তৃতা দিতে দাঁড়ালেন। সামনে উৎসুক হরিজনরা।

'প্রিয় হরিজন ভাই ও বোনেরা' বলে বক্তৃতা শুরু করতে চাইলেন আবদুস ছালাম। কিন্তু তাঁর উচ্চারিত শব্দগুলো এমনভাবে প্রতিধ্বনিত হলো, যেন আশি বছরের কোনো বৃদ্ধ কাঁপা কাঁপা গলায় আকুতি জানাচ্ছে। বড় সাহেব মাইক্রোফোনে জোরে ফুঁ দিলেন। সেই ফুঁ মাইকে বিচিত্র শব্দতরঙ্গ তুলল। তারপর বড় করে গলা খাঁকারি দিলেন। বড় সাহেবের গলা খাঁকারি আর্তনাদ হয়ে মাইকে উচ্চারিত হলো। জনতা আর নিজেদের ভেতরে হাসি দমন করে রাখতে পারল না। প্রথমে শিশু-কিশোররা, পরে তরুণীরা এবং শেষে বয়স্করা

BanglaBook.org

উচ্চ স্বরে হেসে উঠল। লজ্জায় বড় সাহেবের মুখ লাল হয়ে গেল। কর্কশ চোখে তিনি রামগোলামের দিকে তাকালেন। কার্তিক মাইকম্যানের ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। মাইকম্যান অনেক কসরত করেও মাইক্রোফোন ঠিক করতে পারল না। হাসি আর কলরবে স্থানটি আলুলায়িত হয়ে গেল। এ সময় ইঞ্জিনিয়ার বড় সাহেবের কানে কানে কী যেন বললেন। বড় সাহেব একদিকে মাইক্রোফোন ঠেলে দিলেন। মুখে, গলায় জবজবে ঘাম নিয়ে উচ্চকণ্ঠে তিনি বললেন, 'মাইকের দরকার নেই। খালি গলায় বক্তৃতা দেব।' তারপর দু-এক মিনিট এলোমেলো কিছু কথা বললেন। যা বলবেন বলে ঠিক করে এসেছিলেন, রাগের মাথায় সব ভুলে গেলেন। শেষে 'আমি নতুন মন্দিরের উদ্বোধন ঘোষণা করছি' বলে মঞ্চ থেকে নেমে এলেন। দ্রুত গাড়িতে উঠলেন। সঙ্গে গেলেন রাকিবউদ্দীন।

কার্তিক আর রামগোলামের মধ্যে চোখাচোখি হলো। বড় সাহেব চলে যাওয়ার মিনিট পাঁচেকের মধ্যে মাইক ঠিক হয়ে গেল। ধর্মানুষ্ঠান শুরু হয়ে গেল। ঘণ্টা দেড়েক ধরে রতন চক্রবর্তী সমবেত হরিজনদের একটা ঘোরের মধ্যে রাখলেন। বর্ণপ্রথা যে মানুষের তৈরি—নানা শাস্ত্র পুরাণ থেকে উদাহরণ দিয়ে দিয়ে প্রমাণ করলেন। *মনুসংহিতায়* মানুষের যে ভেদাভেদ রচিত হয়েছে, তা যে কিছু স্বার্থবাদী সামন্তের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে লেখা, তা-ও প্রমাণসহ ব্যাখ্যা করলেন তিনি। মানুষের সুস্থ জীবন বিকাশের ক্ষেত্রে নাপিত, জেলে, মেথর, ডোম, হাঁড়ি, ব্যাধ—এসব তথাকথিত ছোটলোক যে কী বিপুল পরিমাণে অবদান রাখে, তা সমবেত হরিজনদের বোঝালেন রতন চক্রবর্তী। শেষে বললেন, 'সবার ওপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই। আমি যেমন মানুষ, আপনারাও মানুষ। আমি ব্রাহ্মণ হয়ে যদি সত্য হই, তাহলে আপনারা হরিজন হয়েও সত্য। আরেকটা কথা বলি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র—এসব সুযোগসন্ধানী মানুষের সৃষ্টি। আমি ঘৃণা করি, আমি থুতু দিই সেই সব জাতপাতে। আপনাদের সবার মঙ্গল হোক।'

রতন চক্রবর্তী মাইক্রোফোন ছেড়ে চেয়ারে গিয়ে বসলেন। স্তব্ধ সভাস্থল। বিহ্বল হরিজন-সমাজ। ব্রাহ্মণ-হরিজনে পার্থক্য নেই—এ কথা বলে গেলেন একজন ব্রাহ্মণ। তাহলে তারা হীন নয়, অস্পৃশ্য নয়, ঘৃণ্য নয়? কী করবে বুঝে উঠতে পারছিল না সমবেত হরিজনরা। সভায় দ্বিতীয় সারিতে বসা কুতুবুদ্দীন হঠাৎ হাততালি দিয়ে উঠলেন। তাঁর দেখাদেখি শত শত হরিজন হাততালি দিতে শুরু করল। পেছন থেকে কে চিৎকার করে উঠল, 'বোল হরিবোল।'

ট্যাক্সিতে ওঠার আগে হরিজনরা রতন চক্রবর্তীকে অনেক অনুনয়-বিনয়

BanglaBook.org

করল একটু মহাপ্রসাদ গ্রহণ করার জন্য। তিনি বললেন, 'দেখো, গত দুদিন ধরে আমার পেট ভীষণ খারাপ। তোমরা কষ্ট পাবে বলে এসেছি। অন্যখানে হলে এ অবস্থায় আমি যেতাম না। তোমাদের আমি ভালোবাসি। সামনের বার ভাতই খাব আমি তোমাদের সঙ্গে।' গলির মুখে আঁধার ছিল। কথাগুলো যে চক্রবর্তী মশাই খুব বিরক্তির সঙ্গে বললেন, তা হরিজনরা বুঝতে পারল না। সানন্দে সশ্রদ্ধায় তারা রতন চক্রবর্তীকে ট্যাক্সিতে তুলে দিল।

বাড়িতে পৌঁছতে পৌঁছতে প্রায় একটা বেজে গেল রতন চক্রবর্তীর। এত রাতে ড্রয়িংরুমে আলো জ্বলতে দেখে একটু বিচলিত হলেন তিনি। ধর্মসভা থেকে আসতে আসতে রাত তো হয়ই। কলবেল টিপলে কমলার মা আলো জ্বালিয়ে দরজা খুলে দেয়। স্ত্রী বাতের রোগী। তিনি একবার শুয়ে পড়লে বিছানা থেকে ওঠেন না। মা তো তাড়াতাড়ি খেয়ে ঘুমাতে যান। আজ কী হলো? ঘরে বাতি জ্বলছে! শঙ্কিত মনে তিনি কলবেল টিপলেন। বিন্দুবাসিনী ঝট করে দরজা খুললেন। চৌকাঠে ডান হাতটি রেখে বললেন, 'যে অবস্থায় আছ, ঠিক ওই অবস্থায় স্নানঘরে ঢোকো। ভেতরে ধোয়া জামাকাপড় দেয়া আছে। স্নান করে ওই জামাকাপড় পরে বের হবে। জুতো জোড়াটিও স্নানঘরে থাকবে। সকালে কমলার মা ওসব ধুয়ে-মুছে দেবে।'

চক্রবর্তী স্তম্ভিত চোখে মায়ের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন।

তারপর তর্ক করা বৃথা ভেবে মাথা নিচু করে স্নানঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন। যেতে যেতে বিন্দুবাসিনীর কণ্ঠ শুনলেন, 'অজাত-কুজাতের পাড়া থেকে কাকে না কাকে ছুঁয়ে এসেছে—!'

একটা বিভোর আনন্দের মধ্যে হরিজনদের দিন কাটতে লাগল, রাত পোহাতে লাগল। কিন্তু এ আনন্দ বেশি দিন স্থায়ী হলো না। মন্দির উদ্বোধন অনুষ্ঠানের পরদিন আবদুস ছালাম কসাইখানার খোঁজখবর নিলেন। ইঞ্জিনিয়ার আর কন্ট্রাক্টরকে ডেকে পাঠালেন। কন্ট্রাক্টর জানালেন, 'কাজ প্রায় শেষের দিকে। আর দিন পনেরো লাগবে।'

আবদুস ছালাম ইঞ্জিনিয়ারকে জিজ্ঞেস করলেন, 'প্ল্যান মোতাবেক কসাইখানা তৈরি হচ্ছে তো?'

ইঞ্জিনিয়ার বললেন, 'একদম আপনার নির্দেশ মোতাবেক তৈরি হয়েছে স্যার।'

টাকা মেরে, ইঞ্জিনিয়ারকে ঘুষ দিয়ে, বড় সাহেবকে এক সেট দামি ফার্নিচার উপহার দিয়ে বাকি যা টাকা থাকল, তা-ই দিয়ে কসাইখানা তৈরি

BanglaBook.org

করল কন্ট্রাক্টর। কসাইখানার সামনে বিরাট এক চাতাল, ইট-সিমেন্টে বাঁধানো। রাস্তার দিকে ঢালু। বাগান-টাগান নেই। এখানে-ওখানে দু-চার-দশটা পাতাবাহারের টব। গেটে দারোয়ান। হাতে মোটা বেতের লাঠি। কসাইখানায় সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। হরিজনরা উঁকিঝুঁকি দিলে দারোয়ানের—হই হই হট।

এক সকালে ঘটা করে উদ্বোধন হলো কসাইখানার। বাহারি অনুষ্ঠান। ফুলে-ফেস্টুনে সয়লাব। মোটা কাপড়ের শামিয়ানার নিচে সারি সারি চেয়ার। শামিয়ানার নিচে বাঁশের খুঁটির সঙ্গে এবং চারদিকের দেয়ালে নানা লেখার পোস্টার-ফেস্টুন। দু-একটি লেখা এ রকম—স্বাস্থ্যই সম্পদ। জনগণের স্বাস্থ্য-সুরক্ষার জন্য কসাইখানা। যেখানে-সেখানে জবাই করা পশু খাবেন না। কসাইখানার গোশত খান। স্বাস্থ্যবান পশু জবাই করা হবে এই কসাইখানায়।

অনেক গণ্যমান্য লোকের উপস্থিতিতে কসাইখানাটি উদ্বোধনের অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হলো।

পরদিন ভোর-সকালে হরিজনরা দেখল—মন্দির ঘেঁষে যে নালাটি তাদের কলোনির গেইট পেরিয়ে বড় নালায় পড়েছে, তা দিয়ে গলগল করে পশুর রক্ত বয়ে যাচ্ছে। হাজার-লক্ষ মাছি সেই নালার ওপর ভন ভন করছে। কসাইখানার সামনের চাতালে ছাল-ছাড়ানো গরু-ছাগল-মহিষের দেহ। একদিকে শ খানেক পশুর মাথা। এগুলোর রক্ত চাতাল ছাড়িয়ে মূল রাস্তা পর্যন্ত গড়িয়েছে। গেটের বাইরে সারি সারি রিকশা-ভ্যান। ক্যাশিয়ারের কাছে দাম চুকালে রিকশা-ভ্যানে মাংস তোলা হবে।

বেলা হলে চাতালে ছড়ানো আর নালায় জড়ানো রক্ত শুকিয়ে এল। পেট-গুলানো দুর্গন্ধ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। পথচারীরা নাকে রুমাল চাপা দিয়ে কসাইখানা অতিক্রম করল। পশুর রক্ত-ভুঁড়ির দুর্গন্ধে হরিজনপল্লির বাতাস অসহনীয় হয়ে উঠল। ফিরিঙ্গিবাজারের হরিজনপল্লির স্বাভাবিক জীবন অস্থির, অসহ্য ও বিপন্ন হয়ে উঠল। অন্যান্য পট্টির মানুষের মন বিষণ্ণ ও বিপর্যস্ত হলো। সবাই যোগেশ, মনুলাল আর চেদিলালকে খুঁজতে লাগল। যোগেশ গা ঢাকা দিল। মনুলাল ও চেদিলাল গলায় গামছা জড়িয়ে হরিজন সভায় বলল, 'আমরা তো এ রকম ভাবিনি। বড় সাহেব বললেন—ফুলের বাগান হবে, বাইরে থেকে রক্ত-পুঁজের গন্ধ পাওয়া যাবে না। আমরা তা-ই বিশ্বাস করেছিলাম। শালা, আমাদের লোভ দেখাল, মন্দির টাইলসে বাঁধাই করে দেবে! ধর্মের নামে আমাদের কিনে নিল, শালা। বেইমান কাঁহিকা। আপনারা

BanglaBook.org

আমাদের মাফ করেন, না বুঝে বড় সাহেবের কথায় সায় দিয়েছিলাম। বেইমান, বড় সাহেবের বিরুদ্ধে আছি আমরা। আমাদের ধর্ম নিল, জাত নিল!' বলতে বলতে হু-হু করে কেঁদে উঠল ওরা।

রামগোলাম বলে উঠল, 'হরিজন-জাতের সঙ্গে তোমরা বেইমানি করেছ। আমার কথা শোনোনি। লোভে পড়েছ তোমরা। আজ দেখো, আমাদের কী হাল? ধীরে ধীরে আমাদের নানা অসুখ হবে। অকালে মরব আমরা।' তারপর রামগোলাম কিছুক্ষণ চুপ মেরে থাকল। হঠাৎ ভেতরের আর্তনাদ মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল তার, 'আমাকে আপনারা সর্দার করেছেন, কিন্তু সর্দারের মর্যাদা দেননি। ভেবেছেন—অল্প বয়স, ওর মধ্যে আর কতটুকুই বা দূরদর্শিতা থাকবে! কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছিলাম, আমাদের মস্ত বড় ক্ষতি হতে যাচ্ছে। একমাত্র কার্তিক ছাড়া আর সবাই আমাকে ভুল বুঝেছেন। কিন্তু বড় সাহেব আমাদের কত বড় ক্ষতি করল, ভেবে দেখেন।'

সামনে থেকে কে যেন হাহাকার করে উঠল, 'হায় হায় ঈশ্বর, আমাদের অনেক বড় সর্বনাশ হয়ে গেল! এখন থেকে প্রতিদিন আমাদেরকে পশুর রক্ত মাড়িয়ে যাওয়া-আসা করতে হবে। আমাদের সবকিছু শেষ হয়ে গেল ভগবান!'

'না, সবকিছু শেষ হয়ে যায়নি। শেষের আরও কিছু বাকি আছে। গতকালকে আমি অফিসের কেরানির কাছে খবর পেয়েছি, সামনের মাসের কোনো এক তারিখে অনেক সুইপার নেয়া হবে। এর মধ্যে আমাদের না জানিয়ে নানা সম্প্রদায়ের মানুষের কাছ থেকে দরখাস্তও জমা নেয়া হয়েছে।' কার্তিক বলল।

চমনলাল বলল, 'তা কী করে হয়? আমরা কিছুই জানলাম না! চুপকে চুপকে দরখাস্ত জমা নিল?'

কার্তিক গর্জে উঠল, 'জানবে কী করে? তোমরা তো তখন ধর্মের দারু খেয়ে ঝিমাচ্ছ। রাতদিন মন্দির নিয়ে পড়ে আছ হরিজনপল্লির সবাই। যেন মন্দিরে টাইলস লাগালে মেথররা এক রাতে ব্রাহ্মণ হয়ে যাবে। যেন হেঁটে হেঁটে স্বর্গে যাবে! এই ফাঁকে কেল্লা ফতে। ভিখারি হও এখন।'

মদো শ্যামল চিৎকার করে উঠল, 'তা হতে দেব না। মন্দিরের চেয়ে চাকরি বড়। চাকরিতে ভাগ বসাতে দেব না। জান দেব।'

রামগোলাম বলল :

'যব সাচ না মিলে তব ঝুট সহি,
যব হক না মিলে তব লুট সহি।

BanglaBook.org

সুইপারের চাকরির একমাত্র দাবিদার আমরা। আমাদের হক লুটে নিতে চাইছে আবদুস ছালাম। তা হতে দেয়া উচিত নয়, এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা উচিত। আপনারা কী বলেন?'

সভা থেকে আওয়াজ উঠল, 'জরুর জরুর।'

রামগোলাম চেদিলাল ও মনুলালের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তবে একটা অনুরোধ, আর বেইমানি নয়, এবার বেঁচে থাকার জন্য একতা দরকার। আমাদের মধ্য থেকে আর কোনো যোগেশ যাতে পয়দা না হয়।'

কার্তিক নিজেকে সামলে রাখতে পারল না। বলল, 'চুতিয়া যোগেশ লুকিয়ে পড়েছে। পেলে বেহেনচোদকে দেখে নেব আমি।'

'কার্তিক, মাথা গরমের সময় নয় এখন। ঠান্ডা মাথায় পরিকল্পনা করার সময়। এ সময় মাথা গরম করলে সব পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে। মার্থা গরমের সুযোগ নেবে বড় সাহেব। আমাদের মধ্যে আরেক যোগেশ সৃষ্টি করবে। আমরা একেবারে পথে বসব তখন।' রামগোলাম বলল।

চেদিলাল লজ্জিত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলল: 'বহুত হয়েছে। বড় সাহেবকে আর খেলতে দেব না? জাত নিয়েছে, এবার ভাত নেবে। তা হতে দেব না আমরা। আমরা স্ট্রাইক করব, আবর্জনা টানা বন্ধ করে দেব।'

মদো শ্যামল মাতাল কণ্ঠে বলল, 'এত দিনে একটা কাজের কথা বলেছ কাকা। তোমার সকল অপরাধ মাফ করে দিলাম, বড় সাহেবের পা-চেটো না আর।'

রামগোলাম বলল, 'তুমি থামো শ্যামল। যা হয়েছে, হয়েছে। তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেছে। আমাদের মধ্যে আর ভুল-বোঝাবুঝি নয়। আমরা সবাই এক। এক হয়ে আমরা আমাদের অধিকার আদায় করব।'

মনুলাল বলল, 'তোমার পরিকল্পনার কথা বলো সর্দার।'

রামগোলাম একটু চমকে মনুলালের দিকে তাকাল। তারপর শান্ত কণ্ঠে বলল, 'প্রথমে আমরা বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করব। তাকে বোঝাবার চেষ্টা করব—সুইপারের চাকরি শুধু আমাদের।'

'যদি না শুনে তোমার কথা, মানে আমাদের দাবির কথা?' বলল কার্তিক।

চোখ কুঁচকে কার্তিকের দিকে তাকাল রামগোলাম। দুজনের মধ্যে চোখে চোখে কী যেন কথা হলো। রামগোলাম বলল, 'তখন ঠিক করা যাবে পরে কী করব আমরা। ঠিক আছে।'

কার্তিক বলল, 'তাহলে সভা এখানে শেষ। যার যার ঘরে ফিরে যান আপনারা।'

BanglaBook.org

উনিশ

'তোমাদের তো আগে একবার বলেছি, স্বাধীন বাংলাদেশে একটা নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের জন্য নির্ধারিত কোনো চাকরি নেই। যেকোনো সম্প্রদায় যেকোনো চাকরির হকদার। মুচির কাজ শুধু রবিদাসরা করবে এমন নয়, শীল সম্প্রদায়ই শুধু চুল কাটবে তা-ও নয়; নানা হাসপাতালের মর্গে লাশ কাটার কাজ কি আজকাল শুধু ডোমরা করছে? না। খোঁজ নিয়ে দেখো, এসব পেশায় নানা সম্প্রদায়ের মানুষ ঢুকে গেছে। শক্তি-সামর্থ্য আর বিদ্যা থাকলে দেশের সকল মানুষ সকল ধরনের চাকরি পাওয়ার অধিকার রাখে। এ দেশে শুধু কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য কোনো বিশেষ পেশা নির্ধারিত থাকা উচিত নয়। এই করপোরেশনেও কোনো বৈষম্য থাকবে না। সুইপারের চাকরি বলো বা অফিসারের চাকরি—সব সম্প্রদায়ের মানুষ পাবে। তবে হ্যাঁ, উপযুক্ততা থাকতে হবে। তোমরাও বিএ, এমএ পাস করে এসো। তোমরাও পাবে অফিসারের চাকরি।' ভাষণের সুরে দীর্ঘক্ষণ কথা বলে থামলেন বড় সাহেব আবদুস ছালাম।

তাঁর পাশে বসা ইঞ্জিনিয়ার, প্রটোকল অফিসার, সিবিএ নেতা, লোকাল ওয়ার্ড কমিশনার, করপোরেশনের ডেপুটি ডাইরেক্টর। সামনে দাঁড়ানো সর্দার রামগোলাম, কার্তিক, চেদিলাল, চমনলাল, মদো শ্যামল, মনুলাল, রামপ্রসাদ, চার পট্টির অন্যান্য মুখ্য এবং বেশ কয়েকজন তরুণ। তাদের পাশে জমাদার হারাধনবাবু।

কার্তিক বলল, 'কিন্তু বিশেষ পেশার জন্য আমাদের পূর্বপুরুষদের আনা হয়েছিল। গু-মুত টানার কাজটি শুধু আমাদের সম্প্রদায়ের মানুষরাই করবে—এই ছিল শর্ত।'

'এখন তো আর গু-মুত টানার ব্যাপারটি নেই। যে শর্তের কথা বললে, তা কোথায় পেলে তুমি? কোনো ডকুমেন্ট আছে তোমাদের কাছে?' ইঞ্জিনিয়ার বললেন।

BanglaBook.org

কার্তিক বলল, 'গু-মুত টানার ব্যাপারটি থাকলে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষরা এ কাজে কখনো এগিয়ে আসত না। এখন স্যানিটারি পায়খানা হয়েছে, খোলা টাট্টিখানা নেই বললেই চলে। এ জন্য অন্য সম্প্রদায়ের কথা বলছেন আপনারা। নোংরা কাজ করতে করতে আমাদের জীবন ক্ষয় করে ফেলেছি। পুরুষানুক্রমে আপনারা মানে ভদ্রলোকরা আমাদের ব্যবহার করেছেন। আজ সরকারের দোহাই দিয়ে আমাদের পেটে লাথি মারতে চাইছেন। আর ডকুমেন্টের কথা বলছেন? আছে কোথাও। আপনাদের পুরোনো ফাইলে থাকার সম্ভাবনা বেশি।'

মদো শ্যামল কী যেন বলতে চাইল। তাকে থামিয়ে দিয়ে রামগোলাম বলল, 'আপনি স্যার বিএ, এমএ পাসের কথা বলছেন। কী করে পাস করব আমরা? এসএসসিও তো পাস করতে দিচ্ছেন না আপনারা। আমাদের জন্য একটা স্কুল দেয়া হয়েছিল। কেড়ে নেননি সেটা? মেথর বলে দূর দূর করে মেথর সন্তানদের তাড়িয়ে দেয়া হয় সে স্কুল থেকে। ছোট জাত বলে পেছনের বেঞ্চিতে বসানো হয়। আর বিএ, এমএ পাস করে এলেও কি চাকরি দেবেন? দেবেন না। বলবেন, মেথরের ছেলে অফিসারের চাকরি চায়! কী আশ্চর্য!'

প্রটোকল অফিসার বললেন, 'স্যারের সঙ্গে তুমি তর্ক করছ কেন?'

তাঁর কথা কানে যায়নি এমনিভাবে রামগোলাম বলল, 'ওই পেশাটা শুধু আমাদের। সবার জন্য করপোরেশনের সুইপারের চাকরি উন্মুক্ত করে দেয়ার কথা বলছেন, তার পক্ষে কোনো ডকুমেন্টস আছে আপনাদের কাছে? নেই। শুধু হরিজনদের ভিখারি বানানোর জন্য এই চালটি চালছেন আপনারা।'

কঠিন কণ্ঠে কিছু বলতে গিয়ে নিজেকে সংবরণ করলেন আবদুস ছালাম। শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'যা ডিসিশন হয়ে গেছে, তা তো আর রদ করা যাবে না। তোমাদের স্বার্থের ক্ষতি হোক, এ রকম কিছু হবে না। এবার নোটিশ অনুযায়ী সুইপার নেয়া হোক। ভবিষ্যতে আর হবে না।'

মদো শ্যামল বলে উঠল, 'আপনার মিডা কথার অর্থ আমরা বুঝে গেছি। মন্দিরের চালাকির কথা কি ভুলে গেছি আমরা? জাত নিলেন আপনি, সর্বনাশ করলেন।'

রুক্ষ চোখে মদো শ্যামলের দিকে তাকালেন বড় সাহেব। বললেন, 'তুমি কী বলতে চাও?'

'বলতে চাই, আপনি দিল্লি কা লাড্ডুর সঙ্গে জহর খাইয়েছেন আমাদের।' চিৎকার করে উঠল মনুলাল।

বড় সাহেব চমকে বললেন, 'মনুলাল, তুমি!'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ হুজুর, আমি। আর বেইমানি নয়। জাতের সঙ্গে আর বেইমানি করব না। আপনি আপনার নোটিশ ফিরিয়ে নিন, নইলে ভালো হবে না।' মনুলাল বলল।

সিবিএ নেতা জিজ্ঞেস করল, 'কী ভালো হবে না?'

চেদিলাল বলল, 'আমরা স্ট্রাইক করব। আবর্জনা পরিষ্কার করব না। দিনের পর দিন।'

মদো শ্যামল বলল, 'তখন বুঝবেন মজা। ভদ্রলোকদের বারোটা বাজবে তখন।'

হারাধনবাবু বললেন, 'অত তর্কে জড়ানোর দরকার নেই। স্যার, বোঝাপড়ার মাধ্যমে একটা সমাধানে আসেন।'

'কী বোঝাপড়া করব আমি ওদের সাথে?' কণ্ঠে তাচ্ছিল্যের সুর বড় সাহেবের।

ওয়ার্ড কমিশনার বললেন, 'ওদের সুযোগ-সুবিধা বাড়িয়ে দিন। রেশনের ব্যবস্থা করতে পারেন, বেতন বাড়িয়ে দিতে পারেন।'

আবদুস ছালাম বললেন, 'আপনি কী বলছেন এসব?'

কমিশনার বললেন, 'ওদের কাজ কেড়ে নেবেন, দেবেন না কিছু?'

'আপনি তো করপোরেশনের স্বার্থের বিরুদ্ধে কথা বলছেন কমিশনার সাহেব।'

'আমি তো ওদেরও প্রতিনিধি। ওদেরও ভোটে তো আমি কমিশনার হয়েছি। ওদের স্বার্থ দেখাও তো আমার কাজ।'

আবদুস ছালাম প্রটোকল অফিসার ও ডেপুটি ডাইরেক্টরের সঙ্গে নিচু স্বরে কিছুক্ষণ আলাপ করলেন। তারপর বললেন, 'ঠিক আছে, আমি তোমাদের জন্য নতুন একটা স্কেলের সুপারিশ করব। সুপারিশ কার্যকর হলে তোমাদের বেতন বাড়বে।'

চেদিলাল বলল, 'আপনার কথায় আর ভুলছি না।'

কার্তিক বলল, 'বেশি বেতনের লোভ দেখিয়ে আমাদের চাকরিতে ভাগ বসাবেন, এটা হতে দেব না আমরা।'

মদো শ্যামল বলল, 'আমাগো পেডে আর লাথি মাইরেন না হুজুর।'

'তোমরা কী করতে চাও, হ্যাঁ? কী করতে পারবে তোমরা?' উত্তেজিত কণ্ঠে আবদুস ছালাম জিজ্ঞেস করলেন।

রামগোলাম ঠান্ডা কণ্ঠে বলল, 'আমরা অচল করে দেব সব। আবর্জনায় সয়লাব হয়ে যাবে গোটা শহর। ময়লার ডিপো হবে।'

BanglaBook.org

'ভয় দেখাচ্ছ?'

'ভয় না স্যার, হকের কথা বলছি। সুইপারের চাকরিতে আমাদের পুরুষানুক্রমে হক আছে।'

'যদি এই হকের কথা আমরা না মানি?'

'ঘেরাও করব আমরা করপোরেশন। হাতে থাকবে টাট্টির টিন।'

'যা বেটা যা। কী করবি কর গিয়া। বারোটা বাজাইয়া দিমু আমি তোর।' হুংকার দিয়ে উঠলেন আবদুস ছালাম।

ধুপধাপ করে হরিজনরা বেরিয়ে গেল বড় সাহেবের কক্ষ থেকে। কক্ষের সবাই চুপচাপ বসে থাকল কিছুক্ষণ। হঠাৎ হারাধনবাবু বললেন, 'স্যার, একটা সমাধানে আসেন। মেথররা একজোট হয়ে গেছে। ওদের থামানো মুশকিল হবে।'

শীতল চোখে হারাধনবাবুর দিকে তাকিয়ে থাকলেন বড় সাহেব। বেল টিপলেন। ইউসুফ এল। বড় সাহেব বললেন, 'রামগোলাম।'

রামগোলাম এলে সামনের চেয়ার দেখিয়ে আবদুস ছালাম বললেন, 'বসো।'

রামগোলাম থতমত খেয়ে গেল। তার ইতস্তত ভাব দেখে বড় সাহেব আবার বললেন, 'বসো বসো, কোনো অসুবিধা নেই। তোমরাও তো মানুষ। তা ছাড়া তুমি শিক্ষিত, জুনিয়র জমাদার তুমি।'

রামগোলাম বুঝে উঠতে পারছে না কী করবে? বড় সাহেবের এ অকল্পনীয় সাদর অভ্যর্থনার কারণ কী? বড় চাল নিশ্চয়ই। তাকে তখনো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ইঞ্জিনিয়ার বললেন, 'স্যার যখন বসতে বলছেন, বসো।'

রামগোলাম কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে চেয়ারে বসল। হাত দুটো কোলে গুটানো। মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

আবদুস ছালাম হারাধনবাবুকে লক্ষ করে বললেন, 'বলেন হারাধনবাবু, সমাধানের কথা বলছিলেন আপনি। কী করলে আপনার রামগোলাম খুশি হবে?'

হারাধনবাবু ভয় পাওয়া কণ্ঠে বললেন, 'স্যার, আমি কী বলব! আমি বলছিলাম...।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি বলছি।' হারাধনবাবুর দিক থেকে বড় সাহেব রামগোলামের দিকে চোখ ফেরালেন। বললেন, 'দেখো রামগোলাম, হারাধনবাবুর চাকরি শেষের দিকে। আর ছয় মাস চাকরি আছে তাঁর। ওনার অবসর নেয়ার পর তোমাকে বড় জমাদার করব আমি। পাঁচশ টাকা বেতন

BanglaBook.org

বাড়িয়ে দিচ্ছি তোমার। তুমি স্ট্রাইক-আন্দোলনে যেয়ো না। সুইপার নেয়ার ব্যাপারে বাধা দিয়ো না তুমি।'

ব্যঙ্গ হাসির রেখা ফুটে উঠল রামগোলামের চোখেমুখে। পেছনে চেয়ার ঠেলে দিয়ে ছট করে উঠে দাঁড়াল রামগোলাম। বলল, 'আমাকে মীরজাফর বানানোর ফাঁদ পাতছেন? মনে করেছেন, যোগেশের মতো কিনে নিতে পারবেন আমাকে। ভুল করেছেন। কভি নেহি। আপনার ওই চেয়ারের বিনিময়েও রামগোলামকে কিনতে পারবেন না।'

'দুই টেইক্যা মেথরের বাচ্চা, গোলাইম্যা চুতিয়া, তুই আমাকে চ্যালেঞ্জ করছিস? আগামী চৌদ্দ তারিখ আমি সুইপার নিয়োগ দিমু, পারলে ঠেকাইস। নাউ গেট লস্ট ফ্রম মাই রুম।' আবদুস ছালামের চিৎকারে চারদিক কেঁপে উঠল।

মাথা উঁচু করে রামগোলাম আবদুস ছালামের কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল।

অঞ্জলির বয়স হয়ে গেছে। চাকরিও শেষ। কোকিলারও একই অবস্থা। কোকিলার আগে বাল্লুও চাকরি খতম করেছে। চাকরি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘর ছেড়ে দেয়ার নিয়ম। বাল্লু-কোকিলা বড় সাহেবের হাতে-পায়ে ধরে সময় বাড়িয়ে নিয়েছে। ভয়ের সময় যাচ্ছে তাদের। কখন বড় সাহেব তাদের ঘর থেকে উচ্ছেদ করে! কোথায় যাবে তারা, ভেবে কূল পায় না। ইন্দল বলে, 'ভয় কিসের মা, আমি আছি না? এই ঘর আমার নামে লিখিয়ে নেব।' কিন্তু বাল্লু-কোকিলা তো জানে, ইন্দল তাদের পালিত পুত্র। তা ছাড়া সে রূপালীকে বিয়ে করে ঝাউতলায় থাকে। করপোরেশন তা ভালো করেই জানে। একজনের নামে দুই জায়গায় ঘর অনুমোদন দেবে না করপোরেশন। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কোকিলা বলে, 'তা হবে না বাপ, এ ঘর তোমার নামে অনুমোদন দেবে না বড় সাহেব। তুমি তো আছ একখানে।'

'যদি না দেয় তাহলে তোমরা ঝাউতলায় থাকবে আমাদের সাথে। রূপালী তোমাদের মা-বাপের সম্মান দেয়।'

'তা-ই ভরসা বাপ!' বাল্লু বলে।

অঞ্জলির কোকিলার মতো সমস্যা নেই। তার ছেলে আছে, বউ আছে আর আছে রামগোলাম। তার থাকার সমস্যা নেই, খাবার অভাব নেই। তবে একটা অভাব তো আছেই, সেটা নাতবউয়ের অভাব। রামগোলামকে কতভাবে অনুরোধ-উপরোধ করা হলো—বিয়ে কর রামগোলাম। রামগোলামের এক কথা—এ জন্মে বিয়ে নয়। অনেক বয়স হয়ে গেছে তার।

BanglaBook.org

রামগোলামকে বিয়ে করানোর আশা ছেড়ে দিয়েছে সবাই। সারাটা সময় হরিজনদের নিয়ে পড়ে থাকে রামগোলাম। কিসে তাদের সুখ হবে, কিসে তাদের জীবনে শান্তি আসবে—এ নিয়ে ব্যস্ত থাকে রামগোলাম। বেতনের টাকাগুলো দাদির হাতে তুলে দিয়েই পারিবারিক দায়িত্ব থেকে মুক্তি নেয় সে। জানে—ঘরে বাপ আছে, মা আছে। দাদির পরামর্শে আর বাপ-মায়ের তত্ত্বাবধানে সংসার ভালোই চলবে। দাদিকেও সময় দেয়ার সময় নেই রামগোলামের হাতে। দাদি তার সঙ্গ চাইলে বলে, 'ঠাকুমা, এখন নয়, পরে তোমার সঙ্গে আড্ডা দেব। হরিজনদের এখন বড় দুর্দিন। তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে। আমাদের অধিকার কেড়ে নিচ্ছে করপোরেশন। প্রতিবাদ করতে হবে। প্রতিবাদের জন্য চাই একতা। আমাদের মধ্যে ফাটল আছে। ফাটল জোড়া লাগাতে হবে। সবাইকে একত্র করে অধিকার আদায়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এখন একটু ঝাউতলায় যেতে হবে, সেখানে একটা বৈঠক আছে।'

দাদি রামগোলামের সামনে দাঁড়িয়ে বলে, 'কিসের অধিকার, কিসের প্রতিবাদ?'

রামগোলাম সংক্ষেপে করপোরেশনের অপসিদ্ধান্তের কথা বলে। সব শুনে অঞ্জলি বলে, 'এটা তো তোমার দাদার আমল থেকে শুনে আসছি। কই, এখন পর্যন্ত তো হরিজন ছাড়া অন্য কাউকে তেমন করে সুইপারের চাকরি দেয়নি করপোরেশন।'

'এখন দেবে। তারই পাঁয়তারা করছে বড় সাহেব। আমি যাই ঠাকুমা, পরে কথা হবে।' বলতে বলতে বেরিয়ে গিয়েছিল সেদিন রামগোলাম।

কিন্তু আজ রামগোলাম চাকরি থেকে ফিরে একাকী তার ঘরে শুয়ে আছে। চাকরি থেকে ফিরে ঠাকুমার খোঁজখবর নেয়ার অভ্যাস রামগোলামের। কিন্তু আজ তার ব্যতিক্রম হয়েছে। একটু বিস্ময় নিয়েই রামগোলামের ঘরে ঢুকল অঞ্জলি। রামগোলামের মাথার কাছে বসে চুলে আঙুল ডুবিয়ে দিল অঞ্জলি। জিজ্ঞেস করল, 'কিছু হয়েছে রাম?'

'হ্যাঁ ঠাকুমা।' বলতে বলতে বিছানায় উঠে বসল রামগোলাম। তারপর আদ্যোপান্ত সব খুলে বলল দাদিকে। মেথরদের পেটে লাথি মারার কথা, তাকে জমাদারের চাকরির লোভ দেখানোর কথা, এমনকি বেতন বাড়িয়ে দেয়ার কথাও। শেষে জিজ্ঞেস করল, 'এখন আমি কী করব দাদি?'

'কী করবে মানে? দাদুর রেখে যাওয়া দায়িত্ব তোমাকে পালন করতে হবে রাম। প্রতিবাদ করবে বড় বাবুর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে। মৌখিক প্রতিবাদে না

BanglaBook.org

হলে জরুর আন্দোলন করবে।' দৃঢ় কণ্ঠে অঞ্জলি বলল।

ঠাকুমাকে জড়িয়ে ধরল রামগোলাম। 'আমার ভয় ছিল, তোমরা আমাকে সাপোর্ট করবে কি না। তোমার কথায় আমার সব ভয় কেটে গেল ঠাকুমা। প্রতিবাদ-আন্দোলন ছাড়া আমাদের আর কোনো পথ নেই।' তারপর চুপ মেরে গেল রামগোলাম। কিছুক্ষণ পর আবার কথা বলতে শুরু করল, 'বড় সাহেবের আজকের ব্যবহার আমার ভালো ঠেকছে না ঠাকুমা। আমার যদি কিছু হয়ে যায় আমার মা-বাবাকে দেখো তুমি।'

অঞ্জলির অন্তরাত্মা দুরুদুরু করে কেঁপে উঠল। কম্পিত কণ্ঠে বলল, 'এসব কী বলছ তুমি রাম?'

'হ্যাঁ ঠাকুমা, ছালাম সাহেব বলেছেন—যেকোনো কিছুর বিনিময়ে আগামী চৌদ্দ তারিখ সুইপার নিয়োগ দেবেন তিনি। পারলে ঠেকাতে বলেছে আমাকে।'

'তুমি কী করবে?'

'হরিজনরা একত্র হয়েছে। তারা জেগেছে। বড় সাহেবের সিদ্ধান্তকে কার্যকর হতে দেবে না তারা। নিয়োগে বাধা দেব আমরা।'

'আমি বলি কি, কালকে তুমি আরেকবার বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করো। আরেকবার অনুরোধ করো। তার মন গলতেও পারে। তোমার অনুনয় শুনে তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে সরেও আসতে পারেন।'

'একরোখা, বদরাগী আবদুস ছালাম সাহেব। আমাকে দেখলে তার উত্তেজনা আরও বেড়ে যাবে। তারপরও তুমি যখন বলছ, কাল একবার যাব আমি তার কাছে।'

অঞ্জলি শঙ্কিত কণ্ঠে বলল, 'তা-ই করো রাম।'

পরদিন সকালে সঙ্গীদের দরজার বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে ভেতরে ঢুকল রামগোলাম। বড় সাহেব মাথা ঝুঁকিয়ে ফাইলে সাইন করছিলেন। পাশে বিনীতভাবে দাঁড়ানো হেডক্লার্ক। 'আদাব স্যার' সম্বোধন শুনে মাথা তুললেন বড় সাহেব। মুহূর্তে তার চেহারা থেকে শান্ত ভাব চলে গেল। সেখানে ফুটে উঠল ক্রুদ্ধ হিংস্র ভাব।

'কী চাস?' প্রায় গর্জন করে উঠলেন আবদুস ছালাম।

রামগোলাম বলল, 'আরজি নিয়ে এসেছি স্যার।'

'কিসের আরজি?'

'স্যার, আমাদের ব্যাপারটি নিয়ে আরেকবার ভেবে দেখার অনুরোধ নিয়ে

BanglaBook.org

এসেছি।'

'অনুরোধের নামে আমাকে ধমক দিতে এসেছিস হারামজাদা।'

'অহেতুক মুখ খারাপ করছেন আপনি। হারামজাদা বলছেন।'

'হারামজাদা না বলে তোকে বোনাই বলে বুকে জড়িয়ে চুমু খাব শালার পুত?'

রামগোলামের মাথার শিরা টনটন করে উঠল। মস্তিষ্কের কী যেন একটা ঝিলিক দিয়ে উঠল। রামগোলাম মনকে বলল—ধৈর্য ধরো রামগোলাম, আত্মহারা হয়ো না। তোমার ধৈর্যের পরীক্ষা শুরু হলো বলে। প্রকাশ্যে বলল, 'স্যার, গালি দেয় মেথর-জেলেরা। লোকে বলে, মেথরের মতো গালি দিচ্ছ কেন, জাইল্যার মতো মুখ খারাপ করছ কেন? আপনি তো ভদ্রলোক, শিক্ষিত মানুষ। এত বড় করপোরেশনের প্রচণ্ড ক্ষমতাবান অফিসার আপনি। আপনার মুখে কি আমাদের মতো গালাগাল সাজে?'

'কী, কী বললি তুই? আমাকে মেথরের বাচ্চা বললি তুই? এত বড় সাহস তোর?' উত্তেজিত বড় সাহেব সামনের টেবিলে জোরে থাপ্পড় মারলেন।

'স্যার, আপনি আমার কথার ভুল ব্যাখ্যা করছেন। আমি সেভাবে বলিনি।'

'বেরিয়ে যা আমার রুম থেকে, এখনই বেরিয়ে যা।'

'বেরিয়ে যাচ্ছি। তার আগে আমাদের ব্যাপারটির কী সিদ্ধান্ত নিলেন, জানতে চাই।'

আবদুস ছালাম তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন, 'শুন রামগোলাম, আমি তোকে বলে দিয়েছি, আমার সিদ্ধান্তের কোনো নড়চড় হবে না। আজকে নয় তারিখ, আর পাঁচ দিন পর আমি সুইপার নিয়োগ দেব। তোর কত ক্ষমতা সেদিন দেখব আমি, পারলে বাধা দিস। আর হ্যাঁ, মেথররাও ইচ্ছে করলে ইন্টারভিউতে অংশ নিতে পারবে।'

'তাহলে আপনি আমাদের পেটে লাথি মারবেনই?' রাগীকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল রামগোলাম।

'তা-ই করব আমি। লাথিই মারব তোদের পাছায়।'

'ভালো হবে না। বিপদে পড়বেন আপনি। পস্তাবেন।'

'চোদমারানির পোলা, আমারে ভয় দেখাস। হেই ইউসুইফ্যা, এই খানকির পোলারে গলা ধাক্কা দিয়া আমার রুম থেইক্যা বাইর কইরা দে।' ধড়াম করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন আবদুস ছালাম।

ইউসুফ রণমূর্তি নিয়ে কক্ষে ঢুকল। ডান হাত দিয়ে রামগোলামের ঘাড়

BanglaBook.org

চেপে ধরে হিড়হিড় করে দরজার দিকে টেনে নিয়ে গেল। জোর একটা ধাক্কা দিয়ে রামগোলামকে বাইরে ছুঁড়ে দিয়ে ইউসুফ বলল, 'চোদানির পোয়া।'

দরজার বাইরে ভীষণ একটা হট্টগোল শুরু হয়ে গেল। আশপাশের রুম থেকে অনেকে বেরিয়ে এল। রামগোলাম তখনো মেঝেতে পড়ে আছে। কার্তিক হঠাৎ চিৎকার দিয়ে উঠল, 'আমাদের সর্দারের গায়ে হাত! ওই হাত গুঁড়িয়ে দেব আমরা। কাল থেকে স্ট্রাইক। ময়লা-আবর্জনা টানা বন্ধ।'

সবাই বলল, 'কাল থেকে স্ট্রাইক।' বলতে বলতে হুড়মুড় করে নিচে থেমে গেল সবাই।

ইঞ্জিনিয়ার, ডেপুটি ডাইরেক্টর, প্রটোকল অফিসার, পিএস, হারাধনবাবু—সবাই ছুটে এলেন বড় সাহেবের কক্ষে। সবারই জিজ্ঞাসা, 'কি হয়েছে, কী হয়েছে?'

বড় সাহেব তখন নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছেন। আদা পচলে যেমন ঝাঁজ থেকে যায় অনেকটা, তেমনি বড় সাহেবের রাগের প্রচণ্ডতা কমে এলেও উষ্ণতা রয়ে গেছে অনেকটা। উষ্ণ কণ্ঠে বললেন তিনি, 'মেথরের বাচ্চাদের চেকনাই বেড়ে গেছে। আমাকে কিনা ধমক—ভালো হবে না, পস্তাবেন! দুই আঙুলের চুটকিতে আমি তোদের বারোটা বাজাইয়া দিতে পারি। আমাকে দেয় চ্যালেঞ্জ। বলে—ময়লা টানা বন্ধ করে দেব। ওই রামগোলামের ছা, সে ডাকে কিনা আমারে মেথরের বাচ্চা! খানকির পোলারে আমি দেইখা লমু।'

বড় সাহেবের মুখ যে খারাপ, কথায় কথায় তিনি যে মা-বোন তুলে গালি দেন—অফিসের সবাই জানে। আজকে গালাগালের মাত্রা বেশি বলে অফিসাররা একে অন্যের মুখের দিকে তাকাচ্ছেন।

একটু দম নিয়ে আবদুস ছালাম আবার বললেন, 'আপনি হারাধনবাবু, যত গন্ডগোলের মূল।'

হারাধনবাবু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। অফিসারদের দিকে একপলক তাকালেন। তারপর বিনীত শঙ্কিত কণ্ঠে বললেন, 'আমি কী অপরাধ করলাম স্যার?'

বড় সাহেব আবার মেজাজ হারালেন। চিৎকার করে বললেন, 'কী অপরাধ করেছ জানো না? আমার পাছায় বাঁশ দেয়ার ব্যবস্থা করেছ। মেথরের বাচ্চাকে জমাদার করার সুপারিশ করেছ। বলেছ—রামগোলামের ব্রেইন ওয়াশ করে ছেড়ে দেব। হাতের পুতুল হয়ে যাবে সে। সারা জীবন আপনার গোলাম হয়ে থাকবে। গোলাম না চনু। গোলাইম্যার পুত আমারে দেয় ধমক!'

BanglaBook.org

হারাধনবাবু করপোরেশনের একজন অনুগত কর্মকর্তা। বয়সের দিক দিয়ে সবচেয়ে সিনিয়র তিনি। রিটায়ার করতে মাত্র মাস কয়েক বাকি। নিরাসক্ত অথচ কর্মঠ মানুষ। ভালো মানুষ হিসেবে সবাই সম্মান করে। সন্তান মারা যাওয়ার পর অফিসের সবাই তাঁর জন্য দরদ অনুভব করে। তাঁর চাকরিজীবনে কত বড় সাহেব এল-গেল। কেউ কোনোদিন তাঁকে তুই-তুমি বলেননি। আর আজ আবদুস ছালাম সাহেব তাঁকে চোটপাট করছেন! হারাধনবাবু দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, 'আপনি মেজাজ হারিয়েছেন স্যার। কার সঙ্গে কী ভাষায় কথা বলতে হয়, তা-ও ভুলে গেছেন। শোনেন স্যার, রামগোলামকে আপনি ব্যবহার করতে জানেননি। সব সময় তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছেন তাকে। সে বারবার আপনার কাছে এসেছে। আপনি তাকে কুকুরের মতো দূর-ছেই করে তাড়িয়েছেন।'

'তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ?' ছালাম সাহেব জিজ্ঞেস করলেন।

'ভয় না স্যার, সাবধান করছি। আপনি মেথরপট্টির সঙ্গে লাগিয়ে কসাইখানা তৈরি করলেন। মিথ্যাকে সত্যের আবরণে বোঝালেন তাদের। ধর্মের আফিম খাওয়ালেন। শেষ পর্যন্ত কী করলেন আপনি? ধর্মনাশ করলেন তাদের। এতে শুধু মেথররা রেগে গেল না, গোটা চট্টগ্রামের হিন্দুরা, এমনকি আপনার করপোরেশনের লোকরা পর্যন্ত আপনাকে ঘৃণা করতে শুরু করল।' হারাধনবাবুকে আজ কথায় পেয়ে বসেছে। ভেতরে এত দিনের যা ক্ষোভ-বেদনা জমা ছিল, তা উগরে দিতে লাগলেন তিনি। বললেন, 'আপনার মুখে যেন টাট্টিখানা বসানো, সেখানে অবিরাম বদবুময় গালিগালাজ। সব সম্প্রদায়ের জন্য আপনি সুইপারের চাকরি উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, আলোচনা করেছেন আপনার অফিসারদের সঙ্গে? করেননি। আপনার সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিয়েছেন তাদের ওপর। আরেকটা কথা...।'

এ সময় ইঞ্জিনিয়ার বলে উঠলেন, 'আপনি থামেন হারাধনবাবু, অনেক হয়েছে।'

হারাধনবাবুর কিছুই হারানোর নেই। একমাত্র অবলম্বন যে পুত্র, সে মারা গেছে। চাকরি যাবে। এই পৃথিবীর কাছে তাঁর কিছুই পাওয়ার নেই আর। ইঞ্জিনিয়ারকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'না, হয়নি স্যার।' তারপর আবদুস ছালামের দিকে ফিরে বললেন, 'আপনি যে হরিজনদের চাকরি কেড়ে নিচ্ছেন, তাদের ভবিষ্যতের কথা ভেবেছেন একবার? চাকরি না পেয়ে কোথায় যাবে তারা, কী কাজ করবে? ভাবেননি। ভিখারি হবে তারা। তাদের মেয়েরা বেশ্যা হবে—নিউমার্কেটের আঁধার বারান্দায় দাঁড়িয়ে কাস্টমার ধরবে।' বলতে

BanglaBook.org

বলতে হাউমাউ করে কেঁদে দিলেন হারাধনবাবু। কাঁদলেন বেশ কিছুক্ষণ। তারপর ধুতির খুট দিয়ে দুই চোখ মুছলেন, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর গটগট করে বড় সাহেবের কক্ষ থেকে বের হয়ে গেলেন। যেতে যেতে বড় সাহেবের কণ্ঠ শুনলেন, 'তুমি যা-ই বলো, চৌদ্দ তারিখ আমি সুইপার নিয়োগ দেবই।'

স্ট্রাইকের চতুর্থ দিন। রামগোলামের অপমানের পর চার পট্টির হরিজনরা এই প্রতিজ্ঞা করেছে, যেকোনো মূল্যে অন্য সম্প্রদায় থেকে সুইপার নিয়োগ ঠেকাবে। আর তাদের সর্দারকে বিনা কসুরে গলাধাক্কা দেয়ার প্রতিবাদে স্ট্রাইক করবে। কাজে যাবে, কিন্তু কাজ করবে না। ময়লা-আবর্জনা বা কাঁচা পায়খানার টাট্টি টানবে না। গত তিন দিন শহরের ডাস্টবিন, নালা-নর্দমা, টাট্টির টাঙ্গি আবর্জনা-গুয়ে সয়লাব। ডাস্টবিন ছাড়িয়ে আশপাশের রাজপথে গলিতে ছড়িয়ে পড়েছে আবর্জনা। নালা উপচে ময়লা পানি চলাচলের পথে চলে এসেছে। শহরবাসীর ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। শত শত টেলিফোন আসছে করপোরেশন অফিসে—কী হলো? চট্টগ্রাম শহরটি কি আস্ত ডাস্টবিন হয়ে যাবে নাকি? হরিজনরা সবাই সুইপারের চাকরি ছেড়ে অফিসার বনে গেল নাকি? নাকি মেথররা স্ট্রাইক করল?

করপোরেশন শহরবাসীকে টেলিফোনে সঠিক তথ্য দিল না। শুধু বলল, 'ঠিক হয়ে যাবে, দু-এক দিনের মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

বড় সাহেব বলেছেন, চৌদ্দ তারিখ যারাই ইন্টারভিউ দিতে আসবে, সবাইকে চাকরি দিয়ে দেবেন। বরখাস্ত করবেন হরিজনদের। ডান্ডা পেটা করে সবাইকে কলোনি থেকে বের করে দেবেন।

চতুর্থ দিনে হরিজনদের স্ট্রাইক করতে উসকে দেয়ার অভিযোগে আবদুস ছালাম রামগোলামকে বরখাস্ত করলেন। আগুনে ঘি ঢাললেন বড় সাহেব। উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল চার মেথরপট্টিতে। রামগোলাম ঘোষণা দিল আগামীকাল সকাল থেকে করপোরেশনের বাইরে-ভেতরে অবস্থান নেব আমরা। হাতে বেলচা-কাঁটা, নারী-পুরুষ সবাই আসবে। কালকে আমাদের জীবন-মরণের দিন। কালকে চৌদ্দ তারিখ।

আজ চৌদ্দ তারিখ। সব সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে সুইপার নিয়োগের তারিখ আজ। বড় সাহেবের নির্দেশে করপোরেশনের সব কর্মচারী-কর্মকর্তা সময়ের আগে অফিসে এসে পৌঁছেছেন। চারদিকে দারোয়ান-গার্ডরা সতর্ক অবস্থান

BanglaBook.org

নিয়েছে। থানার সঙ্গেও কথা বলে রেখেছেন আবদুস ছালাম সাহেব। প্রয়োজনে টেলিফোন করবেন বলে জানিয়েছেন ওসি সাহেবকে।

করপোরেশনের বিল্ডিংয়ের সামনের মাঠে হরিজনরা অবস্থান নিয়েছে। মাঠ ছাড়িয়ে রাজপথ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে তারা। চার পট্টির হাজার পাঁচেক হরিজন আজ নিত্যদিনের সব কাজকাম ফেলে ঘেরাও-এ অংশ নিয়েছে। সবার সামনে রামগোলাম। তার পাশে কার্তিক, চেদিলাল, রামপ্রসাদ, চমনলাল, ইন্দল, বাল্লু, শক্তিলাল, মনুলাল—এরা। এদের পাশে পাশে হরিজনপল্লির আবালবৃদ্ধবনিতা।

হরিজনদের সামনে, একটু তফাতে চাকরিপ্রার্থীরা। নানা সম্প্রদায়ের—হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ। তাদের সংখ্যাও কম নয়। প্রায় শ পাঁচেক। তারা উদ্বিগ্ন এবং মারমুখী। এর মধ্যে চাকরিপ্রার্থীরা জেনে গেছে—তাদের চাকরি দেয়ার বিরোধিতা করছে মেথররা। সামান্য ঘৃণ্য অস্পৃশ্য মেথরদের এত বড় সাহস! বিরোধিতা! এমনি এমনি ছেড়ে দিলে চলবে না এদের। প্রয়োজনে ঠেকাতে হবে। শুনেছে—বড় সাহেব তাদের চাকরি দেয়ার পক্ষে। পক্ষে নন শুধু, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তিনি। এই খবর তাদের ভেতরের ক্ষোভকে আরও উসকে দিয়েছে। মারমুখী মনোভাব নিয়ে তারা মাঠের অপর অংশে অবস্থান নিয়েছে। চাকরিপ্রার্থীদের কেউ কেউ ভীষণ অসহায় বোধ করছে। যদি হরিজনদের বাধার মুখে তাদের ইন্টারভিউ বন্ধ হয়ে যায়, যদি হরিজনদের চাপে বড় সাহেব তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন, তাহলে তাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে। চাকরি পাওয়ার আশায় দশ হাজার টাকা করে হেডক্লার্কের হাতে তুলে দিয়েছে তারা। হেডক্লার্ক বলেছে, তোমাদের চাকরি নিশ্চিত। কারণ, এ টাকার ভাগ ওপরে পর্যন্ত যাবে। যদি চাকরি না হয়, তাহলে আমও যাবে, ছালাও যাবে। গভীর উদ্বিগ্নতা তাদের সারা মুখ ঢেকে রাখে।

হঠাৎ চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে যোগেশকে দেখা গেল। আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে ওদের কী যেন বলছে সে। হরিজনদের মধ্য থেকে আওয়াজ উঠল, 'ধর ধর। বেইমানকে ধর।'

চাকরিপ্রার্থীরাও কিছু না বুঝে চিৎকার দিয়ে উঠল : 'মার, মার। মেথরের বাচ্চাদের মাইরা হালুয়া টাইট করে দে।'

চিৎকার-চেঁচামেচি বিরাট হট্টগোলে পরিণত হলো। তুমুল গালাগালি। প্রচণ্ড আস্ফালন। মুষ্টিবদ্ধ হাতের ওপরে-নিচে ওঠা-নামা। রক্তচক্ষু। টান টান পেশি। বিপরীত পক্ষের দিকে ধেয়ে আসা।

লাঠি হাতে গার্ড-দারোয়ানরা সক্রিয় হলো। কিন্তু বিপুল জনতার সামনে

BanglaBook.org

তারা অসহায়। বেলচা, কাঁটা, ঝাড়ু হাতে চাকরিপ্রার্থীদের দিকে হরিজনদের ধেয়ে যাওয়া। গালাগালি থেকে মারপিট। চারদিকে হইচই, ধুমধাম আওয়াজ, ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া।

হঠাৎ কে যেন চিৎকার দিয়ে উঠল, 'খুন, খুন। যোগেশকে খুন করেছে।'

আগেই ওসিকে ফোন করেছেন বড় সাহেব। কাছেই থানা। অল্প সময়ের মধ্যে পুলিশ ভ্যান এল। চাকরিপ্রার্থীরা আগেই হাওয়া হয়ে গেছে। যোগেশকে ঘিরে রামগোলাম। যোগেশের মাথা দু-ফাঁক হয়ে গেছে। চিৎ হয়ে পড়ে আছে সে। মাথায় থকথকে রক্ত। একটু দূরে মগজ ছড়িয়ে আছে। সবাই চলে গেলেও রামগোলামরা যায়নি। যোগেশের মৃতদেহ ঘিরে রামগোলামদের হাহাকার-আর্তনাদ। এত বড় কাজ কে করল? কে খুন করল যোগেশকে?

কার্তিক চিৎকার দিয়ে বলল, 'বড় সাহেব এই খুন করিয়েছেন। আমাদের ফাঁসানোর জন্য নিজের মানুষ দিয়ে খুন করিয়েছেন আবদুস ছালাম।'

ওসি নুরুল ইসলাম নুরু আবদুস ছালামের কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলেন। আবদুস ছালাম তাঁর কাছে রামগোলাম আর কার্তিকের নামে কমপ্লেইন করেছেন। ওরাই খুন করেছে বলে দাবি করছেন তিনি। অফিসের জানালা দিয়ে খুন করতে দেখেছেন তিনি। হেডক্লার্ক বলেছেন, তিনিও স্বচক্ষে যোগেশকে খুন হতে দেখেছেন। বড় সাহেবের পিয়ন ইউসুফ এক কাঠি বাড়িয়ে বলেছে, 'হুজুর, আমার নিজের চোখে দেখা—রামগোলাম যোগেশের গলা চিপে ধরেছে আর কার্তিক পেছন থেকে বেলচা দিয়ে এক বাড়ি। ও মারে বলে যোগেশ মাটিতে পড়ে গেল। তারপর জবাই করা মোরগের মতো ধড়ফড়, ধড়ফড়। কী কষ্টটাই না পেয়ে মরল যোগেশ! আমরা গেলাম না কেন তাকে বাঁচাতে? কেমনে যাই স্যার? সবার হাতে অস্ত্র—বেলচা, দা, কিরিচ। কেমনে নিচে যাই স্যার? আমাদেরও তো প্রাণের ভয় আছে?' বলতে বলতে কান্নায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ল ইউসুফ।

আবদুস ছালাম মনে মনে বললেন, 'সাবাস বেটা, সাবাস!'

এতজনের সাক্ষ্য পাওয়ার পর ওসির আর অবিশ্বাসের কিছুই রইল না। গটগট করে তিনি নিচে নেমে এসে মৃতদেহের পাশে দাঁড়ালেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'রামগোলাম আর কার্তিক কে?'

রামগোলাম আর কার্তিক বলল, 'আমি।'

ওসি বললেন, 'সেন্ট্রি, ওদের হাতে হ্যান্ডকাফ লাগাও। ওরাই খুন করেছে যোগেশকে।'

BanglaBook.org

কুড়ি

তারপর কী হলো? তারপর দুই বছর ধরে মামলা চলল নানা কোর্টে। সাক্ষী-প্রমাণের ভিত্তিতে বিচারকরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে কার্তিক আর রামগোলামই যোগেশকে খুন করেছে। নিম্ন আদালত দুজনের ফাঁসির আদেশ দিলেন। উচ্চ আদালত রামগোলামের ফাঁসির আদেশ মওকুফ করে চৌদ্দ বছর কারাদণ্ড দিলেন। একসময় কার্তিকের ফাঁসির আদেশ কার্যকর হলো। সেন্ট্রাল জেলে রামগোলাম সাজা ভোগ করতে লাগল।

যোগেশ নিহত হওয়ার মাস খানেকের মধ্যে করপোরেশনের বড় সাহেব আবদুস ছালাম অন্য সম্প্রদায়ের লোকদের থেকে সুইপার নিয়োগ করলেন। আন্দোলন করার অপরাধে বেছে বেছে বেশ কয়েকজন হরিজনকে চাকরিচ্যুত করলেন। ডান্ডাপেটা করে কয়েকটি মেথর পরিবারকে কলোনি থেকে উচ্ছেদ করলেন। আইন করলেন—হরিজনদের মধ্য থেকে কেউই কোনোদিন জমাদার হতে পারবে না। আর এখন থেকে সব সম্প্রদায়ের বাংলাদেশিরা করপোরেশনে সুইপারের চাকরি পাওয়ার অধিকার পাবে। কার্তিক-রামগোলামকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাওয়ার পর মাত্র পাঁচ দিন স্ট্রাইক চালাতে পেরেছিল হরিজনরা। বড় সাহেবের হিংস্রতা আর পদক্ষেপ দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিল চার পট্টির হরিজনরা। মুখ্যরা নানা সলাপরামর্শ করে কাজে যোগদানের সিদ্ধান্ত দিয়েছিল। রামগোলামের চৌদ্দ বছর কারাদণ্ড হয়ে গেলে হরিজনরা চেদিলালকে সর্দার নির্বাচন করেছিল। রোগে-শোকে ভুগতে ভুগতে অঞ্জলি মারা গেল একদিন। আশায় বুক বেঁধে শিউচরণ আর চাঁপারানী ছেলের জন্য অপেক্ষা করতে থাকল। চৌদ্দ বছর পর রামগোলাম তাদের বুকে ফিরে আসবে। কার্তিকের বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে এরওর সাহায্যে আর সামান্য চাকরির ওপর নির্ভর করে দিন গুজরান করতে লাগল। হারাধনবাবু চাকরি শেষে গ্রামে ফিরে গেলেন। পিয়ন ইউসুফের প্রমোশন হলো। আর? আর ভিন্ন

BanglaBook.org

সম্প্রদায়ের সুইপাররা চাকরি এবং ঘর ভাড়া দিল। সে কেমন? চাকরির খাতায় তাদের নাম থাকল। চাকরি করতে লাগল বেকার হরিজনরা। বিনিময়ে অর্ধেক বেতন। অন্য অর্ধেক বেতন চাকরি না করা ভিন্ন সম্প্রদায়ের সুইপারদের। তাদের নামে অনুমোদিত কলোনির ঘর তারা ভাড়া দিল হরিজনদের। হরিজনদের যে অন্য কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই, আর অন্য সম্প্রদায়ের সুইপারদের যে মেথরপট্টিতে এসে থাকার রুচি নেই।

একটা সময়ে আবদুস ছালাম রিটায়ার করলেন। তারপরে আরেকজন বড় সাহেব এলেন। ইতিহাসের অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে অধিকতর শক্ত হাতে করপোরেশনের হাল ধরলেন তিনি।

একুশ

এক, দুই করে চৌদ্দ বছর কেটে গেল। জেল থেকে ছাড়া পেল রামগোলাম। ফিরিঙ্গিবাজার কলোনিতে মা-বাবার কাছে ফিরে এল রামগোলাম। চাঁপারানী-শিউচরণ বয়সের ভারে জরজর। পুত্রের আগমনে মনের যৌবন ফিরে পেল তারা।

রামগোলামের চেহারা অনেকটা বদলে গেছে। শরীরে ভাটা লেগেছে। মুখভর্তি দাড়ি-গোঁফ। লম্বা চুল। তার সময়ের অনেকে মারা গেছে—চেদিলাল নেই, চমনলাল-মনুলাল-রামপ্রসাদ মারা গেছে।

নীরবে পট্টিতে পট্টিতে হাঁটে রামগোলাম। হরিজনপল্লির নতুন প্রজন্ম তাকে চেনে না। হেঁটে হেঁটে রামগোলাম তাদের মধ্যে কার্তিককে খুঁজে বেড়ায়। অন্য একজন কার্তিক না হলে, অন্য একজন কার্তিক না জন্মালে রামগোলাম হরিজনমুক্তির আন্দোলন নতুন করে শুরু করবে কীভাবে?

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org